কণিকায়

প্রাউট

(বিংশ ও একবিংশ খণ্ড)

শ্রীপ্রভাতরঞ্জন সরকার

কণিকায় প্রাউট

বিংশ খণ্ড ও একবিংশ খণ্ড

শ্রীপ্রভাতরঞ্জন সরকার

সূচীপত্র

প্রকাশক ও সত্ত্বাধিকারীর বিনা অনুমতিতে এই পুস্তকের কোন অংশ অর্থকরী কিংবা উপাধিগত কিংবা গবেষণা সংক্রান্ত কার্যে কিংবা অন্য যে-কোনো ভাবে ব্যবহার করা অনুচিত বলিয়া বিবেচিত হইবে। সুতরাং কেহ যেন তাহা না করেন।

–প্রকাশক

© ২০১৬ আনন্দমার্গ প্রচারক সংঘ (কেন্দ্রীয় কার্যালয়)
কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত

রেজিঃ অফিস: আনন্দমার্গ প্রচারক সংঘ
আনন্দনগর, পোঃ–বাগলতা
জেলা–পুরুলিয়া, পঃ বঃ

যোগাযোগ অফিস: ৫২৭, ভি. আই. পি. নগর
কলকাতা–৭০০ ১০০

প্রথম সংস্করণ: ১৯৮৮

দ্বিতীয় পরিবর্ধিত সংস্করণ: ২১শে অক্টোবর, ২০১৬

সূচীপত্র

প্রকাশক: আচার্য মন্ত্রেশ্বরানন্দ অবধূত (কেন্দ্রীয় প্রকাশন সচিব)
আনন্দমার্গ প্রকাশন বিভাগ ৫২৭, ভি. আই. পি.
নগর; কলকাতা–৭০০১০০

মুদ্রাকর: আচার্য অভিব্রতানন্দ অবধূত
আনন্দ প্রিন্টার্স
৩/১সি, মোহনবাগান লেন
কলকাতা–৭০০০০৪

ISBN: 978-81-7252-337-4

মূল্য: ৭৫.০০ টাকা মাত্র

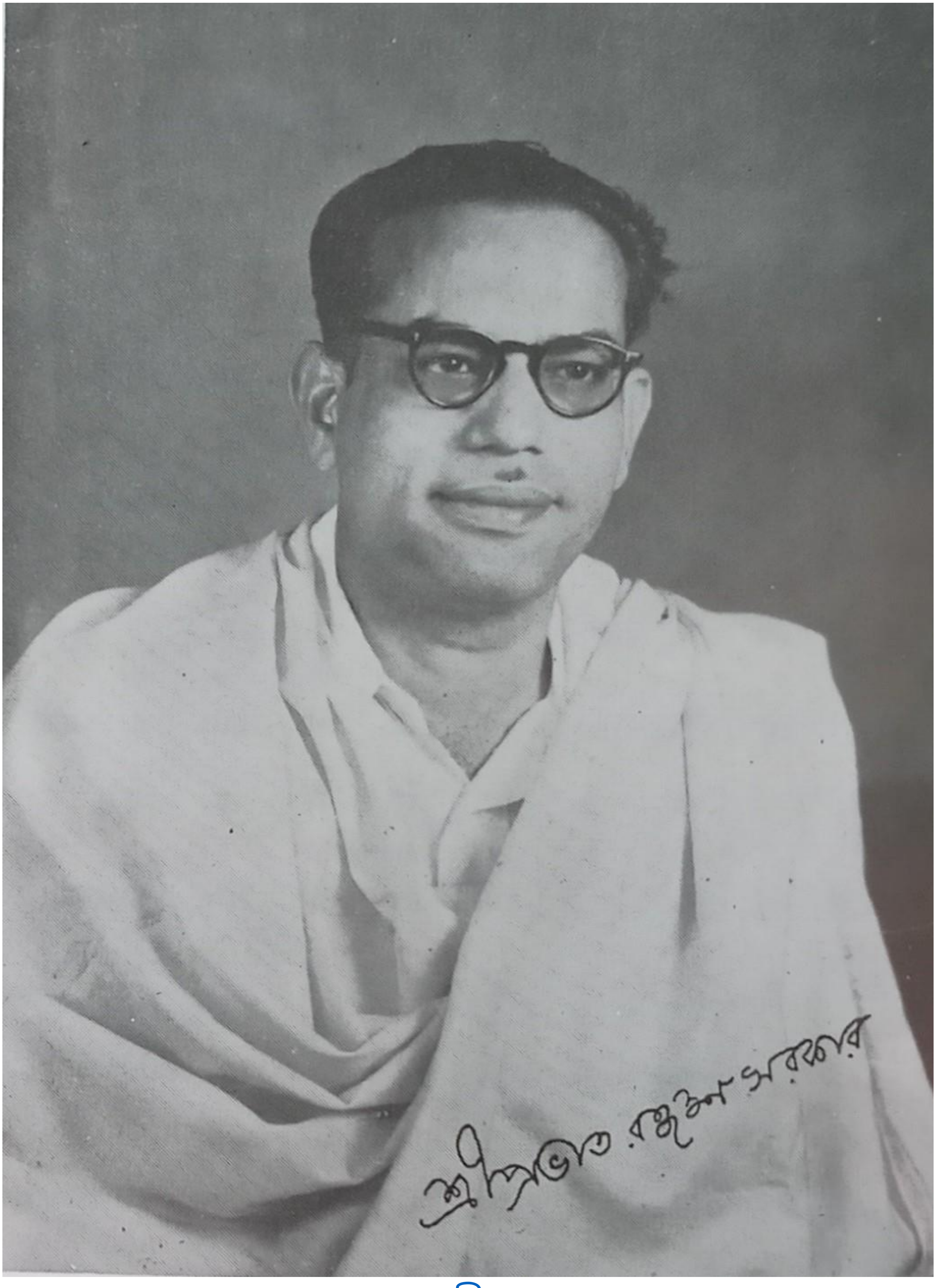

[সূচীপত্র]

সূচীপত্র

(বিংশ খণ্ড)

১।বাঙলার সামাজিক-অর্থনৈতিক সম্ভাবনা ২। কৃষি সমবায়

৩। উত্তর-পূর্ব ভারত 8। দক্ষিণবঙ্গ

৫। কাঁথি অববাহিকা পরিকল্পনা

(একবিংশ খণ্ড)

১। ইতিহাস ও অন্ধবিশ্বাস ২। সমাজের দায়িত্ব

৩। গান্ধীবাদের সামাজিক ত্রুটি

8। মানবসমাজকে কিভাবে একতাৰদ্ধ করা যাৰে

৫। বিকেন্দ্রিত অর্থনীতি ৬। অর্থনৈতিক গণতন্ত্র

৭। মাদকদ্রব্য ৮। নিউক্লিয়ার বিপ্লব

অতিরিক্ত সূচিপত্র

অকৃষিশিল্প, অভ্রান্তনেতৃত্ব, অর্থকরীফসল,

অর্থকরীফসলউৎপাদন,

সূচীপত্র

অর্থনৈতি কগণতন্ত্র, অর্থনৈতিক গণতন্ত্রের জন্যে কীকী প্রয়োজন, অড়হর, আর্থিক বিকেন্দ্রীকরণ, আয়োডিন, আয়োডিন-ফসফরাস উৎপাদনকারখানা, ইতিহাসও অন্ধবিশ্বাস, ইস্পাত ম্যাঙ্গানিজ রূপা তামার বিশাল ভাণ্ডার, উত্তরপূর্বভারত, ওষুধ, কাঁথি অববাহিকা পরিকল্পনা, কাঁথির মৃত প্রায় দুটি শিল্প, কৃষিসমবায়, খনিজওষধ, খাদ্যউৎপাদন, গম, গাছ গাছড়া থেকে ওষুধ, গান্ধী বাদের সামাজিক ত্রুটি, গৃহনির্মাণ ও অন্যান্য নির্মাণের উপকরণ সমূহ, জাহাজনির্মাণের উপকরণসমূহ, ঝিনুক ও শঙ্খশিল্প, টুসু পরব, ডালশস্য, তামাক, দক্ষিণবঙ্গ, ধান, নিউক্লিয়ার বিপ্লব, নোতুন বন্দর, পট্টবস্ত্র, বস্ত্র উৎপাদন, বাঙলার জন্যে উপযোগী কয়েকটি উন্নয়ন কার্য ক্রম, বাঙলার সামাজিক অর্থনৈতিক সম্ভাবনা, বিকেন্দ্রিত অর্থনীতি, বিকেন্দ্রিত অর্থব্যবস্থার মূলনীতি সমূহ, বৈপ্লবিক কর্মী বাহিনী, বৈপ্লবিক কৌশল, ভাবাবেগের ভূমিকা, ভুট্টা, মানব সমাজকে কিভাবে একতাবদ্ধ করা যাবে, মুক্তোর চাষ,

সূচীপত্র

মুগ, যানবাহন নির্মাণের উপকরণসমূহ, লবণ উৎপাদন কেন্দ্র, লবণ শিল্প, শিক্ষা উপকরণ, শোষণের উপস্থিতিঃ, সদবিপ্র হও সদবিপ্র তৈরী কর, সামুদ্রিক গুল্মভিত্তিক শিল্প, সেরিকালচার, হাওড়া দাঁতন দীঘা রেলওয়ে,

---

সূচীপত্র

কণিকায় প্রাউট

বিংশ খণ্ড

বাঙলার সামাজিক-অর্থনৈতিক সম্ভাবনা

সূচীপত্র

বাঙলার সবচেয়ে দরিদ্র জেলা হ'ল রাঢ়ের বাঁকুড়া ও পুরুলিয়া। সেই তুলনায় নদীয়া, মুর্শিদাবাদ, জলপাইগুড়ি, কোচবিহার, [করিমগঞ্জ) প্রভৃতি অন্যান্য জেলাগুলো আর্থিক অবস্থায় কিছুটা পরিমাণ স্বচ্ছল। রাঢ়ের বাঁকুড়া ও পুরুলিয়ার অবস্থা সবচেয়ে মর্মান্তিক। এখানকার লোকেরা বছরে অন্ততঃ চার মাস এক ধরণের ঘাসের বীজ খেয়ে বেঁচে থাকে। তার ফোর ছাট। ৮১৫ দিল্যান্ডি চক্ষু ভার্টি যা মৃত চকুলে চাশিচকে

অর্থনৈতিক দিক থেকে ৰাঙলাকে স্ব–নির্ভর করতে হলে প্রথমে দু'টি জিনিস দরকার (১) খাদ্যে স্ব–নির্ভর করা (২) অর্থকরী ফসল উৎপাদনকে ব্যাপকভাবে কার্যকরী করা। ওই দু'টি জিনিস পাঁচটি প্রাথমিক চাহিদা পূরণের পক্ষে একটা গুরুত্বপূর্ণ দিক। পাঁচটি প্রাথমিক চাহিদা হ'ল– (১) খাদ্যের স্বনির্ভরতা আনয়ন (২) বস্ত্রে স্বনির্ভরতা (৩) ঘরবাড়ী নির্মাণের জন্যে প্রয়োজনীয় উপকরণে স্ব–নির্ভরতা আনয়ন (৪) রোগ নিবারণ ও চিকিৎসার জন্যে উপযুক্ত ওষুধপত্রের উৎপাদন (৫) শিক্ষার উপকরণের জন্যেও স্ব–নির্ভরতা আনয়ন ব্যাহ। পিক্যালভাট নিম চায় হাকোচ হাত ছবুও

খাদ্য উৎপাদন

খাদ্যে স্বনির্ভরতার প্রশ্নে ৰাঙালীস্তানের প্রধান সমস্যা হ'ল– (১) বৃষ্টিপাতের স্বল্পতা (২) শীতকালীন বৃষ্টিপাতের অভাব (৩) জলনিকাশী ব্যবস্থার অভাব।

ব্যাপকভাবে বৃক্ষচ্ছেদের দরুণ বৃষ্টিপাত প্রয়োজনের তুলনায় দারুণভাবে কমে গেছে। এর ফলে শস্যের উৎপাদন নেই বললেই চলে। নদীগুলোতেও জল নেই। সেচ ব্যবস্থা তার জন্যে সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছে। শীতকালীন বৃষ্টিপাত না–হওয়ার জন্যে রবিশস্য আশানুরূপ হচ্ছে না। জলনিকাশী ব্যবস্থা না–থাকার দরুণ নদীর জলকে শস্য উৎপাদনের কাজে ব্যবহার করা যাচ্ছে না। এর হাত থেকে বাঁচতে গেলে সেচ ব্যবস্থার ব্যাপক সংস্কার করতে হবে। এর জন্যে বিশেষ করে রাঢ়ে যেখানে বৃষ্টিপাত একেবারেই নেই বললেই চলে; সেখানে শিফট ইরিগেশন, লিফ্ট–ইরিগেশন, ট্যাঙ্ক ইরিগেশন, স্মল স্কেল রিভার ব্যালী প্রজেক্ট তৈরী করে সেচ ব্যবস্থার নোতুন রূপদান করতে হবে। আর এরসঙ্গে নদী নালার সংস্কার করে জলনিকাশী ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন করতে হবে। এইভাবে সেচ ব্যবস্থা পরিপূর্ণ করতে পারলে বছরে চার বার শস্য উৎপাদন সম্ভব হবে। ধানের

ক্ষেত্রে আমন, তারপর বোরো, তারপর আউশ এই তিন রকম ধানেই উৎপাদন করা যাবে। নব্বই দিনের মধ্যেই একটা ফসল তোলা সম্ভব হবে। জাপানে জনসংখ্যার চাপ খুব বেশী। ব্রিটিশ ভারতে পূর্ববাঙলার ত্রিপুরা, নোয়াখালি, কুমিল্লা, চাঁদপুর, ব্রাহ্মণবেড়িয়া, এইসব অঞ্চলের লোকসংখ্যা ছিল অত্যধিক। জাপানে তার তুলনায় জনসংখ্যা এখন অনেক বেশী। কিন্তু তা সত্ত্বেও তারা তাদের খাদ্যের ব্যাপারে স্বনির্ভরতা অর্জন করতে সক্ষম হয়েছে।

রাঢ়ের কোন কোন জায়গায় মাটি এঁটেল মাটি, জল ধরে রাখতে পারে। সেসব জায়গার পুকুর, বড় বড় ট্যাঙ্ক খুব ভালো হবে। যার ফলে মাছের চাষ এই মাটিতে ভাল হবে। এঁটেল মাটিতে আবার আমন ধানের চাষ ভাল হয়। উত্তরবঙ্গের মাটি এঁটেল ও দোঁয়াশ, যেমন দিনাজপুর জেলা। এখানে মাটিতে আউস ধানের চাষ ভাল হবে। দোঁয়াশ মাটি আবার পাট চাষের উপযুক্ত।

ত্রিপুরার আবহাওয়া অনেকটা রাঢ়ের মতো। তবে ত্রিপুরায় রাঢ়ের তুলনায় বৃষ্টিপাত বেশী হয় ও এটি একটি বৃষ্টিচ্ছায়া

অঞ্চল। ত্রিপুরার মাটি আউশ ধান, রবিশস্য, আলুর পক্ষে উপযুক্ত। পাটও এখানে উৎপাদন হবে তবে খুব একটা ভাল হবে না। লঙ্কা হবে প্রচুর যার বাজার হবে বর্তমান বাঙলাদেশ। রাঢ়ে হবে সরিষার তৈল বীজ। অন্য অঞ্চলে হবে তিলের চাষ যার থেকে তেল সমতে অনেক কিছু উৎপাদিত হতে পারে। তিল একটা অর্থকরী ফসল। আখ চাষের বদলে চীনীর জন্যে সুগার বীটের চাষ করা যেতে পারে। আখ চাষে জমি একবছর আটকে রাখে। সুগার বীটের চাষ পুরুলিয়ার অযোধ্যা পাহাড়ে ও বাঁকুড়ার শুশুনিয়া পাহাড়ে হতে পারে। সুগার বীট, শাঁকালু এগুলি থেকে চীনী হবে। উত্তর বঙ্গে তামাক চাষ খুব ভাল হবে। তামাক চাষের জন্যে কালোমাটি দরকার। ডালের চাষ রাঢ়ে খুব ভাল হবে। আলুর চাষও রাঢ়ে খুব ভালো হবে। আর্দ্র জলবায়ুতে আলুর চাষ হয় না। উত্তর বঙ্গে অসমে আলু যায় বীরভূম থেকে। কলকাতাকে আলু সরবরাহ করে হুগলী। বিহারকে আলু সরবরাহ করে বর্ধমান ও মধ্যপ্রদেশকে আলু সরবরাহ করে মেদিনীপুর জেলা।

আগেই বলা হয়েছে যে পার্বত্য ত্রিপুরা বৃষ্টিপাত অঞ্চল। ত্রিপুরার পাহাড়ে মেঘ বৃষ্টিপাত ঘটিয়ে দেয়। শিলঙও বৃষ্টিপাত

অঞ্চল কিন্তু চেরাপুঞ্জিতে সবচেয়ে বেশী বৃষ্টিপাত ঘটে। চেরাপুঞ্জির পাহাড়ে সমস্ত জলীয় বাষ্প বৃষ্টিপাত ঘটিয়ে দেয় বলে শিলং-এর জন্যে কিছুই থাকে না। তাই চেরাপুঞ্জিতে যেখানে বছরে গড়ে ৯০০ ইঞ্চি বৃষ্টিপাত হয় সেখানে চেরাপুঞ্জির পাশে থেকেও শিলং-এর বৃষ্টিপাত বছরে গড়ে ৮০ ইঞ্চি। রাঢ়ে আলুগুলো বড় বড় সাইজের হলেও ত্রিপুরায় সেই সাইজ় হবে ছোট। তবে ত্রিপুরায় প্রচুর আলুর উৎপাদন হতে পারবে। সেই আলু বাঙলাদেশকে সরবরাহ করে ত্রিপুরা ধনী হয়ে উঠতে পারে। ত্রিপুরায় সরষে হবে, পূর্ববাঙলায় সরষে হবে না। কারণ দোঁয়াশ মাটিতে সরষে হয় না। তাই ত্রিপুরা বাঙলাদেশে সরষে রপ্তানি করে বৈদেশিক মুদ্রা আয় করতে পারবে। রাঢ়ের তুলনায় ত্রিপুরায় বৃষ্টিপাত বেশী হয় বলে সেখানে আনারস, কলা ভাল হয়। কাঁটালের জন্যে বিশেষ কোন মাটির দরকার পড়ে না। কাঁটাল বাঙালীস্তানের সর্বত্রই হতে পারে। ত্রিপুরায় চা হবে কম। চায়ের জন্যে ঢালু পার্বত্যজমি দরকার, যেখানে বৃষ্টির জল বসতে পারে না। চায়ের চাষ হৰে শিলচর, করিমগঞ্জে। ত্রিপুরায় রাবার চাষ হতে পারে তবে কম পরিমাণে। পাটের জন্যে প্রচুর বৃষ্টিপাত দরকার আর জমিকেও উর্বর হতে হবে। এই দুই কারণে ত্রিপুরায় চেয়ে ময়মনসিং-এ

পাট বেশী হবে আর ভালও হৰে। ত্রিপুরায় বুনো কচু ভাল হবে।

শাকসব্জীর জন্যে জলের যোগান বেশ দরকার হয়। তবে তার জন্যে ওপর থেকে বৃষ্টিপাতের প্রয়োজন হয় না। শাকসব্জী ভাল জন্মাবে নদীয়া, কুষ্টিয়া জেলায়। এইসব জায়গায় কপির চাষ, কার্পাস চাষ ভাল হবে। ত্রিপুরায় চাষ কাপাস, গাছ কাপাস দু'টোই ভাল হবে। নদীয়া–মুর্শিদাবাদে গমের চাষও ভাল হবে। নারকোলের জন্যে স্যালাইন ক্লাইমেট দরকার। তাই দক্ষিণ বাঙলার ২৪ পরগণা থেকে নোয়াখালি, চট্টগ্রাম, কক্সবাজার, টেক্সাফ পর্যন্ত উপকূল অঞ্চলে নারকোলের উৎপাদন হৰে। এগুলি জাহাজ তৈরী কারখানার কাজে লাগানো যাৰে। এই দীর্ঘ সমুদ্রোপকূলবর্তী অঞ্চলকে বলা হয় মেরাইন বেঙ্গল। শিলিগুলি, কোচবিহার, কাছাড়, করিমগঞ্জ, ত্রিপুরায় সুপারী হবে। নারকোল ও সুপারী চাষের জায়গায় গোলমরিচ হতে পারে। পানের চাষের জন্যে স্যালাইন মাটির দরকার। মেদিনীপুরের তমলুক মহকুমায় পানের চাষ খুব ভাল হয়। তবে পুরো দক্ষিণ বাঙলাতেই পানের চাষ হতে পারে। তমলুক থেকেই ভারতবর্ষের সব জায়গায় পান যায়।

বাঙলার পাট আর্থিক দিগন্ত খুলে দিতে পারে। পাট থেকে অনেক কিছুই হতে পারে যেমন কাগজ, রেয়ন, সিল্ক প্রভৃতি। বাঁশ থেকেও কাগজ পাওয়া যাবে। তবে তার জন্যে খরচ একটু বেশী পড়বে। ৰাঙালীস্তানের সার্বিক অর্থনৈতিক উন্নতি করতে গেলে ব্লকভিত্তিক অর্থনৈতিক পরিকল্পনা করতে হবে। ৰাঙালীস্তানের বিভিন্ন অঞ্চলের মাটি, জলবায়ু যেহেতু এক নয় সেহেতু ভিন্ন ভিন্ন পরিকল্পনা নিতে হবে। সমগ্র বাঙালীস্তানের জন্যে যেমন একটা বৃহৎ পরিকল্পনা নিতে হবে তেমনি ব্লক-ভিত্তিক অর্থনৈতিক পরিকল্পনাও করতে হবে। তবেই সমস্ত মানুষের জন্যে অন্ন, বস্ত্র, শিক্ষা, চিকিৎসা ও বাসস্থানের ব্যবস্থা করা সম্ভব হবে

ধান

পৃথিবীতে য যত রকমের ঘাস আছে তার মধ্যে সবচেয়ে বড় ও লম্বা হচ্ছে বাঁশ। আর সবচেয়ে ছোট-দুর্বা ঘাস বা দুধিয়া ঘাস। দুধিয়া ঘাস মাটিতে শুয়ে থাকে। দুধিয়া ঘাস ছোটনাগপুর অঞ্চলে খুব বেশী করে হয়। সবরকম ঘাসেরই ঔষধীর গুণ আছে। বাঁশ গাছ ২৫০ রকম প্রজাতির হয়ে

থাকে। এছাড়া আখ, ধান, বিচালী, গম, ঘাস সবই ঘাসের পর্যায়ে পড়ে। এর মধ্যে কোন কোন ঘাসের বীজ আমরা খাই। কোন কোন ঘাসের বীজ খাই না। আখের ফুল হয়, বীজ বড় একটা দেখা যায় না। আখের চোখ থেকে গাছ হয়। বাঁশে ফুল হয় তবে খাওয়ার উপযুক্ত নয়। বিচালীর বীজ হয় ছোট ছোট। দুর্ভিক্ষে মানুষে খায়। মাদুর ঘাসেও বীজ হয় তবে তা মানুষের খাদ্য নয়।

ধান মানুষের বিশেষ খাদ্য। বিভিন্ন প্রজাতির ধান রয়েছে। কোন কোন ধান গাছ ৭/৮ ফুট উঁচু হয় আবার কোন কোন ধান গাছ ২'/, থেকে ৩১/, ফুটও হয়। যবও ২ এক ধরণের ঘাস। এই যবের চেয়ে আকারে ছোট গম। এছাড়া ভুট্টা, বাজরা, জনার এরাও ঘাস–এদের পাতা একটু চওড়া হয়। এরা অন্য প্রজাতিতে পড়ে। এর মধ্যে ভুট্টার বিশেষত্ব শীষ হিসেবে নয়। গাছের গা থেকে পাতার ফাঁকে ফাঁকে ভুট্টার শীষ বের হয়। ধান, গম, যবের বীজ প্রধান খাদ্য। ঘাসের বীজ মানুষ এমনিতে খায় না তবে দুর্ভিক্ষের সময় খায়। শ্যামা, নারকাটিয়া, কাউন, কোদা এরা ঘাস বলে স্বীকৃত। তবে অভাবে এর বীজ মানুষ খায়। এরমধ্যে বাঁকুড়া ও পুরুলিয়ার গরীবেরা বছরের চারমাস এই ঘাসের বীজ খেয়ে থাকে।

সূচীপত্র

সংস্কৃতে ধান্য মানে সবুজ 'শল্প' (green vegetation)। আর্যরা ভারতে এসে, এই সবুজ শল্প দেখলেন। তবে বাঙলার ধান ও সংস্কৃত ধান এক নয়। তবে ৰাঙলায় যাকে ধান ৰলি সেই ধানের সংস্পর্শে আর্যরা প্রথমে আসে পারস্যতে। তবে সেখানে ধান (paddy) কম হয়। আর্যরা ধানের নাম রাখে ব্রীহি অর্থাৎ যা বিরাট সম্ভাবনা যুক্ত খাদ্য। ধানের ঔষধীর গুণ আছে ও সহজপাচ্য। ইংরাজী শব্দ 'রাইস' এসেছে সংস্কৃত শব্দ 'ব্রীহি' থেকে। ১০০০ বছর পর 'ব্রীহি' হয়েছে পারসিয়াতে 'রীহি'। তার থেকে পুরোনো ল্যাটিনে এসেছে 'রিসি'। তার থেকে আধুনিক ইংরাজীতে এসেছে 'রাইস'। ব্রীহি নাম এইজন্যে যে এর থেকেই চাল, মুড়ি, খই, চিঁড়ে প্রভৃতি তৈরী হয়। গমে গায়ের জোর বাড়ে কিন্তু এ্যাসিড থাকায় পঞ্চান্ন বছরের পর থেকে তা প্রাণশক্তি কমিয়ে দেয়। অনেকেই বলে থাকেন গম খেলে শরীরের পুষ্টি হয় কিন্তু ব্রেনের অপুষ্টি হয়। ভাত এই দোষ থেকে মুক্ত। তবে ভাত পেটে বেশী জায়গা নেয়। তাই খাওয়ার পর আলস্য আসে, ঘুম পায়। যাকে বলে ভাত ঘুম। যাই হোক আর্যরা ভারতে ঢুকে এদেশে এই ব্যাপক সবুজ শস্য দেখে এই দেশটির নাম দেন হরিৎ (হরিৎ ধান্য হরিৎহান্য > হরিহানা

> হরিয়ানা)। প্রাচীন সংস্কৃত ব্রীহি থেকে পারসিয়ান ভাষায় রিহি। প্রাচীন লাতিনে রিসি। ইংরাজীতে rice (রাইস্)।

আর্যরা যখন ধান চোখেও দেখেনি তখন দ্রাবিড়, অস্ট্রিকদের কাছে ধান পুরনো হয়ে গেছে। রাঢ়ের প্রধান ফসল ধান। ধানের বীজ ফেলে প্রথম যেখানে চারা তোলা হয় তাকে কোথাও বলে আফোড়, কোথাও ৰলে ৰীজতলা। 'আফোড়' কথাটি এসেছে সংস্কৃত 'আস্ফোট' শব্দ থেকে। বীজতলার বীজ ও তলা দু'টোই সংস্কৃত শব্দ। যদি সংস্কৃত এখানকার (রাঢ়ের) স্থানীয় ভাষা না হোত তাহলে আর্যদের আসার পূর্বে এই ধরণের ভাষা কোথা থেকে পেল? সুতরাং সংস্কৃত এদেশের নিজস্ব ভাষা। ধানবাদ, দেওঘর, দুমকা, পাঁকুড়, গড্ডা, বীরভূম প্রভৃতি জায়গায় আফোড় বলা হয়। মেদিনীপুরে ৰলে ৰীজতলা, দু'টোই সংস্কৃত শব্দ ও পূর্ব মুর্শিদাবাদ অঞ্চলে বীছন, পটনায় বলে বিহন।

প্রথম মানুষ যখন নিরামিষ খাদ্য গাছপালা থেকে পাওয়ার চেষ্টা করে তখন তারা ঘাসের বীজ খেতে থাকে। মানুষ দেখল এই বীজের বীজ খেতে মন্দ নয়। তখন তারা তা খেতে

লাগল। প্রস্তর ও ব্রোঞ্জ যুগের মানুষ ধান থেকে খুঁটে খুঁটে পাথর দিয়ে পিষে চাল বের করে নিত। এই পদ্ধতি অনেক পরবর্তীকালে ওখরী ও ঢেঁকি ব্যবহার করতে শেখাল। আগুন আবিষ্কারের সাথে সাথে মানুষ চালকে সেদ্ধ করে খেতে লাগল, মানুষ দেখল সেদ্ধ না করে সোজাসুজি রৌদ্রে শুকিয়ে চাল বানিয়ে খেলে কোষ্ঠকাঠিন্য ৰাড়ছে। অথচ সেদ্ধ করে চাল বানিয়ে খেলে হয় না। তাই তারা আতপ চাল ছেড়ে সেদ্ধ চাল খেতে লাগল। সেদ্ধ চালকে বিহারে বলে উষ্ণা চাল। বিহার, উত্তর প্রদেশের মানুষেরা আতপ চাল খেতে অভ্যস্ত। সেদ্ধচাল হজম হয় সহজে। আতপ চাল যদি দুপুর বারটার পর খায় তবে কোষ্টকাঠিন্যের সম্ভাবনা কম থাকে। এর পরে মানুষ সেদ্ধ করা চাল বালির খোলায় ভেজে খেতে শুরু করল। দেখল তাতে খাবারটা শক্ত হয়ে যাচ্ছে। তখন তারা ধানকে আর একবার সেদ্ধ করে দেখল তাতে–ভাল নরম খাওয়ার তৈরী হচ্ছে। এরই নাম মুড়ি।

এছাড়া মানুষ ধানকে সোজাসুজি বালির খোলায় ভেজে খই আবিষ্কার করেছিল। যাই হোক, মুড়িতে পুষ্টি কম তবে জলখাবার হিসেবে কাজ চলে যায়। এইভাবে একই ধান থেকে অন্য ধরণের আহার তৈরী হয় বলে এর নাম ব্রীহি।

চাষের প্রথম অবস্থাতে মানুষ 'জুম' চাষ করত। পাথরে মাটি খুঁড়ে বীজ বুনত। বৃষ্টি হলে এই গাছে ফসল আসত। পরে ফসল তুলে নিয়ে সেই গাছে আগুন দিত। তাতে কিছুটা সার হত বটে তবে জমির উর্বরতা নষ্ট হয়ে যেত তিন চার কিস্তির পর। তখন মানুষ ভাবতে লাগল কি করে জমির উর্বরতা রক্ষা করা যায়। সেই সঙ্গে কেউ ভাবতে লাগল কি করলে গর্ত বেশী হবে আর বেশী জায়গা ধরে চাষ করা যাবে। তখন মানুষ হাল বলদের আবিষ্কার করল। মানুষ এও দেখল গোবর থেকে সার হচ্ছে। তাই তারা জমিতে সেই সারও ব্যবহার করতে লাগল। লাঙলের ফাল দিয়ে মাটিতে অনেক গভীর পর্যন্ত গর্ত করা যায়। তাতে উর্বরতা বাড়ে।

প্রাচীন কালে মানুষ জমির উর্বরতা বাড়ানোর জন্যে মাঝে মাঝে চাষ বন্ধ রাখত। যাকে জিরেন দেওয়া বলে। এখনও তার রেশ চলছে। এখনও অনেক চাষী জমি ফেলে রাখে জিরেন দেওয়ার জন্যে। পরবর্তী কালে মানুষ আরও লক্ষ্য করল যে বীজ ছেটানোর ফলে একজায়গায় দু'টো ৰীজ পড়ে গাছ ভাল হচ্ছে না। তখন নোতুন করে ভাবল। ৰীজ লাগিয়ে জমিতে কাদা করে ধান লাগাতে লাগল। যাকে ধান রোয়া

বলে। এই রোয়া শব্দটি সংস্কৃত রোপণ শব্দ থেকে এসেছে। রোয়ার ফলে ধানের গোছ মোটা হয়। গাছে ফুল বেশী আসে, দুধ আসে। চিটা বা ধুকড়ী কম হয়ে ফলন বেশী হয়।

পূর্ব বাঙলায় এইভাবে ধান রোপণ করা মুশকিল কেননা বীজতলায় ধানের চারা করে জমি চাষ করে লাগাতে গিয়ে দেখলে যে বৃষ্টিতে ধানের চারা ডুবে যাচ্ছে তাই তারা ধানকে ছিটিয়ে দিয়ে চাষ করতে লাগল। এতে ৰীজতলায় বীজধান ডুবে যাবার সম্ভাবনা কমে গেল। ধানের নিয়ম হ'ল যদি হঠাৎ বৃষ্টিপাতে ধানের মাথা ডুবে যায় তাহলে ধান মরে যাবে। কিন্তু যদি ধীরে ধীরে জল বাড়তে থাকে তাহলে ধানের মাথাও বাড়তে থাকে। যদি খুব বড় হয়ে যায় তবে তলিয়ে যাবে ও ফলন ভাল হৰে না। ধান সব ঋতুর ফসল। ভাদ্র মাসের আউশ ধান, বর্ষা শরৎ, হেমন্তে হয় হৈমন্তিক ধান। কথ্য বাংলায় একে হ্যামন্ ধান বা হ্যামৎ ধান বলে। বর্তমানে তা আমন হয়ে গেছে। শীতের শেষ থেকে গ্রীষ্মে হয় বোরো ধান।

আউশ ধান অল্প বৃষ্টিতে ডাঙ্গা জমিতে দোঁয়াশ মাটিতে হয়ে থাকে। আউশ ধানের গোড়ায় জল জমলে গাছ মরে যায়। মুর্শিদাবাদ, যশোরে, খুলনা, নদীয়া, উত্তর চব্বিশ পরগনায় দোঁয়াশ মাটি। তাই এখানে আউশ ধানের উপযুক্ত। উত্তর

বাঙলার জেলাগুলিও আউশের পক্ষে ভাল। কিন্তু বর্ষা আগে আসায় ধানের ফুল মরে যায়। আউশ ধানের আতপ চাল পেটের পক্ষে খারাপ নয়। একটু মোটা ও একটু লালচে। আউশ ধানের আতপ চালে কোষ্ঠকাঠিন্য হয় না তবে মোটা বলে 'ভদ্রলোকেরা' খেতে চায় না। আগেকার দিনে রাঢ়ে জমিদাররা চাষা–ভুষোদের এই ধান দিয়ে দিতো। আউশ ধানের চালের উন্নতমানের পাউরুটি হতে পারে, যাকে কেন্দ্র করে বেকারী industry প্রতিটি ব্লকে হতে পারে। জলখাবার, দুপুরের খাবার, রাত্রের খাবারের কাজও চলতে পারে। চলতে পারে যেহেতু এই পাউরুটি গম থেকে তৈরী নয়। তণ্ডুলভোজীদের মধ্যে বুদ্ধিজীবীদের সংখ্যা বেশী দেখা যায়। সুতরাং তারাও এটি খেতে পারে। আউশ ভাল হয় বৈশাখে লাগিয়ে যদি ভাদ্রে ওঠে। তবে জ্যৈষ্ঠ আষাঢ়েও লাগানো যেতে পারে। উত্তর ভারতে একে ভাদুই ৰলে। সেকালে বাঙলার মানুষ আউশ চাষ করত এই কারণে যে আশ্বিন মাস দারিদ্র্যের সময়, তখন আমন ওঠেনি। সেই সময় যদি ফসল পাওয়া যায় তবে খাজনা বা মালগুজারী দেওয়া যাবে। তাই আউশ লাগানো হত। ভাদ্রমাসে মনসাপূজোর সময়ও আউশের চাল খেত। সেকালে মনসাপূজোর সময় আউশ চালের ভাত ও কচু শাকের ঘন্ট খেত। এতে প্রমাণিত হয় এই

সূচীপত্র

সময় আউশ চাল উঠত। আউশ চাষে কম ঝুঁকি। কেবল বীজ ছেটানোর সময়, গাছ বাড়ার সময় ও ফুলের আগে হাল্কা বৃষ্টি হলেই আউশ ভাল হবে। তাই রাঢ়ের যে সমস্ত অঞ্চল অনাবৃষ্টিতে ভোগে সেই সমস্ত অঞ্চলেও আউশ হতে পারবে, আউশ ধানের তুষ থেকে bran oill তৈরী হবে, যেহেতু সব ধানের মতই আউশ ধানেও fat বা চর্বি আছে।

আউশ তুষের সঙ্গে পোড়া চূণ বা ঘুটিং দিয়ে সিমেন্ট তৈরী হতে পারে। পশ্চিম রাঢ়ে ও সমুদ্র তীরবর্তী অঞ্চলগুলিতে এই সিমেন্ট শিল্প হতে পারে। যদিও এই সিমেন্ট হ্যামং ধানের তুষ থেকে জাত সিমেন্টের মত উন্নত মানের হবে না। আমনের ময়দা থেকেও রুটি হতে পারে।

প্রাচীনকালে মানুষ তুষকে দেবতাজ্ঞানে পূজো করত। মানভূমের রাজা মানসিং-এর কন্যার নাম ছিল টুসু। আউশের সঙ্গে পায়রা ফসল লাগান চলবে না ও এই জমিতে চারা মাছ, কুচো মাছ ও ভুষো মাছও পাওয়া যাবে না। কেননা এতে জল থাকে না। আমাদের দেশে আউশ বোনা হয়। কারণ রুইতে গেলে কাদার দরকার হয়। আবার পূর্ব ৰাঙলায় এত বেশী জল হয় যে কাদা করাও মুস্কিল। তাই ছিটিয়ে দেওয়া হয়।

আগেই বলা হয়েছে যে মুর্শিদাবাদ ও নদীয়ায় দোঁয়াশ মাটি। তাই সেখানের মাটি আউশের পক্ষে উপযুক্ত। সুতরাং এসব অঞ্চলে আউশের ফসল বাড়ানো তা স্বয়ং–সম্পূর্ণ হতে পারবে। আউশের ফসল এখনও দেড়গুণ থেকে দু'গুণ ৰাড়ানো যেতে পারে।

আউশের খড়ে ঘর ছাওয়া অসুবিধা, তবে গোরু খায়। আউশের খড় পচালে পোয়াল ছাতু পাওয়া যাবে। সংস্কৃতে তাকে বলে 'কৰক'। আশ্বিন মাসে এগুলো বেরোয় বলে একে দুর্গাছাতুও ৰলে। খাদ্যগুণ থাকলেও এই ছাতুকে তামসিক পর্যায়ে ফেলা হয়েছে, তাই আনন্দমার্গীদের এটা খাওয়া নিষিদ্ধ। আউশের খড় থেকে উন্নত মানের কাগজ হয় ও নাইলন হলেও হতে পারে।

আমন–আমন রোয়া ও বোনা দু'রকমেরই হয়। পূর্ব বাঙলার মানুষ কম পরিশ্রমী তাই বোনা আমন লাগায়। তবে রোয়া হলে বেশী ফসল পেত। বলা প্রয়োজন জল আবহাওয়াগত কারণেই ওখানকার মানুষের শারীরিক ক্ষমতা কম।

আমন ধানের জমিতে চাষ দরকার। রাঢ়ে তাই করা হয়। ধূলোট চাষ বর্ষার আগের চাষ। বর্ষার পরের চাষ কাদাকরা চাষ। পূর্ব ৰাঙলায় একটা চাষ দিয়ে ধানের ৰীজ ছিটিয়ে

সূচীপত্র

দেওয়া হয়। আমন ধান লাগানোর কাজে বীজতলায় চার থেকে ছয় সপ্তাহের মধ্যে চারা তৈরী করে নেওয়া হয়, পরে সেই চারা তুলে অন্যত্র লাগান হয়।

ধান লাগাতে গেলে ত্রিকোণাকার করে (triangle) লাগাতে হবে ও মোটামুটি জল থাকলেই চলবে। আমন ধানের ক্ষেত্রে আশ্বিনে অর্থাৎ ফুল আসবার আগে এক পশলা জল চাই। নইলে ফল আসবে না। আশ্বিনে ফুল আসৰে ও অগ্রহায়ণে ধান থেকে কালা–কার্ত্তিক ধান কার্তিকে ওঠে। তা কেটে রবি ফসল লাগানো যায়। বাকী ধানের জমিতে রাই সরষে, ঠিকরে মটর, ঠিকরে ছোলা, ঠিকরে মুসুর–পায়রা ফসল হিসেবে ছিটিয়ে দিতে হয়। কিন্তু কালা–কার্তিকের পর চাষ দিয়ে বড় ছোলা, বড় মটর, আলু লাগান যেতে পারে। আজকাল hybreed ধান উঠেছে। অক্টোবর থাকতে থাকতেই ধান কাটা হয়। ফলে তখন চাষ দিয়ে রবি ফসল লাগনো যেতে পারে। গম কার্তিকে লাগালে তাড়াতাড়ি লাগান হয়, অগ্রহায়ণেও লাগালে নাবী হয়ে যায়। নদীয়া মুর্শিদাবাদ অঞ্চলে hybreed আমন ধান লাগালে তা কেটে গম লাগানো যেতে পারে, তবে দোঁয়াশ মাটি বলে জল জমে না, তাই আমন ভাল হবে না।

রাঢ়ের মাটি এঁটেল বলে জল আটকে রাখে, তাই রাঢ়ে পুকুরের সংখ্যা বেশী। বর্ধমানে ২৫,০০০, পুরুলিয়ায় ১০,০০০ পুকুর আছে। রাঢ়ের মাটি আমনের পক্ষে উপযুক্ত।

আমন যখন ফুলছে তখন অপেক্ষাকৃত উঁচু জমিতে বীজতলায় আউশের বীজ ছড়িয়ে দিলে আমন ওঠার সঙ্গে সঙ্গে চাষ দিয়ে ওই চারা আউশ রোপন করে দেওয়া যেতে পারে– শীতের আউশ হতে পারে। আবার তেমনি করে একই জমিতে আউশ ওঠার সঙ্গে সঙ্গে বোরোও রোপন করা যেতে পারে। আমন ধান ১২০ দিনের ফসল। সুতরাং ওই বীজতলায় আউশের বীজ চারা করে নিলে আউশ ধান হতে যত সময় লাগে ঠিক সেই সময়ের মধ্যেই আমন কেটে আউশ করা যেতে পারে।

বোরো ধানে গমের চেয়ে তিনগুণ বেশী জল লাগে। তাই নদীয়া, মুর্শিদাবাদ প্রভৃতি অঞ্চলে বোরো না চাষ করে গমের চাষ করাই ভাল। তবে গভীর নলকূপ থাকলে বোরো লাগানো যেতে পারে। বোরোর জমিতে সেইসব মাছ হতে পারে যারা পুকুরে ডিম পাড়ে। আমন বোরো ধানের জমিতে পর্যাপ্ত জল থাকায় ন্যাটা, খয়রা, পুঁটি, খরশোলা প্রভৃতি মাছ হয় যারা পুকুরে ডিম পাড়ে। রাঢ়ের মানুষ শুটকি মাছ খায় না। তবে

রাঢ়ে শুঁটকি মাছ তৈরী করে বাইরে বেচে দেওয়া যেতে পারে। তবে ভাল জাতের মাছ যেমন বাটা, পাবদা, রেওয়া, কাৎলা মাছের শুঁটকি হবে না।

রাঢ়ের মাটিতে জল যোগান দিতে পারলে আমন ধান খুব ভাল হবে। বর্ধমান, হাওড়া, হুগলী জেলায় বোরো চাষ বেশী হয়।

আমন ধানের খড় থেকে ঘর ছাওয়া যাবে। গোরুর খাদ্য হবে, কাগজও তৈরী হৰে ও খড় পচলে ছাতু হবে। বোরোর খড় নেতিয়ে থাকে। গোরু খায় না। ঘরের চাউনিও হয় না। তবে বোরোর খড় থেকে ভাল মানের কাগজ হবে। নাইলন জাতীয় তন্তুও হবে। বোরো খড় পচে গেলে তা থেকেও উন্নত মানের ছাতুও হবে।

আউশ ধানকে উত্তর ভারতে ৰলে ভাদুই ধান (autumn paddy)। আমনকে আঘানী ধান ৰলে আর বোরোকে ৰলে গর্মী (summer rice) ধান। আমন ধানের কুঁড়ো থেকে সবচেয়ে উৎকৃষ্ট সিমেন্ট হবে। এমনকি নদীয়া জেলাতেও তিন–চারটি সিমেন্ট factory হতে পারে। পাশেই চব্বিশ পরগনা (চব্বিশ

পরগনা আলীবর্দির সময় নদীয়াতে ছিল) থেকে গেঁড়ি, গুগলী, ঝিনুক, পোড়ানো চুণ আমদানী করা যেতে পারে। এতে করে ২৪ পরগনাতে চুণ industry হতে পারে। আবার সেই চূণ দিয়ে নদীয়াতে সিমেন্ট factory হতে পারে।

পূর্ব বাঙলায় বোরোর চাষ ছিল দেশ ভাগ হওয়ার আগেও। ময়মনসিং জেলার কিশোরগঞ্জ মহকুমা ও সিলেটে হবীগঞ্জ মহকুমাতে বোরো ধানের চাষ ছিল বেশী। বর্তমানে রাঢ়েও বোরো ধানের চাষ শুরু হয়েছে।

গমের চেয়ে তিন গুণ বেশী জল লাগে বোরোতে। ডালকলাই প্রভৃতি ফসলে কম জল চায়। কিন্তু গমে তিন বার সেচ চাই। আর গমের চেয়ে তিনগুণ জল চাই বোরোতে। তাই বোরো ধানের মাটি দোঁয়াশ হলে একটু ঝুঁকি থাকে। কারণ গোড়ায় জল থাকে না। তবে বোরো ধানে লাভ বেশী। গভীর নলকূপের সহায়তায় আজ বোরো ধানও লাগানো হচ্ছে। এমনকি চাষী বোরো ধান লাগানোর সুযোগ পেলে গম লাগায় না। কেননা গম হিমে ৰাড়ে আবার ফলার সময় হিম বেশী হলে নষ্ট হয়ে যায়। যেমন আলুর সময় কুয়াশা হলে ধসা রোগ ধরে। রাঢ়ের চাষী বোরো ধান বেশী জমিতে লাগাক, কম জমিতে গম ও উঁচু জমিতে আউশ লাগাতে পারে। আমন

ধানের তুষ থেকে আবার তেলও হতে পারে (bran oil)। খড় থেকে তো কাগজ হবেই। এই প্রসঙ্গে বলে রাখা ভাল যে যেখানে যে ধরণের কাঁচা মাল পাওয়া যাবে সেই ধরণের শিল্পই সেখানে গড়ে ওঠা অর্থনীতি সম্মত। রাঢ়ে যাতে বোনা আউশ না করে রোয়া আউশ করা যায় তাতে লক্ষ্য রাখতে হবে কারণ তাতে ফসল বেশী হবে। আমনের চাল গুঁড়ো করে যে ময়দা হবে তা থেকে উন্নত মানের পাউরুটি তৈরী করা যেতে পারে, যা বাইরেও যোগান দেওয়া যেতে পারে।

ধানের কুঁড়ো থেকে বিস্কুট হবে। চেন্নাইয়ে ফ্যাক্টরী হয়েছে। বাঙলাতেও হতে পারে। ধান উৎপাদন সবচেয়ে বেশী হচ্ছে চীন, তারপর বর্মা, ভারত, থাইল্যাণ্ডে। চীন ও ভারতে জনসংখ্যা বেশী হওয়ার জন্যে ধান রপ্তানি করতে পারে না। অন্যদিকে বর্মা ও থাইল্যাণ্ড জনসংখ্যা কম হওয়ায় রপ্তানি করতে পারে। এছাড়া ফিলিপাইনস, তাইওয়ান, জাপান, ধান্য উৎপাদনে স্বয়ংসম্ভর। ধান উৎপন্ন বেশী হয় বর্ধমান, বীরভূম, পশ্চিম দিনাজপুর, মাঝারী হয় মেদিনীপুর, বাঁকুড়া, কুচবিহারে। ঘাটতি আছে জলপাইগুড়ি দার্জিলিং, মুর্শিদাবাদ ও নদীয়ায়।

উত্তর বাঙলায়, পূর্ব বাঙলায় ও অসম তিলের পক্ষে ভাল। তিল তিন ধরণের হয়, লাল তিল গরমে, শাদা তিল

রবিশষ্যের সময় ও কালো তিল বর্ষাতে হৰে। আর্দ্র জলবায়ু হওয়ায় সর্ষে ভাল হয় না। তিলের খোসার সার হবে। তিল খোসার খইল থেকে পশুখাদ্য ও সার হবে। তিলের খোসা ছাড়িয়ে ঘানিতে দিলে যে খইল হৰে তা থেকে আটা হবে। তা থেকে রুটি হবে, ফুটিয়ে খাওয়া যাবে ও সুজির মত খাওয়া যাবে। তিল একটু ভিজিয়ে পাটের বস্তার গায়ে ঘষলে ছাল সরে যাবে। খোসা ছাড়ানো যাবে। বর্ধমানের প্রসিদ্ধ তিলের সন্দেশ, গয়ায় তিলকূট এই ভাবে খোসা ছাড়িয়ে তৈরী হয়। তিল তিন মাসের ফসল। তিলের জন্যে জমিকে তিন বার হাল দিতে হয় ও দু'বার জল সেচন করতে হয়। কালো তিল তিলেদের মধ্যে উৎকৃষ্টতম। যারা সহজেই রেগে যায় তাদের জন্যে এর তেল ভাল ওষুধ। সাদা ও লাল তিলকে ভোজ্য তেল হিসেবে ব্যবহার করা যেতে পারে। তিল তেলকে সুগন্ধী তেল হিসেবে ব্যবহার করা যেতে পারে কারণ এই তেলের মধ্যে বিভিন্ন সুগন্ধকে শুষে নেওয়ার ক্ষমতা রয়েছে। নারকোল তেলের মধ্যে সুগন্ধ শুষে নেওয়ার ক্ষমতা সবচেয়ে কম, কিন্তু মাথায় তেলের জন্য তা সবচেয়ে ভাল। শাদা তেল দেখতে সুন্দর। লক্ষ্ণৌয় বেশ কিছু রুচিকর খাদ্য শাদা তিল দিয়ে তৈরী হয়।

বাঙলাদেশ ও উত্তর ৰাঙলায় জমি জলের তলায় থাকে বলে জমিতে মাছ হয় না। আর শুঁটকিও হয় না। পশ্চিম বাঙলায় অনেক খাল থাকাতে জমিতে মাছ হ বেশী। ৰার্মা, থাইল্যাণ্ড, জাপানে শুটকি মাছ রপ্তানি করা যাবে। যে জমিতে একান্ত ভাবে চাষ দেওয়া যাবে না ও ধান হবে না সেখানে পায়রা ফসল করা যাবে। আমন ধানের জমির পাশে ভাল চাষ করা যেতে পারে। তাতে করে ধানের সঙ্গে সঙ্গে মাঠে ডাল পাওয়া যাবে। একসঙ্গে ভাত, মাছ, ডাল সবই পাচ্ছি।

ধানের জমিতে নিড়েন দিয়ে চাপান সার দিতে হয় নোতুবা আগাছা সার টেনে নেৰে। আবার পায়রা ফসলের বীজ ছেটানোর আগের সার দিতে হবে। না হলে পায়রা ফসল সার টেনে নেবে। তাতে ধানের ফলনের ক্ষতি হৰে। সেইজন্যে ধানে ফুল আসার পরেই পায়রা ফসলের বীজ বুনতে হবে। যদি পায়রা ফসল আগে দেওয়া হয় তাহলে মাছেরা ধানের ক্ষেতে চলাফেরা করতে পারবে না। এতে ধান ও মাছ উভয়েরই বৃদ্ধি সংকুচিত হবে।

রেশমের স্পিনিং মিল হৰে–মালদা, সুজাগঞ্জ, মুর্শিদাবাদের জঙ্গীপুর ও লালবাগে বীরভূমের বসোয়া বিষ্ণুপুর, বাঁকুড়ার বিষ্ণুপুর মহকুমায়।

সূচীপত্র

তামাকের প্রক্রিয়াকরণের কাজ হবে কোচবিহারে ও বাঁকুড়াতে।

কাজুর প্রক্রিয়াকরণ হৰে কাঁথির রামনগর থানায়, সুতাহাটা ও নন্দীগ্রাম ব্লকে। কাজুর ফুল আলাদা করে ছেঁড়ার দরকার নেই (ঝরে পড়লেও)। ফুল থেকে ভাল জাতের প্রচুর মধু হয়। ফুলকে পচিয়ে এ্যালকোহল তৈরী হয়। বাঙলার সমুদ্র উপকূল অঞ্চলে সমুদ্র–শৈবাল (sea-weeds) থেকে আয়োডিন ও কাজুর ফুল থেকে এ্যালকোহল নিয়ে ঔষধ–শিল্প হতে পারে।

গম

গম পৃথিবীর দ্বিতীয় প্রধান খাদ্য। আর্যরা যখন মধ্য এশিয়ার বাসিন্দা ছিল তখন তারা কেবল যবের চাষ জানত। পারস্য এসে গমের সংস্পর্শে প্রথম আসে। যবের পুষ্টিমূল্য আছে। এর থেকে বার্লি তৈরী হয়। তবে খেতে গমের মত অত স্বাদ নেই। যবের খোসা ছাড়িয়ে পিষে তৈরী হয় বার্লি। আর যদি খোসা না ছাড়িয়ে পেষা হয় তবে তা থেকে আটা হয়। যব থেকে ছাতুও তৈরী হয়।

গম যাঁতায় পিষে (যন্ত্রক) যাঁতা আটা তৈরী হত। আটাকল তখন ছিল না। বড় বড় ডাল ভাঙ্গার যাঁতার মত গম ভাঙ্গার যাঁতা ছিল।

যাই হোক, আর্যরা এদেশে এসে গম খেয়ে দেখলে এর স্বাদ অনেক বেশী। যবের মত নয়। জিবকে সংস্কৃতে ৰলে 'গো'। যা খেয়ে গো অর্থাৎ জিহ্বায় 'ধুম' অর্থাৎ উৎসব লেগে গেল তাই 'গোধুম'। গোধূম > গোহুম > গোধুম (বিহারে ও পূর্ব উত্তর প্রদেশে ৰলে) > গহম্ (রাঢ়ে ও উড়িষ্যায় বলে) গম। পাঞ্জাবীতে ৰলে কণক। পাকলে সোণার মত লাগে ৰলে একে ৰলে কণক। দক্ষিণ ভারতে তামিল ভাষায় বলে গোধূমাই। ইংরেজীতে wheat। যে জিনিস দেখতে শাদা তার ইংরেজী white। তবেই abstract noun-এ রয়েছে দু'টো রূপ: whiteness ও wheat। বর্তমানে শ্বেতত্ব অর্থে > শব্দটির প্রচলন নেই।

ভারতে এসে আর্যরা দেখলে ভারতের পশ্চিম দিকে গমের চাষ আছে। দক্ষিণ ভারতে কোনকালেই গমের চাষ ছিল না। গম চায় উর্বর মাটি, সমতল ভূমি, অল্প জল ও হিমবায়ু। অবশ্য বর্তমানে দক্ষিণ ভারতে অল্প অল্প গমের চাষ হচ্ছে। আসলে গম হ'ল রবি ফসল। গম চাষ অল্প জল বা মাটি

ভিজে থাকলেই চলে। তবে বৃদ্ধি হয় হিমেতে। দক্ষিণমেরুর মানুষের কাছে সূর্য যখন উত্তরায়ণে থাকে আবার উত্তরমেরুর মানুষের কাছে সূর্য যখন দক্ষিণায়নে থাকে তখন রবি ফসল হয়ে থাকে। ইকুয়েডর দক্ষিণাংশে সূর্য থাকতে থাকতে গমের চাষ সারতে হবে। গমের গোড়ায় একবার, গাছ ৰাড়ার সময় একবার ফুল আসার সময় একবার সেচ দিতে হৰে। গমের জন্যে চাই উর্বর মাটি কিন্তু দোঁয়াশ (এঁটেল বেলে) হতে হবে। কেননা গমের গোড়ায় জল থাকলে গম পচে যায়। রাঢ়ের যে সমস্ত জায়গায় দোঁয়াশ মাটি রয়েছে সেখানে গম ভাল হবে।

ৰাঙলার গম চাষে সবচেয়ে ভাল এলাকা মালদা, মুর্শিদাবাদের লালগোলা, বহরমপুর মহকুমা, গোটা নদীয় জেলা, চব্বিশ পরগনার উত্তরাংশ, যশোর ও খুলনার উত্তরাংশ, ৰাঙলাদেশে গম হবে না বললেই চলে। হলেও গায়ে ছাতা পড়ে যাবে ভিজে আবহাওয়ার জন্যে। তবে কুষ্টিয়া জেলাতে হবে। ফরিদপুর, ঢাকায় গমের চাষ হবে না কারণ গম চায় শুষ্ক আবহাওয়া। ঠিক একই কারণে অসম, উত্তর বাঙলায় কিছু অংশে গম হবে না, গাছ হলেও দানা হবে না। দানা হলেও ছাতা পড়বে। মগধে ভাল গম হবে না। মিথিলায় ভাল হৰে। অন্যদিকে উত্তর প্রদেশ হরিয়ানাতেও গম ভাল হবে। সবচেয়ে

ভাল হবে পঞ্জাবে। পঞ্জাবের মধ্যে আবার লুধিয়ানা জেলায় সবচেয়ে বেশী ফলন হবে।

বাঙলায় মেমারী–১ ব্লকে সবচেয়ে ভাল গম হবে। যেমন গলসী ব্লক হলদে সরষের পক্ষে ভাল। ভাল আলু হবে বর্ধমানের জামালপুরে ও উত্তর প্রদেশের ফারুখাবাদে।

উপযোগিতা–গমে আটা করা ছাড়াও উখরীতে কুটে সুজিও করা যেতে পারে।

'সুজি' সুরজিৎ শব্দ থেকে এসেছে। সুরজিৎ > সুজ্জি > সুজি। গমের খোলা ছাড়িয়ে ভেতরের শাদা অংশটাকে পিষে তৈরী হয় ময়দা। ইংরেজীতে flour। ইংরেজীতে আটাকে আমরা বলি coarse flour। অন্টক > অন্টিকা > অন্টিয়া > আটা। (যা এঁটে রয়েছে)।

বাঙলায় যে কয়েকটা জেলার গম ভাল হয়ে থাকে তার মধ্যে মালদা জেলায় টাল ও দিয়াড়া এলাকায়, মুর্শিদাবাদ জেলার লালবাগ ও বহরমপুরে সদর মহকুমায়, নদীয়ার গোটা জেলায়, উত্তর ও দক্ষিণ সমগ্র চব্বিশ পরগনায় জেলা দু'টিতে, পূর্ব রাঢ় আর পশ্চিম রাঢ়ে। গমের ভাল বীজ তৈরী হয় বাঁকুড়ায়।

উষ্চ ফলনশীল আমন ধান যখন অক্টোবরে পাকতে শুরু হয় তখন ধান ওঠার পর জমিতে দু'টো বিপরীত চাষ দিতে হয়। এতে আর জল দেওয়ার দরকার পড়বে না। যেহেতু অল্প জলের ফসল তাই জল একটু কম হলেও ক্ষতি নেই। দ্বিতীয়বার চাষ দেবার সঙ্গে সঙ্গে ৰীজ ছড়িয়ে দিতে হবে। তারপর অঙ্কুর হলেই সেচ দিতে হবে।

গম লাগাবার পক্ষে প্রকৃষ্ট সময় হচ্ছে তুলারাশি যখন বৃশ্চিক আর ধনু রাশির ৯০° কোণে আছে তখন। বাংলা মাসের কার্ত্তিক, অগ্রহায়ণ ও পৌষের সাত তারিখ পর্যন্ত। এর মধ্যে জলদি জাতের গম লাগাতে হয় কার্ত্তিক থেকে অগ্রহায়ণের ১৫ তারিখ পর্যন্ত ও তারপর পৌষের সাত তারিখ পর্যন্ত লাগাতে হবে নাবী জাতের গম। রাঢ়েতে যদি সেচের বন্দোবস্ত করা যায় তাহলে গম চাষ করা যেতে পারে। ময়ূরাক্ষী, কোপাই, অজয়, বক্রেশ্বর, দ্বারকা, বরাকর, কাঁসাই, কুমারী, দুলুং, কেলেঘাই, ছোটকী গুয়াই, বড়কী গুয়াই, সুবর্ণরেখা প্রভৃতি থেকে সেচের ব্যবস্থা করা যেতে পারে। এই প্রতিটি ক্ষুদ্র সেচ প্রকল্পে–বড় বাঁধ বা ড্যাম না করে–২৫ লাখ থেকে পাঁচ কোটি টাকার মধ্যে ব্যয়কে সীমিত রাখতে হবে।

বাঙলায় গমের উৎপাদনের জমির মান বিচারে বাগড়ি হচ্ছে 'A' group। পূর্ব রাঢ় হচ্ছে 'B' group, পশ্চিম রাঢ় হচ্ছে 'C' group আর উত্তর বাঙলা হচ্ছে 'D' group, কেননা উত্তর বাঙলায় ভিজে আবহাওয়ার জন্যে গমে ছাতা ধরে যাবে। নদীয়া জেলায় এক বিঘা জমিতে যত গম পাওয়া যাৰে জলপাইগুলিতে তার অর্ধেক পাওয়া যাবে।

সবরকম ডাল–কলাই–এর মূলে নাইট্রোজেন তৈরী হয়, যা জমির উর্বরতা বাড়ায়। তাই গমের ক্ষেতেই সহায়ক ফসল হিসেবে যদি কলাই লাগানো যায় তবে তা গমের ফলন ৰাড়িয়ে দেৰে। উপযুক্ত সময়ে কলাই গমের সঙ্গে উপযুক্ত মিশ্র ফসল হিসেবে লাগাতে হৰে। অর্থাৎ জলদি জাতের গমের সঙ্গে–জলদি কলাই আর নাবী জাতের গমের সঙ্গে নাবী জাতের কলাই। এই গুণ রাই সরষেরও আছে। যদি জমিতে নব্বই ভাগ গমে দশ ভাগ কলাই লাগানো যায় তাহলে নব্বই ভাগ, গম থেকে একশ' ভাগ গম ও দশ ভাগ কলাই পাওয়া যাবে। এটি হবে জমিতে নাইট্রোজেনের জন্যে। এইভাবে কলাই বাড়তি ফসল হিসেবে পাওয়া যাবে। এইভাবে মোট উৎপাদন বেড়ে যাবে।

গমের অসুবিধা হচ্ছে এই যে, যখন গমের দানা তৈরী হয়ে গেছে অথচ পাকেনি তখন যদি পূর্বা হাওয়া বয় তাহলে গম পাকৰে না। গমে ছাতা ধরে যাবে। আর সেই সময় যদি পশ্চিমী হাওয়া বয় তাহলে খুব ভালভাবেই পাকৰে। গম শৈত্যের ওপর নির্ভরশীল। অর্থাৎ শীত পড়লে ফসল বাড়ে, শীত কম হলে কখনো ফসল কমে যায়, কিন্তু অত্যধিক তুষারপাতে গমের ফলন খারাপ হয়ে যায়।

গমচাষে সারের দরকার আছে। পুষ্টিমূল্য আতপ চালের চেয়ে একুট বেশী। যেখানে গম ভাল হয়, ৰাঙলার সমস্ত অঞ্চলে সেখানে যথেষ্ট নদী–সেচের ব্যবস্থা নেই। তবে বিধাতার আশীর্বাদ যে সেখানে জলের স্তর খুব নীচু নয়, তাই অগভীর নলকূপ (shallow tubewell)-এর সাহায্যে গম চাষ করা যেতে পারে।

গমের বাজার পৃথিবীতে খুবই ভাল। গমকে টুকরো করে পিষলে সুজি হয়। গমকে খোসা ছাড়িয়ে পিষলে হয় ময়দা ও খোসা সমেত পিষলে হয় আটা। রাঢ়ের যে সমস্ত জায়গায় মাটি হলদে তা সর্যের পক্ষে ভাল নয়। যেখানে পাথুরে মাটি রয়েছে অথচ তা উর্বর, সেখানে গম হবে। কিন্তু যেখানে যথেষ্ট শীত সেখানে যব হয়, গম হয় না। বাঙলাদেশের মাটিতে তিল ভাল

হয়। যেখানে আবহাওয়া কিছুটা গরম যা গম সহ্য করতে পারেনা, সেখানেও যব হবে। যেখানে শীত খুব বেশী যা গম সহ্য করতে পারে না সেখানে হবে ওটস। ওটস মোটা দানার ফসল, পুষ্টিমূল্য গমের চেয়ে কম, তবে কাছাকাছি। এর রুটি করা মুশকিল। রুটি তৈরী করতে গেলে আট-দশ টুকরো হয়ে যায়। সেঁকতে গেলে ফেটে যায়। উত্তর প্রদেশে চাষীরা গম, ধান ভাল হওয়া সত্বেও ওটসের দানা খায়। এই ওসের বড় দানাকে বলে জই, ছোট দানাকে বলে রাই। কেউ কেউ এই দু'টোকে আলাদা বলে মনে করেন। সম্পন্ন দেশে জই বা রাই পশুখাদ্য হিসেবেও ব্যবহৃত হয়। ইংল্যাণ্ড উর্বর, স্কটল্যান্ড অনুর্বর। তাই ইংল্যাণ্ডে গম, আর স্কটল্যান্ডে ওটস হবে। আর রাশিয়ার উত্তরাংশে ওটস হবে। ওটসজাত সুজির ইংরাজী নাম (porridge) যা স্কটল্যাণ্ডে প্রধান খাদ্য। আগে আমরা গমের জন্যে বিদেশের ওপর নির্ভরশীল ছিলুম। এখন বাঙলাতেই সেই গম তৈরী হচ্ছে। বাঙলায় যখন সরকার প্রথম নদীয়া জেলায় ৩০/৩২ বছর আগে গমের চাষ শুরু করলেন তখন গমের সঙ্গে ওটস মেশান ছিল। তাতে ওরে ফসল বেশী হয়ে গেল, আর সব সার টেনে নিয়ে গমের চেয়ে ওটস গাছ বেড়ে গেল। তাই ফসল ফলল না। চাষীরা চাষ করতে চাইত না তবে যা

গম ছিল তাতে কিছু ফসল হয়েছিল। তখন সরকার চাষীদের ভাল ৰীজ দেবার আশ্বাস দিলেন। গম চাষের প্রচলন হ'ল।

বর্ধমানে, হুগলী ও হাওড়ায় বোরো ধানের চাষ লাভজনক। পশ্চিম রাঢ়ে গম ভালই হৰে। তবে নীচু জমিতে বোরোর চাষেই সঙ্গত। নদীয়া জেলায় বোরোর চেয়ে গম লাগালে ভাল। আজকাল অবশ্য গভীর নলকূপের দ্বারা বোরো ধান চাষ করা হচ্ছে। তবে তা খুব যুক্তিযুক্ত নয়। কেননা সেই জল সবটাই যে চুঁইয়ে নীচে চলে যাৰে তা নয়, কেননা অনেকটা জল রোদে শুকিয়ে যাবে বা পাশের গাছপালারাও টেনে নেবে। তাতেও জলের স্তর অনেক নীচে নেমে যাবে। ফলে নদীয়া, মালদা প্রভৃতি অঞ্চলে জলের স্তর নীচে চলে যাওয়ায় আর জল পাওয়া যাবে না। গমের ও অন্যান্য ফলের বাগান শুকিয়ে যাবে। তাই সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে। তাই সেচের জন্যে নদীর জলকে কাজে লাগাতে হবে।

কলকাতাকে বাঁচাতে গেলে বন্দরের নাব্যতা বজায় রাখা দরকার। যাতে ভাগীরথী নদীর বহমানতা অক্ষুণ্ণ থাকে তাই ফারাক্কা বাঁধ তৈরী করা হয়েছিল। আজ ভাগীরথীতে যে পরিমাণ জল পাওয়া যাচ্ছে ততটাই জল বাঙলাদেশেরও পাওয়া দরকার। অন্যথা নদীগুলি সব শুকিয়ে যাবে ও বাঙলাদেশ

ধ্বংস হবে। এইজন্যে ব্রহ্মপুত্রের জল ধুবড়ি থেকে খাল কেটে, দিনাজপুর, মালদা জেলা হয়ে মানিকচক দিয়ে গঙ্গায় পড়ার ব্যবস্থা করতে হবে। ব্রহ্মপুত্রের পুরনো ধারা হচ্ছে ধুবড়ি, দক্ষিণ শালমারা ও মানিকচক হয়ে ময়মনসিংহ জেলা; এখানে বাহাদুরাবাদ (বাহাদুরগঞ্জ) থেকে ব্রহ্মপুত্র বাঁদিকে বাঁক নিয়ে ভৈরববাজারের কাছে মেঘনায় মিশেছে। এখন ব্রহ্মপুত্র যে ধারা পাবনা–সিরাজগঞ্জ হয়ে গেছে–তা নূতন ধারা। ১৫০ বছর আগেও এই ধারাটি ছিল না। একবার তিস্তায় ভারী বন্যা হয়। তাতে ব্রহ্মপুত্র বন্যার জল বহন করতে পারে নি। বাহাদুরাবাদ থেকে দক্ষিণ দিকে নেমে গোয়ালন্দে এসে পদ্মায় মিশে গেল। পুরনো ধারা পরিত্যক্ত হ'ল, তারই ফলস্বরূপ ময়মনসিং জেলায় ব্যাপক ম্যালেরিয়া দেখা দিল। ময়মনসিং–এর পুরনো নাম নাসিরাবাদ। নূতন ব্রহ্মপুত্র বাহাদুরাবাদ থেকে গোয়ালন্দ হয়ে পদ্মায় মিশে গেল। নূতন ব্রহ্মপুত্রের জল বাঙলাদেশের কাজে লাগল। তাই ব্রহ্মপুত্রের জল ধুবড়ি থেকে অন্যদিকে চালিত করে দিলে কোন ক্ষতি নেই। অথচ এতে ৰাঙলাদেশ প্রচুর জল পাৰে।

যাই হোক, নদীয়া জেলায় শ্যালো বা অগভীর নলকূপ নিয়ে বেশী মাতামাতি না করাই ভাল।

সূচীপত্র

গমের পুষ্টি আতপ চালের চেয়ে বেশী হলেও গমে অম্ল (acid) থাকায় ৫০/৫৫ বছর বয়সের পরে গ্যাসের কষ্ট (gastric trouble) বা কলিক ব্যথা (colic pain) তৈরী করে দেয়। অনেক সময় যক্ষা রোগ হতে পারে। তাই গম দু'বেলা খাওয়া উচিত নয়। তাতে মস্তিষ্কের পুষ্টি হয় না। বিহারের লোকেরা দিনে খাটাখাটনি করে বলে গম খায়, ভাত কিন্তু তারা একবেলাও খায়।

গমের খড় থেকে কাগজ তৈরী করা লাভজনক নয়। তবে গোখাদ্য হিসেবে ভাল। গমের তুষ পায়রাদের খাওয়ানো ঠিক নয়। কেননা পায়রার পেট খারাপ হয়। গমের সঙ্গে মিশ্র হিসেবে পোস্তও লাগানো যেতে পারে।

গমের সঙ্গে জই মিশে থাকে ৰলে ৰীজ নির্ধারণে সতর্ক থাকতে হবে। বীজের জন্যে গমের ফার্ম বাঁকুড়ায় হলে ভাল হয়, কেননা বাঁকুড়া তথা রাঢ়ের মানুষের প্রিয় খাদ্য পোস্ত। কম করেও বছরে দেড় কোটি টাকার পোস্ত কেনে রাঢ়বাসী। অথচ কেন্দ্রীয় সরকার সেখানে পোস্ত লাগাবার অনুমতি দেয়নি। পোস্ত যে রাঢ়ের মানুষের কতখানি প্রিয় তা সেকালের একটি ছোট্ট গল্প থেকেই বোঝা যায়। প্রবাদ আছে যে

প্রাচীনকালে রাঢ়ের মজুর দৈনিক আট পয়সা আয় করে সে বাঁচায় তিন পয়সা–আর

বাকি পাঁচ পয়সা নিয়ে বাজার করতে যায়–কেনে দুই পয়সার চাল। এক পয়সার তেল। এক পয়সার নূন–তেল–মসলা ও এক পয়সার পোস্ত। মনে রাখা দরকার যে পোস্ত দানা সাত্ত্বিক, পোস্ত গাছটা রাজসিক কিন্তু তার আঠা তামসিক। পোস্ত গাছের আঠাটা হ'ল মাদক দ্রব্য–তাই বলা হয় অহিফেন। ইংরেজীতে অপিয়াম (opium)।

ঘাসের বীজ প্রায় সবাই সাত্ত্বিক। তবে ধানকে জলে ভিজিয়ে রোদে শুকিয়ে যে আলোচাল বা আলোচিড়ে হয় তাও সাত্ত্বিক। সাধারণতঃ গ্রামাঞ্চলের দিকে সূত্রধরেরা এই চিড়ে কোটার কাজ করে থাকেন। ধানের চালের ভাতকে রাত্রে হাঁড়িতে রেখে দিয়ে, কিছুটা তেঁতুল জল দিয়ে গোটা রাত ফেলে রাখলে তা গেঁজে যায়। নুন, লংকা মিশিয়ে জলটাকে ছেঁকে নিলে যা পাওয়া যায় তাকে বলে আমানি। এটি তামসিক যদিও সাস্ট্রোক ও স্ত্রীরোগে এর ঔষধীর গুণ আছে। কোকো কোলা, ক্যাম্পাকোলা এরা রাজসিক। তাই যতী–ব্রতী–বিধবা–ব্রহ্মচারী এদের পক্ষে এসব খেতে নেই।

গমও সাত্ত্বিক কিন্তু গমকে গেঁজিয়ে যে গেঁজানো মদ তৈরী হয় তা রাজসিক। তবে গেঁজানো গমকে distilled করে চোলাই করে যে মদ পাওয়া যায় তা তামসিক। গমের সুজি সাত্ত্বিক। Distilled বা চোলাইয়ের কাজে যে বক যন্ত্র বা retort ব্যবহৃত হয় তা আবিষ্কার করেছিলেন বৌদ্ধ **ভিক্ষু নাগার্জুন।** বিয়ারও (bear) তামসিক। গমের মদ লাভজনক নয়।

আগে কলমকাঠি, সিঁদুরে, বাদশাভোগ ইত্যাদি ধান প্রচলিত ছিল। গমের মুখ্য দু'টো প্রজাতি হচ্ছে (১) দুধিয়া ও (২) লালকা। আজ উৎপাদন বাড়ানোর দিকে নজর রয়েছে, তাই গমের উৎপাদন বেড়ে চলেছে ঠিকই কিন্তু গমের স্বাদ কমে গেছে। আমি বৈয়ষ্টিকভাবে বিজ্ঞানকে উৎসাহ দেবার পক্ষপাতী। তাই কৃষি বিজ্ঞানীরা যেমন গমের উৎপাদন বাড়াবার দিকে চেষ্টা করছেন তেমনি তাঁরা স্বাদ বাড়াবার দিকেও নজর দিন। দুই প্রজাতির মধ্যে লালকা গম বেশী মিষ্টি।

জই ও রাই ভাল পশুখাদ্য। বিশেষ করে ঘোড়ার খাদ্য হিসেবে বিদেশে ব্যবহৃত হয়। কিন্তু ভারতবর্ষে গরীব মানুষেরাও তা খেয়ে থাকে। বিদেশী পচা আটা পশুও খায় না। অথচ এশিয়ায় তা গরীব দেশগুলির মানুষেরা জলে গুলে খেয়ে থাকে।

ভুট্টা

ভুট্টা আমেরিকার ফসল। সাহেবরা ওদেশ থেকে ভারতে এনেছিল। এটা হ'ল সব ঋতুর ফসল। সময় নেয় ষাট থেকে আশি (৬০–৮০) দিন। ভারতে কোথাও কোথাও রাজেন্দ্র ভুট্টার প্রচলন রয়েছে যা পঞ্চাশ দিনে জন্মায়। তবে ফলন কম। ভারতের রাষ্ট্রপতি ডাঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদের নামে এই রাজেন্দ্র ভুট্টার নামকরণ হয়েছে।

ভুট্টা উর্বর জমি, শুকনো আবহাওয়া চায়। গোড়ায় যেন জল না জমে। পক্ষান্তরে পাট চায় ভিজে আবহাওয়া ও বেশী বৃষ্টি।

ভুট্টা পিষে আটা হয়। আটা ভালভাবে মেখে নেচি ঠিকভাবে করা যায় না। অতি কষ্টে বড় বড় রুটি করা যায়। ভুট্টার রুটিকে অঙ্গিকায় মাণ্ডা বা মাড়া ৰলে। ভুট্টার খোসা ছাড়িয়ে পিষলে ময়দা হয়। বাজারে অন্যান্য ময়দার সঙ্গে ভুট্টার ময়দা ভেজাল দিয়ে বিক্রী করা হয়। ভুট্টার ময়দা ভুট্টার আটার মত ততটা ভসভসে হয় না। এই ভুট্টার দানা বালির খোলাতে ভেজে পপকর্ণ তৈরী হয়। এর স্বাদ তেমন নেই কিন্তু খাদ্যমূল্য

সূচীপত্র

আছে। ভুট্টার চিঁড়েও হয়। তবে একটু সেদ্ধ করে ও জলে ভিজিয়ে দিয়ে করতে হয়। জাপান উন্নত দেশ। তবুও তার জলখাবার ভুট্টার চিড়ে–যাকে আমরা cornflackes বলে থাকি।

ভারতের বিহার ও অসম রাজ্য বাইরে থেকে ধান কেনে। কিন্তু উত্তর প্রদেশকে ধান কিনতে হয় না কেননা ওখানকার লোকেরা ভাত কম খায়। বাঙলার বর্ধমানে প্রয়োজনের তুলনায় ২১/২ গুণ বেশী ধান জন্মায়। বাঁকুড়া, পুরুলিয়া, কোচবিহারে ভাল বৃষ্টি হলে ধানের ঘাটতি হবে না। অন্য দিকে হাওড়া, চব্বিশ পরগনা, নদীয়া, মুর্শিদাবাদ, মালদা, জলপাইগুড়ি, দার্জিলিং ঘাটতি এলাকা। এর মধ্যে দার্জিলিং পাহাড়ি এলাকা। মাত্র পাঁচ মাসের ভুট্টা হয়। বাকী খাদ্য যোগান দেয় সমতল এলাকা। বর্ধমান ডিভিসির জল পায় বলে আমন, আউশ, বোরো তিনটি ধানই হয়। হাওড়াতেও তিনটে ধান সহজেই উৎপাদন করে খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ করা যেতে পারে। মামীর

ভুট্টা সর্ব ঋতুর ফসল। ভুট্টা একটু অনুর্বর মাটিতেও হতে পারে। দার্জিলিঙে টেরাসিং (Terracing) করে ভুট্টা লাগান হয়। ৰাঙালীস্তানে প্রায় সর্বত্রই শরতে, হেমন্তে হ্যামৎ ধান লাগনো হয় বলে ভুট্টা লাগাবার সুযোগ কম। তবে বাকী সময় বসন্তে গ্রীষ্মে

ভুট্টা লাগানো যেতে পারে। অথবা দুই ফসলের মাঝখানে বাফার ফসল হিসেবে লাগানো যেতে পারে।

অনেকের ধারণা ভুটানের মালভূমি (plataeu) এলাকায় অন্য কিছু লাগানো সম্ভব নয়। তাই বেশী পরিমাণে ভুট্টা লাগানো লাভজনক। হিন্দীতে ভুট্টাকে ৰলে মকাঈ। বাংলায় ভুট্টা, ইংরেজীতে Maize। ভারতের সর্বত্র যেখানে আবহাওয়া শুকনো ও বৃষ্টির জল জমে না সেখানে ভুট্টা হবে।

ডালশস্য

বাঙলার শীত–গ্রীষ্ম–বসন্তের খাদ্য হিসেবে জান্তব প্রোটিনের দিন শেষ হয়ে আসছে। কারণ দেশে সর্বত্রই আজকাল গোচারণভূমির অভাব দেখা দিচ্ছে। আজ থেকে কিছুদিন আগেও বড় বড় মাঠ ছিল তাতে গোরু চরত ও গোবর সার পাওয়া যেত। কিন্তু জনসংখ্যা বৃদ্ধি ও অন্যান্য প্রাকৃতিক কারণে সেই সমস্ত বিস্তীর্ণ গোচারণভূমি এখন অপসৃয়মান। গো অর্থাৎ যে জন্তু সবসময়ে চরছে। হাতে পায়ে চলছে। মহিষও কোথাও দাঁড়িয়ে থাকতে চায় না, সর্বদা যে জলে ভেসে থাকতে চায়। জান্তব প্রোটিন (animal protein) জীবজন্তু থেকে আসে। যেমন–মাছ, মাংস, ডিম, দুধ, ছানা, মাখন ইত্যাদি থেকে।

দুধ জান্তব প্রোটিন। কিন্তু দুগ্ধজাত বস্তু মাখন, ক্রীম, ঘি প্রভৃতি জান্তব স্নেহজাতীয় পদার্থ। এখন পশুপালনের ভূমি কমে যাচ্ছে, আর অদূর ভবিষ্যতে জান্তব প্রোটিন খাদ্যের দারুণ অভাব দেখা দেবে।

এক এক দেশে এক এক ধরণের প্রধান খাদ্য (staple foods), যেমন–বাঙলার প্রধান খাদ্য ভাত, আয়ার্ল্যাণ্ডের আলু, আবার কোন দেশের রুটি–মাখন। একটি সময় আসছে যখন মাংসভোজী দেশগুলি জান্তব প্রোটিনের অভাবে খুবই বিপদে পড়ৰে। গোরুকে এক জায়গায় ছোট দড়ি দিয়ে বেঁধে রাখা যাবে। কিন্তু ভেড়ার বিস্তীর্ণ চারণভূমি চাই। তেমনই উপযুক্ত চারণভূমি না থাকলে ছাগল, হাঁস–মুরগী পালন করা যাবে না। তাই স্বাভাবিক ভাবে আমাদের জান্তব প্রোটিন ও চর্বির (fat) বিকল্প হিসেবে ডালের ওপর নির্ভর করতেই হবে।

ভারতের মধ্যে গুজরাতের লোকেরা বেশীরভাগ নিরামিষাশী। তাই তাদের নিরামিষ প্রোটিন–ডালের ওপর নির্ভর করতে হয়। তাই গুজরাতীরা ডালের বেসনের নানান ধরণের আহার্য বস্তু ব্যবহার করে থাকে। ৰাঙালীস্তানে মূলতঃ ডাল পাওয়া যায় বিরি, অড়হর, ছোলা, মুগ, মুসুর, মটর, কুর্থি। তবে তুলনামূলক বিচারে এদের মধ্যে বিরি, অড়হর ও

ছোলার খাদ্যমূল্য সর্বাধিক। এদের মধ্যে অড়হর যোগায় বল আর ছোলা যোগায় শক্তি, কিন্তু অড়হর হজম করা খুবই শক্ত। ছোলা আরও বেশী শক্ত। আবার বিরি কলাই ৰল ও শক্তি দুই–ই যোগায়। আর একে হজম করাও অপেক্ষাকৃত ভাবে সহজ। এই তিনটি বাদে অন্য ডালগুলি নিয়ে আলোচনা করৰ।

ৰাঙালীস্তানে বর্তমানে যে পরিমাণ ডাল জন্মায় তাতে ৰড় জোর পাঁচ মাস চলে, বাকি সাত মাসের মত ডাল আনতে হয় বাহিরের রাজ্য থেকে। বাঙলার নদীয়া জেলাই কেবল ডাল উৎপাদনে স্বয়ম্ভর। সবগুলি মিলিয়ে মালদা, মুর্শিদাবাদ এ ব্যাপারে কোনরকম নিজের পায়ে দাঁড়িয়ে আছে। বিরি কলাই উৎপাদনে বীরভূম, বর্ধমান, পশ্চিম দিনাজপুর ও কুচবিহার স্বনির্ভর। পশ্চিম বাঙলা থেকে পঞ্জাব ও চেন্নাই–এ কিছু বিরি কলাই রপ্তানী করা হয়ে থাকে। রাঢ়ের মানুষেরা যদি বিরি কলায়ের ডাল, পোস্ত ও কুলের অম্বল না খায় তাহলে তাদের দৈহিক ভারসাম্য থাকবে না। ফাল্গুন থেকে জ্যৈষ্ঠ পর্যন্ত না খেলে রাঢ়ের রুক্ষ জল আবহাওয়ায় মানুষের শরীরে টান পড়ে, নাক দিয়ে রক্ত ঝরে। মুগ মুসুরের পুষ্টিমূল্য কম। আর মটরডাল বেশী খেলে ধাতব রোগ হয়। মুসুর দিনে রাজসিক, রাতে তামসিক। রাতে মুসুর ডাল টক হয়ে যায় ও রঙ লাল

হয়ে যায়। তাই যারা ৰৌদ্ধিক প্রগতি চায় তাদের মুসুর ব্যবহার অনুচিত। বিধবারাও মুসুর ব্যবহার করেন না। তামসিক আহার বলে আনন্দমার্গীদেরও এই ডালের ব্যবহার নিষিদ্ধ।

অড়হর, মুগ, বিরি বাদে ডালগুলো নিয়ে আলোচনা করা যাক। আউশ ধান কেটে ডাল চাষ করা যায়। অথবা আমন ধান কেটে জমিতে চাষ দিয়ে বড় গোলাপী ছোলা, বড় মটর ও বড় মুসুর, খেসারী এসব লাগানো যেতে পারে। যেমন আমন ধান কাটার পর জমিতে দু'তিন মাস জল থাকে না কিন্তু আশ্বিনের গোড়ায় জমিতে কাদাকাদা ভাব থাকে। ওই সময় ছোট ছোলা, মটর, মুসুর, খেসারী এগুলো আগে থেকে জলে ভিজিয়ে অঙ্কুরিত করে পায়রা ফসল হিসেৰে ছিটিয়ে দিতে হবে। (পায়রাকে যেমন আহার্য বস্তু ছিটিয়ে দেওয়া হয়, তেমনই এই শস্যকণাকে ছিটিয়ে দেওয়া হয় বলে একে ৰলে পায়রা ফসল (secondary crops)। বড় ছোলা, মটর ইত্যাদি পায়রা ফসল রূপে গণ্য হবে না, কারণ আশ্বিন মাসে ধান গাছ বেশ বড় হয়ে যায়। সূর্যালোক গাছের নীচে জমিতে পড়ে না। তাই এগুলোর অঙ্কুর আসবে না। গাছ হৰে না, তাই ঠিকরে জাতের মটর, ছোলা, মুসুর লাগাতে হবে। (ছোট

মটরের পাতা একটু তেতো, তাই এর পাতা খাওয়া যায় না। তাছাড়া ওই পাতা পেটের পক্ষে ক্ষতিকর)।

ধান কাটা হলে ডালের গাছের মাথাও কাটা পড়ে যায়। এতে গাছ থেকে নোতুন নোতুন ফ্যাকড়া বেরোবে ও সেই ফ্যাকড়ায় অধিক সংখ্যায় ফুল আসবে, শুঁটি ধরবে, ফলে শস্যের ফলনও যাৰে ৰেড়ে, আর কাটা ডালপালা গোখাদ্য হিসেবে ভালভাবে ব্যবহৃত হৰে। জমিতে যদিও নোতুন করে সার দেওয়া হয় না তবুও ডাল ধানের সার পাৰে, ধানের নিড়েনের পর চাপান সারটাও পাৰে। ফলে ফলন বেড়ে যাবে। ফাল্গুনে পায়রা ফসল উঠে যাবার পর ওই জমিতে তিল, সয়াবীন (গ্রীষ্মকালীন) লাগানো যেতে পারে। এই সময় ৰাঙলার অধিকাংশ জমি পড়ে থাকে না। এই চাষের ফলে জমি অব্যবহৃত অবস্থায় পড়ে থাকবে না। আউশ চাষের পর যেখানে জলের ব্যবস্থা আছে সেখানে মাটিতে দু'টো চাষ দিয়ে বড় জাতের মটর, ছোলা ইত্যাদি ডাল লাগানো যাবে। বড় মটর শাদা রঙের, ছোটা গোলাপী ও মুসুর লাল রঙের। ডাল জাঁতায় পিষলে দু'ভাগ হয়ে যায়। কিন্তু বালির সঙ্গে মিলিয়ে জাতায় পিষলে খাড়ি মসুর হবে।

খেসারী বেশী খেলে পেট খারাপ হয়। এর গন্ধ ও স্বাদ একটু কম। তবে এতে পক্ষাঘাত হয়। এখন সরকারী এক ধরণের খেসারীর উদ্ভাবন হয়েছে যাতে পেট খারাপ হয় না। পক্ষাঘাত থেকে বাঁচার উপায় হ'ল রাত্রে গরম জলে খেসারীকে ভিজিয়ে রেখে পরের দিন সকালে ভাল করে ধুয়ে নিতে হবে। তাতে তার গায়ে আর বিষ লেগে থাকৰে না। খেসারীর খোসার নীচে ও দানার ঠিক ওপরে বিষ লেগে থাকে যাতে পক্ষাঘাত রোগ হয়।

বীরভূমের রাজনগর, দুবরাজপুর, মামুদবাজার, মুরারই, রামপুরহাট অঞ্চলে ধানের পর গম লাগালে ফলন হবে। খোসারীর ভুসি গোরু–মহিষের খাদ্য। ডাল মানুষের পুষ্টিকর খাদ্য। রাঢ়ের জল, হাওয়া ভাল। মানুষের দৈহিক সংরচনাও ভাল। তবে পুষ্টিকর খাদ্য পায় না বলে তাদের দেহ পুষ্ট হয় না। তাই পুরুলিয়া, বাঁকুড়া প্রভৃতি অঞ্চলের মানুষেরা পুষ্টির অভাবে সহেজই কুষ্ঠ রোগগ্রস্ত হয়ে পড়ে। মালভূম অঞ্চলে এই রোগকে বলে 'বড়' রোগ। বীরভূমে দারিদ্র্য থাকলেও কুষ্ঠরোগ নেই। কারণ বীরভূমের মাটির নীচে গন্ধক রয়েছে। মটরের সংস্কৃত কলায়। এই সংস্কৃত 'কলায়' থেকে ৰাঙলায় কড়াই

সূচীপত্র

শব্দটি এসেছে (কড়াই শুঁটি)। এর ইংরেজী হ'ল pea। হিন্দিতে কড়াই। মুসুরের সংস্কৃত হ'ল মুসুরী, ইংরেজী lentil।

ছোলার সংস্কৃত চনক ও বুন্টিক। চনক চনয় > চানা। চনক থেকে উত্তর ভারতে চানা। বুন্টিক থেকে রাঢ়ে বুট শব্দটি এসেছে। বুন্টিক > বুন্টয় > বুট। ছোলার ইংরেজী Bengal gram. খেসারীর সংস্কৃত ত্রিপুটী, ইংরেজী Horse gram. ত্রিপুটি > ত্রিপুট > তেওড়া। বিরি কলায়ের ইংরেজী black gram। এর অপর নাম মাষকলায়। উঁচু জমিতে, মোটামুটি উর্বর জমিতে এই ডাল হবে। তার সঙ্গে সয়াবীন, চীনেবাদাম, সূর্যমুখী লাগানো যেতে পারে। এটা চার/পাঁচ মাসের ফসল। বেশী সার দিলে গাছ বেশী বড় হয়ে যাৰে। ফুল আসবে না। অর্থাৎ গাছ বড় হবে কিন্তু ফলন হবে না। এর জন্যে ডাল কেটে কেটে দিতে হবে। এর কাটা ডালপালা পশুখাদ্য হবে। এতে গোরুর দুধ গাঢ়তর হয়। ধানগাছেও যদি খুব বেশীরকম সার দেওয়া হয় তবে তাতে ফলন হবে না। গাছ বড় হয়ে যাৰে।

মুগ

সূচীপত্র

সোণামুগ বারমাসের ফসল। তবে বর্ষায় মুগ লাগাতে নেই। যে জমিতে বিরি লাগানো হয় সেখানে মুগ না লাগানোই ভাল। কারণ মুগ বছরের যে কোনো সময় হতে পারে। কিন্তু বিরি বছরে একবার। বিরি এক ফসলি ফসল। মুগের ইংরেজী green gram. মুগ যে কোন ফসলের সঙ্গে পায়রা ফসল হিসেবে বা মিশ্র ফসল হিসেবে হতে পারে। এর গাছ গো–মহিষের খাদ্য হয়। মুগের শুঁটি পাকলে উঠিয়ে নিতে হয়। অন্য কলায়ের থেকে মুগের বৈশিষ্ট্য হ'ল এর ঝাড়াই–মাড়াই করা হয় না, শুঁটি তুলে নিতে হয়।

অড়হর

অড়হর বর্ষার গোড়ায় লাগাতে হয়। অড়হর মূলতঃ দু'টি প্রজাতি, মাঘী ও চৈতি। হুগলীর বলাগড় নদীয়া ও মুর্শিদাবাদ–এ ভাল অড়হর চাষ হয়। অড়হরের সঙ্গে রেড়ীও হবে। এতে জমির সদ্ব্যবহার হয়। আউশ ধানও হতে পারে। কার্তিকে ওই জমিতে কন্দ ফসল (tuber crops) ও লাগান যেতে পারে। অড়হরের সঙ্গে রাঙা আলু, শাঁকালু দুই–ই হবে। একসঙ্গে দু'টো

ফসল পাওয়া যাবে। নদীয়ায় অড়হরের সঙ্গে আউশ বোনা হয়। পশ্চিম রাঢ়ের টাড় জমিতেও আউশ হবে। রেড়ীর পাতা খেয়ে যে রেশম কীট জন্মায় তা থেকে কৃত্রিম রেশম পর্যাপ্ত পাওয়া যায়, যা থেকে সস্তা সিল্ক তৈরী হবে। তাতে প্যান্ট, কোট হবে। তাই রেড়ী থেকে এইভাবে একই সঙ্গে অর্থকরী ফসল ও খাদ্য ফসল পাওয়া যায়।

তামাক

দুমকা, ধানবাদ, পুরুলিয়া, সিংভূম, বাঁকুড়া, ঝাড়গ্রাম ও পশ্চিম বর্ধমানে এককালে কেন্দুর জঙ্গল ছিল। ছিল বীরভূমেতেও। কবি জয়দেবের জন্মস্থান কেন্দুবিল্ব (কেন্দুলী)। কলকাতায় আমরা বড়-ছোট নির্বিশেষে কেন্দুকে গাব বলি। রাঢ়ী ৰাঙলায় কেন্দ। আসলে বড় প্রজাতির বাংলা নাম গাব, ছোট প্রজাতির নাম কেন্দ। সংস্কৃতে বৃহৎ কেন্দু ও ক্ষুদ্র কেন্দু। তবে গাব গাছের পাতায় বিড়ি বাঁধা যায় না, যায়' কেন্দু পাতায়।

সূচীপত্র

বিড়ি শিল্প যতদিন বজায় আছে ততদিন রাঢ় ও ভারতের অনান্য স্থালে কেন্দু পাতার ৰাণিজ্যিক ব্যবহার হবে, তারপর আর হবে না। বিড়ি সাধারণ দরিদ্র মানুষের সস্তা নেশা। কিন্তু মানুষ যখন বুঝবে যে বিড়ি স্বাস্থ্যের পক্ষে ভাল নয় তখন তারা মনস্তাত্বিক অর্থনীতির (psycho Economy) নিয়ম অনুযায়ী যেমন একদিকে কেন্দু বিড়ির পাতাকে অপাংক্তেয় করে দেৰে তেমনি তামাকের চাহিদাও নষ্ট হয়ে যাবে।

সেই সময় লক্ষ লক্ষ বিড়ি শ্রমিকের ও তামাক দ্রব্য উৎপাদন শিল্পের সঙ্গে জড়িত বিপুল সংখ্যক শ্রমিকের বৈকল্পিক কর্মসংস্থানের কথাও ভাবতে হবে। তামাকের জন্যে ঠিক বর্তমানে বৈদেশিক চাহিদার ওপর নির্ভর করলে চলবে না। কেননা বার্মার ও অন্যান্য কয়েকটি দেশের তামাক মানগত বিচারে ভারতের চেয়ে উন্নততর। ভারতে মেয়েদের তামাক পাতা চিবিয়ে খাওয়ার প্রথা কমে এসেছে। উত্তর ভারতের মানুষেরা খৈনীর ব্যবহার কমিয়ে আনছে। তবে ভারতে বিড়ি ব্যবহার যতদিন আছে ততদিন তামাক চাষ চলৰে। ততদিন বিভিন্ন রাজ্যের বনবিভাগ কেন্দু পাতা থেকে বেশ দু'পয়সা উপার্জন করবেন।

বর্তমানে পুরুলিয়া, ধানবাদ, বলরামপুর, মানবাজার, বরাবাজার, ঝাড়গ্রাম, বিষ্ণুপুর, মুর্শিদাবাদের নওদা–ধুলিয়ান, বীরভূমের পাঁকুড় এই স্থানগুলি বিড়ি উৎপাদনের নামকরা কেন্দ্র। এখানে বেশীর ভাগ বিড়ি শ্রমিকই সাঁওতাল ও বাঙালী মুসলমান জনগোষ্ঠীর লোকও আছেন। এই কাজে নিযুক্ত শ্রমিকেরা অনেকেই ক্ষয়রোগে ভুগছেন।

বস্ত্র উৎপাদন

কোন অঞ্চলের জনসাধারণের পোশাক পরিচ্ছেদ দু'টি উপাদানের ওপর নির্ভর করে– (১) স্থানীয় জলবায়ু (২) বুনন উপাদান (knitting materials)। এই দুটি বিষয়ে ৰাঙালীস্তানের পরিস্থিতি সম্পর্কে আলোচনা করৰ।

ৰাঙালীস্তানের পরিপ্রেক্ষিতে বস্ত্র উৎপাদন চারটি শ্রেণীতে ভাগ করা যায়। যেমন–

১) তুলা (Cotton)

২) তুঁত রেশম (Mulberry silk)

৩) অদ্ভুত রেশম (Non-Mulberry silk)

৪) কৃত্রিম রেশম ও অন্যান্য উপাদান (Synthetic silk and other ma- terials)

১) তুলা: তুলা দু'রকম– (ক) গাছ কাপাস (২) চাষ কাপাস। গাছ কাপাস তিন–চার বছর পরে গাছে ফল দেয়, তারপর মারা যায়। গাছ কাপাসের জন্যে শুষ্ক জলবায়ু প্রয়োজন। তাই রাঢ়, ত্রিপুরা এইসব জায়গায় গাছ কাপাসের চাষ হয়। এই কাপাসকে ৰলে দেবকাপাস। মুর্শিদাবাদ, নদীয়া, ঢাকায় গাছ কাপাসের চাষ ভাল হৰে না, তবে এই অঞ্চল থেকে উচ্চ ধরণের রেশমী বস্ত্র বিদেশে রপ্তানি হত। এই সব অঞ্চলে ভাল তাঁতী এখনও আছে। রেশমতত্ত্ব আসত মালদহ, বাঁকুড়া থেকে। এই অঞ্চল গাছ কাপাসের উপযুক্ত নয় কিন্তু চাষ কাপাসের উপযুক্ত। পঞ্জাব, হরিয়ানা, মহারাষ্ট্রে চাষ কাপাস হয়। এই সব স্থানে গাছ কাপাসও হতে পারে তবে ভাল হবে না। পাঠান যুগে উত্তরবঙ্গ ও ত্রিপুরা রেশম বস্ত্রের জন্যে বিখ্যাত ছিল।

(খ) চাষ কাপাসের চাষ রাঢ় ও ত্রিপুরায় দুই জায়গাতেই হতে পারে। Hybrid ধানের চাষ হবার পরে সেই জমিতে

নভেম্বর থেকে ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত তিন/চার মাসের মধ্যে চাষ-কাপাস লাগাতে হবে। ওই জমিতে শাঁকালুর চাষ হতে পারে। শাঁকালু থেকে চার রকমের জিনিস পাব- (১) চীনী (২) গুড় (৩) ঈষ্টু (৪) অ্যালকোহল। রাঢ় ও ত্রিপুরায় হৰে গাছ কাপাস; চাষ কাপাসের চাষও হবে। উত্তরবঙ্গ ও পূর্বৰঙ্গে শুধু চাষ কাপাস হবে।

(২) তুঁতরেশম: তুঁতরেশমের চাষ হবে রাঢ়, আর কিছু পরিমাণে মধ্য বাঙলা, ত্রিপুরা, উত্তরবঙ্গে। পূর্ববঙ্গের জলবায়ু রেশম চাষের উপযুক্ত নয়। রাজশাহী, রংপুর, দিনাজপুর, যশোর, কুষ্টিয়া এইসব অঞ্চলের জলবায়ু কিছুটা শুকনো। তাই তুঁত রেশমের চাষ এই সব অঞ্চলে হতে পারে। ত্রিপুরায় তুঁতের চাষ খুব ভাল হবে, আর এই চাষ থেকে ত্রিপুরা প্রচুর টাকা আয় করতে পারে। মিহি রেশমজাত 'গরদ' আর পোকা কেটে বেরিয়ে যাওয়া রেশমগুটি থেকে তৈরী বস্ত্রকে 'মটকা' বলে।

৩) অ-তুঁতরেশম: উত্তরবঙ্গ, ত্রিপুরা ও বাঙলাদেশ-এইসব অঞ্চলে অ-তুঁত রেশমের খুব ভাল চাষ হৰে। অ-তুঁত রেশমকে ৰলে তসর, এণ্ডী, মুগা। রেড়ী গাছ থেকে এইসব পাওয়া যায়। সজনে গাছ থেকে মুঙ্গা, কুল গাছ থেকে পাওয়া যায় তসর। আকন্দ গাছ থেকেও তসর পাওয়া যায়। তসর দু'রকম-একটা

সূক্ষ্ম, আর কিছুটা মোটা ধরণের তসর, যা চাদরের কাজে ব্যবহার করা যায়। অসমে একেই বলে এণ্ডী।

৪) কৃত্রিম রেশম ও অন্যান্য উপাদান: (ক) নাইলন (খ) রেয়ন (গ) জুটস্-উল্ (পাটতন্ত্ব ও উল্) এগুলো হ'ল কৃত্রিম রেশম। নাইলন তৈরী হবে ডাব, ধানের তুষ, নারকোলের খোলা থেকে, আর পাট থেকে। রেয়ন তৈরী হবে পাটের ছাল, আনারসের পাতা আর কলার থোড় থেকে। ত্রিপুরাকে এই ব্যাপারে ঈশ্বরের আশীর্বাদ ৰলা যায়। নাইলন ও রেয়ন থেকে ত্রিপুরা প্রচুর অর্থ উপার্জন করে নিতে পারবে।

রাঢ় ও ত্রিপুরায় তৈরী হৰে পশম। রাঢ়ে পশুচারণের উপযুক্ত পরিবেশ আছে। সেখানে ভেড়া প্রতিপালন করা যায়। রাঢ় ও ত্রিপুরার পশম আর মধ্যবাঙলায় পাট থেকে তৈরী নাইলন–এই দু'য়ে মিলে উচ্চশ্রেণীর জুটস–উল (Jute's-wool) উৎপাদিত হতে পারে। বাঙালীদের কাছে ও বাঙলার জলবায়ুর পক্ষে Jute's-wool-এর পোশাক খুবই প্রয়োজনীয় হবে।

পাট থেকে চার রকমের জিনিস উৎপাদিত হবে।

(১) মোটা বস্ত্র যা থেকে চটের থলি তৈরী হবে।
(২) কার্পেট তৈরী হবে।
(৩) সুটিং-এর পক্ষে উপযুক্ত তন্তু।
(৪) সার্টিং-এর পক্ষে উপযুক্ত তন্তু।

সার্টিং-এর তন্ত্ব প্রয়োজনীয় বস্ত্রকলগুলোতে তৈরী করতে হবে। কিন্তু বস্ত্র তৈরী হবে কুটির শিল্প হিসেবে ঘরে ঘরে, যাতে বাড়ীর ছেলে-মেয়েরা ও ছোট ছোট মেয়েরাও অংশ গ্রহণ করতে পারে। প্রতিটি মহকুমায় একটা করে বস্ত্রকল স্থাপন করতে হবে।

বর্তমানে তিসি (linseed), তিল ও ঢেঁড়স ইত্যাদি থেকেও সূক্ষ্ম তন্তু প্রস্তুত করা হচ্ছে। এগুলো থেকে সূক্ষ্ম তন্তু তৈরী করে আমেদাবাদের মিলগুলোতে লিনেন কাপড় তৈরী করা হচ্ছে। বাঙালীস্তানের সর্বত্র এই ধরণের লিনেন কাপড় তৈরী করা যেতে পারে। তিসির বীজ ও তিলের খোসা থেকে আটার বিকল্প খাদ্য হিসেবে ব্যবহার করা যাবে। তিসির বীজ থেকে চার রকমের জিনিস পাওয়া যায়।

সূচীপত্র

(১) জমির জন্যে সার (fertilizer)

(২) খাদ্য

(৩) তৈল

(৪) সূক্ষ্ম তন্তু

ঢেঁড়সের বীজ থেকেও ওই চার রকম জিনিস পাওয়া যেতে পারে। যেমন-(১) জমির সার (২) তেল (৩) খাদ্য (৪) সূক্ষ্ম তন্ত্ব তৈরী করা যাবে।

জুতো তৈরীর ব্যাপারে সস্তা পাট থেকে প্লাষ্টিক তৈরী হবে, তার থেকে জুতো তৈরীর উপাদান তৈরী করা যাবে। কচুরীপানা থেকেও প্লাষ্টিক তৈরী করা যাবে। মেস্তা আসলে পাট নয়, যদিও একে পাটই বলা হয়। পাটের সংস্কৃত পট্ট বা 'কষ্টক'। সংস্কৃত

'কষ্টক' > কষ্টতা > কষ্টা।

তিন-চার হাজার বছর আগেও বাঙলার মেয়েরা পট্টবস্ত্র অর্থাৎ পাটের শাড়ী পরিধান করত।

গৃহ নির্মাণ ও অন্যান্য নির্মাণের উপকরণসমূহ

নির্মাণের উপকরণ বলতে তিনরকম উপাদান বোঝায়

(১) গৃহ তৈরীর উপাদান

(২) জাহাজ তৈরীর উপাদান ও

(৩) অন্যান্য উপাদান

জাহাজ নির্মাণের উপকরণসমূহ

জাহাজ নির্মাণের একটা প্রাচীন ঐতিহ্য ৰাঙলার ছিল। বৈদিক যুগ থেকে অর্থাৎ প্রায় পাঁচ হাজার বছর আগে থেকেই ৰাঙলায় জাহাজ তৈরী করা হত। জাহাজ তৈরীর অঞ্চলগুলি ছিল দক্ষিণবঙ্গে। মেদিনীপুর, হাওড়া, চব্বিশ পরগণা অঞ্চলে। মেদিনীপুর তখন ছিল দণ্ডভুক্তির অন্তর্ভুক্ত, হাওয়া ছিল বর্ধমান ভুক্তির অন্তর্ভুক্ত, আর চব্বিশ পরগণা ছিল নদীয়া বা সমতটভুক্তির অন্তর্ভুক্ত। **ৰাঙলাদেশের খুলনা, বাখরগঞ্জ (প্রাচীন নাম চন্দ্রদ্বীপ), নোয়াখালি (প্রাচীন নাম ভল্লুকা >**

ভুলুয়া) ও চট্টগ্রামেও জাহাজ নির্মাণ কেন্দ্র ছিল। এইসব অঞ্চলের লোকেরা জাহাজ তৈরীতে পারদর্শী ছিলেন।

দক্ষিণবঙ্গে গরাণ ও সুন্দরী কাঠের প্রাচুর্য থাকায় জাহাজ নির্মাণের উপযুক্ত প্রচুর গরাণ কাঠ পাওয়া খুব সহজ ছিল। গরাণ কাঠের সাহায্যে নৌকা, জাহাজ তৈরী করা হত। স্থানীয় সূত্রধর ও জেলেরা এইসব কাঠ দিয়ে জাহাজ তৈরী করত। দক্ষিণবঙ্গে জাহাজ ও নৌকা নির্মাণের উপযোগী কাঠ এখনও সুন্দরভাবে পাওয়া যায়।

জাহাজ নির্মাণের জন্যে যে ধাতুর দরকার হবে তা পাওয়া যাবে রাঢ় থেকে। **ইস্পাত, ম্যাঙ্গানিজ, রূপা, তামার বিশাল ভাণ্ডার মজুত আছে রাঢ়ে।** সেখান থেকে জাহাজ নির্মাণের উপযোগী ধাতু পাওয়া যাবে। সুতরাং জাহাজ নির্মাণের জন্যে প্রয়োজনীয় কোন উপাদানের রাঢ়ে অভাব হবে না। জাহাজ নির্মাণের ব্যাপারে বাঙালীস্তান সহজেই স্বনির্ভরতা অর্জন করতে পারবে। সুন্দরবনের মোট এলাকা হ'লে চার হাজার বর্গমাইল। এর মধ্যে পশ্চিমবঙ্গের মধ্যে পড়েছে ষোলো শত বর্গ মাইল। বাকি বৃহৎ অংশটি গেছে বাঙলাদেশের মধ্যে। বাঙলাদেশ

সরকার সুন্দরবনের বিরাট অংশে জঙ্গল কেটে চাষবাস শুরু করেছে। খুলনা, বাখরগঞ্জ ও নোয়াখালিতে জাহাজ নির্মাণ কেন্দ্র তৈরী করা যায়। এদিকে বসিরহাট, ডায়মণ্ডহারবার ও আলিপুরের পরিবেশ জাহাজ নির্মাণের পক্ষে অনুকূল।

যানবাহন নির্মাণের উপকরণসমূহ (Vehicle Building Materials)

যানবাহন তৈরীর প্রধান উপকরণ রবার। উত্তরবঙ্গ, ডুয়ার্স, তরাই, ধুবড়ি, গোয়ালপাড়া, কোঁকড়াঝাড়, ঝাঁপা অঞ্চলে রবার গাছের চাষ হতে পারে। ত্রিপুরাতেও রবার পাওয়া যাবে। রবারের চাষের জন্যে দরকার পরিমিত বৃষ্টি, ল্যাটেরাইট সয়েল (লাল মাটি) আর ঢালু জমি। সুতরাং প্রয়োজনীয় রবার বাঙালীস্তানেই পাওয়া যাবে। অন্যান্য প্রয়োজনীয় ধাতব উপকরণগুলি রাঢ় থেকে পাওয়া যাবে। ম্যাঙ্গানিজ, অভ্র, রুপা, পারদ, কোয়ার্জ, তামা–এগুলো রাঢ়ে পাওয়া যাবে। ঝালদা, আড়ষা, পুঞ্চা, জয়পুর ও খাতরা অঞ্চলে এইসব ধাতু প্রচুর মজুত রয়েছে।

গৃহ নির্মাণের জন্যে উপকরণসমূহ

গৃহ নির্মাণের জন্যে প্রয়োজনীয় উপকরণের সরবরাহের ক্ষেত্রে সমগ্র উত্তরবঙ্গ, ত্রিপুরা ও পার্বত্য চট্টগ্রামে একটা ভাল ব্যবসা হতে পারে। গৃহ নির্মাণ উপকরণের একটা হচ্ছে সিমেন্ট। তারপর ইট। সমগ্র ৰাঙালীস্তানেই ইট ও টালি তৈরী করা যাবে। চুণ পাওয়া যাবে চূণাপাথর থেকে আর ঘুটিং থেকে। এছাড়াও রাঢ়ের মাটিতে রয়েছে ক্যালিশিয়াম কার্বনেট, ক্যালসিয়াম হাইড্রাইড এগুলো থেকে চূণ পাওয়া যাবে। জলপাইগুড়ির উত্তর অংশে, জয়ন্তী পাহাড়ের হাইড্রোঅক্সাইড অঞ্চলে ডলোমাইট চূণাপাথর প্রচুর মজুত আছে। দেওয়ানগিরি আগে ৰাঙলার অংশ ছিল। স্বাধীনতার সময়ে দেওয়ানগিরি ভূটান সরকারকে দিয়ে দেওয়া হয়েছে। দেওয়ানগিরিতেও ডলোমাইট ও চূণাপাথর মজুত আছে।

দক্ষিণৰঙ্গের উপকূল অঞ্চলের জন্যে প্রয়োজনীয় চূণ পাওয়া যাৰে ঝিনুক ও শাঁখ থেকে। রাঢ়ের দক্ষিণে যে চুণের ভাণ্ডার রয়েছে তা এখন মাড়োয়ারীদের কুক্ষিগত। সেখান থেকে চূণ

দিয়ে তারা বাইরে চালান দিয়ে সিমেন্ট তৈরী করছে। ঝালদা, পুরুলিয়া ও বাঁকুড়ায় এখনই সিমেন্টের কারখানা তৈরী করা উচিত। রাঢ়ে চুণ পাওয়া যাবে চূণাপাথর থেকে, ঘুটিং থেকে, ডলোমাইট থেকে আর ঝিনুক ও শাঁখ থেকে। সিলেটের উত্তরেও চুনাপাথর পাওয়া যাবে। খাসিয়া–জয়ন্তিয়া, মৌলবীবাজার আর সিলেটের (হবিগঞ্জ বাদে) চুণাপাথর মজুত আছে। রাঢ়ের মাটিতে ক্যালসিয়াম আছে। তাই রাঢ়ে কমলানেবুর গাছও হতে পারে। ক্যালসিয়াম কার্বোনেট ও ক্যালসিয়াম ফসফেট আছে রাঢ়ে।

গৃহনির্মাণের জন্যে প্রয়োজনীয় সিমেন্ট বাঙালীস্তানের বিভিন্ন অঞ্চলে পাওয়া যাবে। আমন ধানের তুষ থেকে, খড় থেকে (তার সঙ্গে ঘুটিং মিশিয়ে) উঁচু দরের অথচ স্বল্পদামের সিমেন্ট পাওয়া যাবে। ধানের তুষ থেকে রাঢ়, উত্তরবঙ্গ, ময়মনসিং, সিলেট ও ত্রিপুরার দক্ষিণ–পশ্চিম অঞ্চলে সিমেন্টের কারখানা করা যাবে। সুতরাং সিমেন্টও সহজলভ্য হবে। ঘুটিং থেকেও বা চূণাপাথর থেকেও সিমেন্ট হবে।

সূচীপত্র

গৃহ নির্মাণের অন্য উপকরণ বালি। ভারতবর্ষের উৎকৃষ্ট শ্রেণীর বালি আছে, মগরা ও পাণ্ডুয়ার বালুর খনিতে। মগরা হচ্ছে দামোদরের পরিত্যক্ত খাত। এখানে প্রচুর বালি আছে। ওই বালি উৎকৃষ্ট শ্রেণীর।

উত্তরবঙ্গ ও বাঙলাদেশের পূর্বাঞ্চলের জেলাগুলি ত্রিপুরা থেকে আগে গৃহনির্মাণের উপকরণ নিয়ে আসত। ছন আনত ছাউনি দেবার জন্যে। রাঢ়ের রাস্তার ধারে ধারে রয়েছে প্রচুর ঘুটিং। বঙ্গোপসাগরের উপকূলে রয়েছে ঝিনুক, শাঁখ যা থেকে তৈরী হবে চূণ। ঝালদায় সিমেন্ট তৈরীর কারখানা এখনি তৈরী করা দরকার। বাঙালীস্তানের অনেক গ্রামেই সিমেন্ট তৈরীর কারখানা তৈরী করতে হতে পারে। হবিগঞ্জ ছাড়া সিলেটে রয়েছে চুণাপাথর, ময়মনসিং-এর ব্রাহ্মণবাড়িয়াতে রয়েছে ভূনিম্নস্থ প্রাকৃতিক গ্যাস, ঢাকার নাবায়ণগঞ্জ, ভৈরববাজারেও ভূনিম্নস্থ প্রাকৃতিক গ্যাস রয়েছে। এগুলো সবাই গৃহ নির্মাণ উপকরণ হিসেবে কাজে লাগবে।

বাড়ি তৈরীর জন্যে দরজা, জানালা ও অন্যান্য জিনিসপত্র সবই কারখানাতে তৈরী হবে। সমস্ত উপকরণগুলো কারখানা

থেকে নিয়ে ছয়/সাত দিনের মধ্যেই একটা বাড়ি তৈরী করা যাবে।

সুতরাং গৃহ নির্মাণের ব্যাপারেও ৰাঙালীস্তান স্বনির্ভরতা অর্জন করবে।

শিক্ষা-উপকরণ

ভাব প্রকাশের স্বাভাবিক বাহন মাতৃভাষা। বাংলা হল বাঙালীদের মাতৃভাষা। ৰাঙালীস্তানের এলাকা হচ্ছে-পূর্বে আরাকান থেকে পশ্চিমে রামগড় বা পরেশনাথ পাহাড় পর্যন্ত। উত্তরে নিম্ন হিমালয় বা তিনধারিয়া থেকে দক্ষিণে বঙ্গোপাসাগরের ব-দ্বীপ অঞ্চল পর্যন্ত। দক্ষিণের ব-দ্বীপ অঞ্চল বলতে গঙ্গা-ব্রহ্মপুত্রের ও রাঢ়ের নদীগুলির উপনদী, শাখানদী নিয়ে যে দক্ষিণের ব-দ্বীপ অঞ্চল তৈরী হয়েছে, সেই পর্যন্ত।

বৈদিক যুগে বাঙলাকে বলা হত বঙ্গভূমি ও সমতট। রাঢ় অঞ্চলকে বলত রাষ্ট্র। ৰঙ্গাল = বঙ্গ+ আল। এই ৰাঙ্গলা পারস্য

ভাষায় হ'ল 'বঙ্গাল', তুর্কী ভাষায়, লাতিন ভাষায় 'বাঙ্গালা', চীনাভাষায় 'বাঙ্গাল', সংস্কৃতে বঙ্গদেশ বা রাঢ় আর বাঙলায় 'বাঙলাদেশ, ইংরেজীতে বেঙ্গাল'। উর্দুতে 'বাঙ্গাল'।

মাগধী প্রাকৃত হ'ল ৰাংলাভাষা। মাগধী প্রাকৃতের শুরু সাড়ে তিন হাজার বছর আগে। আধুনিক বাংলা শুরু হয়েছে প্রায় সাড়ে সাতশ' বছর আগে থেকে। বাংলা লিপি শুরু হয়েছে প্রায় ১২০০ বছর আগে থেকে, আর বাঙালী জনগোষ্ঠি প্রায় ৫০০০ বছরের পুরনো। বর্তমানে এই ভাষা ১৬ কোটি লোকের মাতৃভাষা। বাঙালীস্তানের শিক্ষার স্বাভাবিক মাধ্যম হবে বাংলা। শিক্ষার দ্বিতীয় মাধ্যম হবে ইংরেজী ভাষা; কারণ ইংরেজী একাধিক ভাষাভাষী মানুষের সঙ্গে যোগসূত্র রক্ষাকারী ভাষা হিসেবে স্থান পাৰে। এ ছাড়াও সংস্কৃত ভাষাকে নীচু স্তর থেকেই আবশ্যিক পাঠ্য বিষয় করতে হবে। ৰাঙালীস্তান পৃথিবীতে দীর্ঘ দিন থেকেই প্রধান শিক্ষাকেন্দ্র। প্রায় পাঁচ হাজার বছর আগে চীন থেকে বিদ্যার্জনের জন্যে মানুষ ৰাঙলায় আসত। ৰাঙলায় তিন জায়গায় ছিল বিদ্যার্জনের কেন্দ্র (seats of learning), 'বিক্রমণিপুর' অর্থাৎ বর্তমান বিক্রমপুর, দ্বিতীয় বর্ধমান ও তৃতীয়টি ছিল কন্থিকা' অর্থাৎ কাঁথিতে।

সূচীপত্র

শিক্ষার প্রথম উপকরণ কাগজ। কাগজের জন্যে প্রয়োজনীয় উপকরণ পাওয়া যাবে–

(১) বাঁশ থেকে (বাঁশ থেকে নাইলনও পাওয়া যাবে)

(২) পাটকাঠি থেকে

(৩) মেস্তা পাট থেকে

(৪) এ্যারোকেরিয়া নামে এক ধরণের ঝাউগাছ থেকে

(৫) বোরো ধানের খড় থেকে

(৬) ভুট্টার দানা বাদ দিয়ে যে 'বলরী'টা [লম্বা ও শক্ত জিনিস] থাকে তার থেকে

(৭) বিচালি ঘাস থেকে।

শিক্ষার অন্যান্য উপকরণ অর্থাৎ কলম, নিব, দোয়াত ইত্যাদির জন্যে প্রয়োজনীয় সবরকম উপকরণ পাওয়া যাবে রাঢ় থেকে।

সূচীপত্র

নিম্নলিখিত জিনিসগুলি থেকে রঙ পাওয়া যাৰে–

হেমাটাইট (Haematite) এক ধরণের ঘন লাল রঙের পাথর যা থেকে লোহা পাওযা যায়, তুঁতে (Blue vitral), ফেরাম সালফেট, বৃক্ষজাত নীল, রাসায়নিক প্রণালীতে কৃত্রিমভাবে এই সমস্ত উপকরণ দিয়েই শিক্ষা–উপকরণের দিক থেকে বাঙালীস্তানকে স্বনির্ভর করা যাবে।

ওষুধ

রাঢ়ে রয়েছে খনিজ সম্পদের বিপুল ভাণ্ডার। যদি ঠিক মত কাজে লাগিয়ে সেখানে শিল্প গড়ে তোলা যায় তবে ইয়ুরোপের শ্রেষ্ঠ শিল্পসম্পদ পূর্ণ এলাকা যে রুড়, তার চেয়েও রাঢ় বেশী সমৃদ্ধশীল হয়ে উঠবে। রাঢ়ে রয়েছে প্রচুর কয়লা, অঙ্গার–গ্যাস (coal gas) ও ভূগর্ভ–নিঃসৃত গ্যাস (natural gas)। শিল্পকারখানা গড়ে তোলার জন্যে ওই সম্পদ খুব কাজে লাগৰে। কাঁচ তৈরী ও রসায়নাগারের যন্ত্রপাতি–এর জন্যে যা কিছু উপকরণ সবই পাওয়া যাৰে ৰাঙালীস্তানের দক্ষিণ–পশ্চিম অঞ্চল, বিশেষ করে

হুগলী জেলায়। রাঢ়ে প্রচুর পরিমাণে সীসা, ম্যাঙ্গানিজ, লোহা, তামা ও পারদ প্রচুর মজুদ আছে। ওইসব ধাতু ঔষধ সরঞ্জাম ও চিকিৎসাবিদ্যার জন্যে প্রয়োজনীয় যন্ত্রাদি উৎপাদনের কাজে লাগবে।

গাছগাছড়া থেকে ওষুধ (Medicinal herbs)

ৰাঙলা গরম–আর্দ্র জলবায়ুর দেশ। বেশীর ভাগ লোক এখানে গরীব। সাধারণ মানুষের অধিকাংশই জ্বর, পেটের অসুখ ও আমাশয়ে ভোগে। ওইসব অসুখের জন্যে প্রয়োজনীয় ওষুধের গাছগাছড়া ৰাঙালীস্তানের বিভিন্ন স্থানে পাওয়া যাবে।

(১) উত্তরবঙ্গের ডুয়ার্স, গোয়ালপাড়া, দার্জিলিং–এর সমতলভূমিতে, ঝাঁপা জেলায় প্রচুর পরিমাণে ভেষজ ওষুধ পাওয়া যাৰে। ঝাঁপা জেলা বর্তমানে নেপালের অন্তর্ভুক্ত। আগে ঝাঁপা ছিল কোচবিহারের অন্তর্ভুক্ত। গোর্খারাজ পৃথ্বীনারায়ণ শাহ্ বলপূর্বক ঝাঁপা জেলাটা কোচবিহারের রাজার, কাছ থেকে

কেড়ে নিয়েছিল। ঝাঁপা জেলার লোকেরা রঙপুরী বাংলা বলে। ডুয়ার্স ও উত্তরবঙ্গের অন্যান্য অঞ্চলগুলিতে medicinal herbs- প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। ৰাঙলার সাধারণ রোগ জ্বর, পেটের অসুখ ও আমাশয়ের পক্ষে ওই গাছগাছড়াগুলি খুব কাজে লাগৱে।

(২) গাছগাছড়ার দিক থেকে অন্য কতকগুলি অঞ্চলের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হ'ল অসম, মেঘালয় ও সুন্দরবন।

(৩) গাছগাছড়ার জন্যে তৃতীয় গুরুত্বপূর্ণ অঞ্চল রাঢ় ও ত্রিপুরা।

ৰাঙালীস্তানের বাকি সমতলভূমিতে ধানের চাষ হয়। তাই এই অঞ্চলে গাছ গাছড়া হবে না।

খনিজ ঔষধ

খনিজ ওষুধের দিক থেকে রাঢ় সবচেয়ে সমৃদ্ধ। রাঢ়ের ঝাড়গ্রাম, বীরভূম, ধানবাদ, পুরুলিয়া, সিংহভূম, রাঁচীর

বাংলাভাষী অঞ্চলে রয়েছে প্রচুর খনিজ সম্পদ- যেগুলি থেকে প্রয়োজনীয় ওষুধ তৈরী করা যাবে। রাঢ়ে প্রচুর রসাঞ্জন (antimony) ও ইয়ুরিয়া পাওয়া যাবে। ক্যুইনিন্ পাওয়া যাৰে কার্শিয়াং পাহাড়ে, অযোধ্যা, তিলাবনিতে, পাঞ্চেৎ ও ডালমু পাহাড়ে। চিকিৎসা সংক্রান্ত যন্ত্রপাতির জন্যে প্রয়োজনীয় প্রচুর উপকরণ আছে ৰাঙলীস্তানের দার্জিলিং–এর কার্শিয়াং অঞ্চলে। ওষুধের জন্য প্রয়োজন গাছগাছড়াও প্রচুর পাওয়া যায়। কিন্তু কালিম্পঙ–এর জলবায়ু আর্দ্র হওয়ার জন্যে ভাল ওষধি পাওয়া যাবে না। কার্শিয়াং–এর পূর্ব নাম ছিল খরসান। এটা একসময়ে সিকিমের অংশ ছিল। বর্তমান নাম হয়েছে 'কার্শিয়াং'–নামটা ভুল। শিলিগুলির পূর্বনাম ছিল ডালিমপুর (ডালিমকোট)। এটা এক সময়ে ভুটানের অংশ ছিল। এখন এর নাম হয়েছে শিলিগুড়ি। ভুটানরাজ এই অঞ্চলটা এক সময়ে জোর করে দখল করে রেখেছিল। 'দার্জিলিং'–এর আগেকার নাম ছিল 'দোর্জিলিং', তার থেকে 'দার্জিলিং' হয়েছে।

ওষধির মধ্যে জটামাংসী, ইপিকাক জন্মাতে পারে একটু উষ্ণ ভূমিতে। ঝালদা থেকে জোনাগড়, মুরী, সিল্লি, গৌতমধারা, আঙ্গারা পর্যন্ত অঞ্চল herbal cultivation-এর পক্ষে খুন উপযুক্ত

কারণ রাঢ়ের অন্য অঞ্চল থেকে এই অঞ্চলে একটু বেশী বৃষ্টিপাত হয়। অন্যদিকে ত্রিপুরায় সাব্রুম, পানিসাগরে (ধর্মনগর অঞ্চল) ওষধি প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যাবে। সুন্দরবন অঞ্চলেও ওষধিরূপে প্রচুর গাছ-গাছড়া পাওয়া যাবে। কারণ নোনা মাটির ঔষধী মূল্য আছে। পরনের পাঞ্জাবীতে যে গিলে করা হয় সেই গিলে গাছ সুন্দরবনে প্রচুর পাওয়া যায়। অন্যদিকে মেঘালয়ের গারোপাহাড় ও নগাঁও জেলার হোজাই ও লঙ্কা এলাকায় ঔষধীয় গাছ-গাছড়া প্রচুর পাওয়া যাবে।

রাঢ়ে অন্যান্য খনিজ পদার্থের সঙ্গে পারদ (mercury) যথেষ্ট পরিমাণে পাওয়া যায়। পারদ, 'মার্কুইরিক্ সালফাইড' হিসেবে স্থূল অবস্থায় পাওয়া যায়। রাঢ়ে তামার প্রাচুর্য আছে। পারদ ও তামা থেকে নানারকম খনিজ ওষুধ তৈরী করা যাবে। মালভূমের তামাখুন অঞ্চলে তামার খনি আছে। তাম্রলিপি থেকে আগে বিদেশে তামা রপ্তানি করা হত। কাঁসাই নদী দিয়ে আগে নৌকা ও জাহাজ চলত। কাঁসাই নদী আজ শুকিয়ে গেছে।

অর্থকরী ফসল

সূচীপত্র

অর্থকরী ফসল দুই ধরণের–

(১) কৃষিজাত (Agricultural)

(২) অ–কৃষিজাত (Non-Agricultural)

অর্থকরী ফসলের মধ্যে গোলমরিচ (Black pepper) ত্রিপুরার জলবায়ুর পক্ষে উপযুক্ত। ত্রিপুরা গোলমরিচ আর সেইসঙ্গে শুকনো লঙ্কা উৎপাদন করে বাঙলাদেশে এই দুই লঙ্কার খুব সুন্দর বাজার সে পেতে পারে। এর থেকে ত্রিপুরা প্রচুর আয় করতে পারবে।

ডালের দিক থেকে ৰাঙলা ঘাটতি অঞ্চল হিসেবে পরিচিত। ৰাঙলায় যা ডাল হয় তাতে তার মাত্র পাঁচ মাস চলে, আর বাকি সাত মাস তাকে বাইরে থেকে আমদানি করতে হয়। আউশ ধানের চাষের সঙ্গে সঙ্গে মুগের ডাল বছরে তিন বার তোলা সম্ভব হবে। ধানের কাদাজমিতে সোণামুগ ভিজিয়ে ছিটিয়ে দিলে, এক মাস পরে হাইব্রিড ধান কাটার সময় মুগের

লতাও কাটা যাবে। তখন তার থেকে ফ্যাকড়া বের হবে। ছিটিয়ে দেওয়া হয় বলে এই ফসলকে পায়রা ফসল ৰলে। এই ফসল ৬০ দিনে উঠে আসে, তাই একে বলে ষাটামুগ। ষাটামুগ বছরে তিনবার ফসল দেবে। মুগের লতা গোরুর খাদ্য।

অড়হর ডাল মূলতঃ দু'রকম- (১) চৈতি (২) মাঘী। এছাড়াও আরেক রকম অড়হর ডাল হয়ে থাকে, ৰলে আঘানী অড়হর। রাঢ়ের যে-কোন টাঁড় জমিতে আউশ ধানের ক্ষেতে এর চাষ হবে।

বিরির ডাল বা কলাই-এর ডাল কলকাতায় বলে বিউলির ডাল। ৰাঙলায় ডাল পর্যাপ্ত উৎপন্ন হয় হতে পারে। বিউলির ডাল পাঁচ মাসের ফসল। কোচবিহার, দিনাজপুর, বর্ধমান, মালদহ, পুরুলিয়ার এর উৎপাদন হয়। ভাইতাম

ছোলা পাঁচ মাসের ফসল। যেখানে জলের অভাব আছে সেখানে ছোলা ভিজিয়ে ছিটিয়ে দিতে হয়। রাঢ়ে ছোলাকে বলে 'বুট'। সংস্কৃত 'বুন্টিক' কথা থেকে এসেছে। বিহারে বলে চানা।

'চানা' শব্দের উদ্ভব 'সংস্কৃত' 'চনক' > চানা। 'ছোলা' কথাটা ফার্সী। বড় ছোলা লাগাতে হলে–হাইব্রিড় ধান কাটা হবার পরে সেই জমিতে অক্টোবর মাসে লাগাতে হবে তার চৈত্র মাসে ফসল উঠবে। খেসারীর ডালের চাষ ৰাঙলায় খুব হয় তবে স্বাস্থ্যের পক্ষে খেসারীর ডাল ভাল নয়। পক্ষাঘাত হতে পারে। আজকাল নোতুন মটর উঠেছে। নোতুন মটর একটু নরম। চার মাসে ফসল উঠবে। তবে এর চাষ লাভজনক নয়। মসুর ডাল গমের ক্ষেতে ভাল ফলন হবে। গমের পক্ষে ভাল জমি হচ্ছে নদীয়া, মুর্শিদাবাদ, মালদহ, রায়গঞ্জ, ইসলামপুর, কুচবিহারের মেখলিগঞ্জ মহকুমা আর জলপাইগুড়ি জেলা। গমের ক্ষেতে মুসুর ডালের চাষ চলবে। ত্রিপুরায় শুকনো এলাকায় ছোলা ভাল হবে। মুগের ইংরেজী green gram, ছোলার ইংরেজী Bengal gram, বিউলির ইংরেজী Black gram; বাঙলায় যে ডাল উৎপন্ন হৰে তা এদেশের মানুষকে খাইয়েও বিদেশে রপ্তানি করা যাবে। মসুর ডাল ছাড়া অন্য সব ডালই বাইরে থেকে ৰাঙলায় আসে। ত্রিপুরায় যে ডাল হবে তা উদ্বৃত্ত হয়ে সেই ডালকে ৰাঙলাদেশে সরবরাহ করা চলতে পারে। ডালের খোসা গোরুর ভাল খাদ্য। বাঙলায় গোচারণ ভূমির অভাব আছে। গোরুর স্বাস্থ্যের জন্যে ডালের ভূষি খুব ভাল খাদ্য।

রবার অর্থকরী ফসল। ৰাঙলার যে সমস্ত অঞ্চলে বৃষ্টিপাত প্রচুর অথচ ঢালু জমি, যেখানে জল জমতে পারে না সেখানে রবারের চাষ ভাল হবে। জলপাইগুড়ি, দার্জিলিং, ধুবড়ি, কাছাড়ের উত্তর-পূর্ব অঞ্চলে ও ত্রিপুরায় রবারের চাষ ভাল হতে পারে। কোকো উৎপাদনের জন্যে প্রচুর বৃষ্টিপাত প্রয়োজন। কফি উৎপাদনের জন্যে দরকার পরিমিত বৃষ্টিপাত। রাঢ়ের বীরভূম, পুরুলিয়া, বাঁকুড়াতেও কফি উৎপাদনের জন্যে দরকার পরিমিত বৃষ্টিপাত। রাঢ়ের বীরভূম, পুরুলিয়া, বাঁকুড়াতেও কফি উৎপাদন হতে পারে। রাঢ়ের টাড় জমিতেও কফি উৎপাদিত হবে। চা-উৎপাদন খুব একটা লাভজনক হবে না। ত্রিপুরার সঙ্গে রাঢ়ের মিল অনেক জায়গায়। তাই কফি রাঢ় ও ত্রিপুরা দুই জায়গাতেই হবে। ত্রিপুরায় কোকোর চাষও হতে পারে। কোকো গাছকে ইংরেজীতে ৰলে ক্যাকাও (cacao) আর ক্যাকাও গাছের ফলকে ৰলে কোকো। ইংরেজী বানান cocoa.

পাট একটা অর্থকরী ফসল। কিন্তু পাটকে শুধু চটের থলি বানানোর কাজে ব্যবহার ঠিক হবে না। পাটকে মোটা সুতোর

কাপড় তৈরীর কাজে লাগাতে হবে। কাছাড়, সিলেট, ত্রিপুরার সাব্রুম অঞ্চলে কমলানেবুর চাষ হতে পারে। তবে ভাল হবে না। রাঢ়ে, ত্রিপুরা ও দক্ষিণবঙ্গে কাজুবাদামের ভাল চাষ হতে পারে। মেদিনীপুরে (প্রাচীনকালে হিজলী) প্রথম কাজুবাদামের চাষ শুরু হয়। কাজু বাদামের অনেক গুণ। এটি একটা অর্থকরী ফসল হিসেবে ভাল কাজ দেবে। বর্তমানে মেদিনীপুরের কাঁথি মহকুমায় কাজুবাদামের উৎপাদন খুব বেশী হয়।

বাঙলাদেশের অর্থকরী ফসল মাত্র দু'টি। (১) কাঁচা পাট (২) কাঁচা চামড়া। কাঁচা চামড়া ট্যান করে বাইরে বিক্রি করলে ভাল পয়সা আসে। কিন্তু ট্যান করার কোন ব্যবস্থা না থাকায় ক্ষতি হচ্ছে বাঙলাদেশে। চামড়ার পরিবর্তে প্লাষ্টিক জাতীয় জিনিসের ব্যবহার হলে পাট ও চামড়া দু'টোই মার খাবে। বাঙলাদেশ প্রকৃতির নীতি নিয়মগুলিকে মেনে চলছে না। Bangladesh does not follow the rules of nature.

ধানকে আগে লক্ষ্মী বলত। তুষকে দেবী বলত। ১২০০ বছর আগে রাঢ়ের এক রাজা ছিল, তার নাম মানসিং। মানসিং–এর রাজধানী ছিল মানবাজার। মানসিং–এর ছেলে ছিল

সূচীপত্র

না। দুই মেয়ে ছিল। একজনের নাম ভাদুমণি আর অন্যজনের নাম টুসুমণি। রাজা মারা যাবার পর টুসুমণি রাজা হলেন। টুসুমণি খুব ভাল রাজা ছিলেন। রাঢ়ে এখনও তার নামে **টুসু পরব** হয়। ধানের তুষকে রাঢ় এখন পুড়িয়ে নষ্ট করে ফেলছে।

সেরিকালচার

সেরিকালচারের মধ্যে রেশম ও লাক্ষা উল্লেখযোগ্য অর্থকরী ফসল। রেশমের চাষ রাঢ়ের কুল গাছে ভাল হৰে, উষ্চমান সম্পন্ন রেশম পাওয়া যাৰে। কুসুমগাছ থেকে লাক্ষা ও তা থেকে গালা পাওয়া যায়। গালা দু–তিন রকম। ঝালদা, মুর্শিদাবাদ, বলরামপুরে লাক্ষা পাওয়া যায়। লাক্ষার জন্যে বিশ্বে ভাল বাজার রয়েছে কিন্তু বাঙলায় লাক্ষার চাহিদা কমে যাচ্ছে। কারণ আগে মেয়েরা গালাকে গহনার কাজে ব্যবহার করত। আজকাল আর করে না।

ৰাঙালীস্তানে মউমাছির অঙ্গ নিঃসৃত মৃত মোম অর্থাৎ bee-wax-এর তেমন কোন বাজার নেই। প্যারাফিনের কৃত্রিম মোম

এখন beewax-কে সরিয়ে দিচ্ছে। bee-wax-এ ঔষধীয় মূল্য খুব বেশী। মউমাছি চাষের পক্ষে ভাল জায়গা হচ্ছে সুন্দরবন, মেঘালয়, ত্রিপুরা ও রাঢ়। প্যারাফিন মোমের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় bee- wax পারবে না।

অকৃষি শিল্প

রাঢ়ে অভ্র প্রচুর আছে। অভ্রের আবির্ভাব ঘটেছে ১০০ কোটি বছর আগে। ১০০ কোটি বছরের পুরানো মাটিতে অভ্র পাওয়া যাবে। অভ্রের ইংরেজী mica। রাঢ়ের মাটিতে প্রচুর অভ্র আছে। আনন্দনগরের মাটিতেও অভ্র আছে।

জলপাইগুড়ি, দার্জিলিং, কোচবিহার, ব্রাহ্মণবেড়িয়ায় প্রাকৃতিক গ্যাস ও পেট্রোলিয়াম পাওয়া যাবে। সিলেট ও ত্রিপুরার খোয়াই মহকুমায় natural gas পাওয়া যেতে পারে।

বক্রেশ্বর থেকে বীরভূমের নানুর পর্যন্ত ৮০ মাইল জুড়ে রয়েছে প্রচুর পরিমাণে গন্ধক। বীরভূম–বাঁকুড়া–পুরুলিয়ার মানুষ প্রায় সমান দরিদ্র। ময়ূরাক্ষী প্রকল্পের পর বীরভূমের কিছুটা উন্নতি হয়েছে। অভাবজনিত অখাদ্য ভক্ষণ করার ফলে কুষ্ঠ হয়। বীরভূম, বাঁকুড়া ও পুরুলিয়ার মানুষ সমান দরিদ্র হলেও বাঁকুড়া, পুরুলিয়ায় কুষ্ঠ বেশী হয়। কিন্তু বীরভূমে কম হয়। তার কারণ বীরভূমে গন্ধক রয়েছে। গন্ধক চর্মরোগের ভাল ঔষধ। এই গন্ধককে ঔষধ তৈরীর কাজে লাগানো যেতে পারে।

আয়োডিন

ঔষধের জন্যে আয়োডিন দরকার। দীঘার সমুদ্র উপকূলে সমুদ্রশৈবাল (sea- weed) থেকে প্রয়োজনীয় আয়োডিন পাওয়া যাবে। আর আয়োডিন পাওয়া যাবে সমুদ্রের জল থেকেও। sea-weed বলতে বোঝায় সমুদ্রের পানাও। দীঘার সমুদ্রপানা থেকেই আয়োডিন তৈরী হয়। বাঙালিস্তানের সমুদ্র উপকূলের সর্বত্রই sea-weed আছে। তবে দীর্ঘাতে আয়োডিন ভালভাবে

প্রক্রিয়াজাত করা যাবে। আয়োডিন, ক্লোরিন এগুলো হলো সামুদ্রিক ফসল (marin products)। উত্তর বাঙলায় আয়োডিন পাওয়া যায় না। দক্ষিণৰঙ্গে পাওয়া যায়। তাই উত্তর বাঙলার মানুষের গলগণ্ড রোগ বেশী, কিন্তু দক্ষিণৰঙ্গে গলগণ্ড রোগ নেই বললেই চলে। কারণ উত্তর বাঙলায় আয়োডিন নেই, দক্ষিণ ৰাঙলায় আছে। আয়োডিনের অভাবে গলগণ্ড রোগ হয়। ঔষধের জন্যে বরিণ লাগে। প্রয়োজনীয় বরিণ পাওয়া যাৰে সোহাগা (borax) থেকে। Borax পাওয়া যাবে রাঁচী জেলার বাঙালী অধ্যুষিত এলাকায়।

রাঢ়ে অ্যালুমিনিয়াম উৎপাদনের কারখানা ভাল হবে। ঝালদা থেকে আঙ্গারা পর্যন্ত এলাকায় অ্যালুমিনিয়ামের কারখানা ভালভাবে হতে পারে। বাংলাভাষী এলাকায় বক্সাইটের মজুত ভাণ্ডর আছে। সুতরাং রাঢ়ে অ্যালুমিনিয়াম কারখানা খুব ভাল ভাবে হবে। রাঢ়ে প্রয়োজনের তুলনায় অনেক বেশী অ্যালুমিনিয়াম মজুত আছে।

লবণ শিল্প

সূচীপত্র

সমুদ্রের সঙ্গে লাগোয়া অঞ্চলে খাল কেটে (সমতল ভূমিতে) তাতে জল ভর্তি করে দিতে হবে। জল কিছুক্ষণ থাকার পরে বাইরের আবহাওয়ায় জল বাষ্প হয়ে উড়ে যাবে। নুন মাটির ওপরে পড়ে থাকবে। এটাই ব্যবস্থা। বাঙালীস্তানের কয়েকটি স্থানে লবণ শিল্প হতে পারে। লবণ শিল্প সবচেয়ে ভাল হবে কাঁথি মহকুমার দীঘা, রামনগর, মোহনপুর, কাঁথি ও জুনপুট অঞ্চলে ও বাঙলাদেশের কুতুবদিয়াতে কিছু পরিমাণে লবণ উৎপাদন হতে পারে।

মেদিনীপুর, উত্তর ও দক্ষিণ চব্বিশ পরগণা, খুলনা, বাখরগঞ্জ, নোয়াখালি, চট্টগ্রাম–এই জেলাগুলো সমুদ্রের সঙ্গে লাগায়ো। মেদিনীপুরের আবহাওয়া পশ্চিম রাঢ়ের মতই। ওখানে গ্রীষ্মকালে গরম ঝড়ের হলকা বয়। আবহাওয়া শুকনো। ওখানে জল দ্রুত বাষ্পে পরিণত হবে। ওখানে বাণিজ্যিক ভিত্তিতে নুন তৈরী হতে পারে। মেদিনীপুরের মূলতঃ তিনটি থানা–দীঘা, কাঁথি ও রামনগর–সমুদ্রের গায়ে বলে ওই এলাকাগুলিতে নুন শিল্পের সম্ভাবনা বেশী।

৬ জুন ১৯৮৬, কলকাতা

সূচীপত্র

কৃষি সমবায়

সমাজ নিরাপত্তার প্রশ্নে প্রথমেই আসে মানুষের অন্ন, বস্ত্র, গৃহ, শিক্ষা ও চিকিৎসা সংক্রান্ত নিরাপত্তার ব্যবস্থা। মানুষের জীবন ধারণের পক্ষে অপরিহার্য এই পাঁচটি প্রাথমিক প্রয়োজনকে সিদ্ধ করার জন্যে সর্বাগ্রে 'চাহিদা ভিত্তিক উৎপাদন' নীতিকে দেশের সর্বত্র বাস্তবায়িত করতে হবে। আর খাদ্য সরবরাহের গুরুত্বের কথা মনে রেখে কৃষি উৎপাদনের ওপর বিশেষ জোর দিতে হবে। এর জন্যে সমবায় প্রথার ব্যাপক প্রসার ঘটাতে হবে।

প্রাউটের মতে অত্যধিক সংখ্যক মানুষ কৃষিতে নিযুক্ত থাকা উচিত নয়। জনসংখ্যার একটি বৃহৎ অংশকে শিল্পে নিযুক্ত

করতে হবে। প্রাউটের কৃষিনীতি অনুসারে শতকরা ৩০ থেকে ৪০ জনের বেশী মানুষকে কৃষিকার্যে নিযুক্ত রাখা বাঞ্ছনীয় নয়।

প্রাউটে উৎপাদন অনুযায়ী কৃষিজমিকে দু'ভাগে বিভক্ত করা হয়েছে:–

১। লাভজনক জমি (Economic Holding)

২। অলাভজনক জমি (Uneconomic Holding)

লাভজনক জমি হ'ল সেই জমিগুলি যেখানে পুঁজি, শ্রম, সার ও অন্যান্য উপকরণ নিয়োগ করলে উৎপাদিত ফসলের বাজারদর উৎপাদন মূল্যের (cost price) থেকে বেশি। অর্থাৎ যে জমিতে উৎপাদন করা লাভজনক সেই জমিকেই বলা হয় Economic Holding। আর অপর দিকে যে জমিতে পুঁজি, শ্রম, সার ইত্যাদি নিয়োগ করলে উৎপাদিত পণ্যসামগ্রীর বাজারদর উৎপাদন মূল্যের নীচে থাকে সেই জমিগুলিকে বলা হয় অলাভজনক জমি বা 'Uneconomic Holding'। এইরূপ জমিতে চাষবাস করা অলাভজনক ৰলে সাধারণতঃ জমির মালিকেরা

এই জমিগুলিতে চাষবাস থেকে বিরত থাকেন। গ্রামীণ অর্থনীতিতে গ্রামকে যদি একটি উৎপাদন একক (Production Unit) বলে ধরা যায় তবে ওই গ্রামের অন্তর্ভুক্ত এমন বহু জমি পাওয়া যেতে পারে যেগুলি অলাভজনক জমি ৰলে পরিত্যক্ত থাকে।

কৃষি–জমির সামাজিকীকরণের প্রথম পর্যায়ে জমির মালিকানার ঊর্ধ্বসীমা নির্ধারণের দাবি না তুলে, কৃষি–জমির বিক্রয় বা হস্তান্তর নিষিদ্ধ করে' সমস্ত অলাভজনক জোতগুলিকে সমবায় ব্যবস্থার অন্তর্গত করতে হবে। এই জমিগুলির চাষ করার দায়িত্ব জমির মালিকদের ওপর বর্তাবে না, বর্তাবে সমবায়গুলির ওপরে। আর সমবায়গুলি তা করৰে স্থানীয় সরকারী রক্ষণাবেক্ষণে ও সরকারী সাহায্য নিয়ে। প্রত্যেক গ্রামের সমস্ত ভূমিহীন চাষীরা এই সমবায়ের সদস্য হবেন। তারা দেবেন তাদের শ্রম, আর জমির মালিকেরা দেৰে জমি, এই পর্যায়ে জমির মালিকদের ওপরেই জমির মালিকানা ন্যস্ত থাকৰে। উৎপাদিত ফসলের বিক্রয়মূল্য থেকে উৎপাদন মূল্য বাদ দিলে যে নীট লাভ হবে, সেই নীট লাভের একটা নির্দিষ্ট অংশ রাজস্ব কর হিসেবে আলাদা করে রাখার পর, বাকী

অংশটুকুকেই লাভ হিসাবে গণ্য করা হবে। সেই লাভের ৫০ শতাংশ পাৰেন জমির মালিকেরা, আর ৫০ শতাংশ পাৰেন সমবায়ের সদস্যেরা অর্থাৎ কৃষি-শ্রমিকেরা।

প্রথম পর্যায়ের জন্যে নির্দিষ্ট সময় হচ্ছে এক থেকে তিন বৎসর। প্রয়োজনবোধে এই সময়সীমাকে কমানো যেতে পারে, কিন্তু কোন অবস্থাতেই ৰাড়ানো যাবে না, এই সময়ের মধ্যেই সামূহিক উন্নতি বিধানের উদ্দেশ্যে প্রত্যেকটি গ্রামের খাল-বিল-নদী- নালাগুলির সর্বাধিক উপযোগ নিতে হবে। উদাহরণস্বরূপ নদীতে ছোট ছোট বাঁধ ও জলাধার তৈরী করতে হবে। ব্যাপক জলসেচের ব্যবস্থা, বিদ্যুৎ উৎপাদন ও স্থানীয় প্রয়োজনানুগ শিল্প স্থাপন করতে হবে।

এই পর্যায়ে প্রথমেই জমির ওপর জনগণের চাপ কমাবার ব্যবস্থা করতে হবে। কৃষিভিত্তিক ও কৃষিসহায়ক শিল্প স্থাপন করে গ্রাম্য জনসংখ্যার একটা বড় অংশকে সেখানে নিয়োগ করতে হবে। ফসল সংরক্ষণের জন্যে স্বায়ত্তশাসন বোর্ডের অধীনে গুদামঘর ও হিমঘর স্থাপন করতে হবে। উৎপাদক সমবায়ের মাধ্যমে সমবায়গুলিকে ট্রাক্টর, সার, বীজ, পাম্প ও

চাষের অন্যান্য সরঞ্জাম সরবরাহ করতে হবে। গ্রামীণ জনগণের নিত্য-নৈমিত্তিক ব্যবহার্য বস্তু সরবরাহ করবে উপভোক্তা-সমবায়। এই পর্যায়ে কৃষি-শ্রমিক, ভূমিহীন চাষী দিনমজুর ও ভাগচাষীদের সমবায়ের অন্তর্গত করতে হবে। এই পর্যায় থেকেই গ্রামের শিক্ষাব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন করতে হবে। সমবায়ের মানসিকতা গড়ে' তোলার উদ্দেশ্যে জনগণের মধ্যে ব্যাপক শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা রাখতে হবে। কিন্তু সামূহিক স্বার্থকে জলাঞ্জলি দিয়ে ব্যষ্টি স্বার্থকে যাতে বেশী মূল্য না দেওয়া হয় সেই উদ্দেশ্যে সমস্ত শিক্ষার ঊর্ধ্বে রাখতে হবে নীতিশিক্ষাকে (moral education)।

কৃষি-সমবায় বাস্তবায়নের দ্বিতীয় পর্যায়ে ভূ-স্বামীদের ছোট ছোট জোতগুলিকে সমবায়-ববস্থার অন্তর্গত করতে হবে। সাধারণতঃ এইসব জমিগুলি লাভজনক জোতের অন্তর্গত। কোন একটি গ্রামের সমস্ত অ-লাভজনক জোতগুলিকে সমবায়ের অন্তর্গত করার পরেই লাভজনক জোতগুলিকে সমবায় ব্যবস্থার অধীনে আনতে হবে। সমস্ত লাভজনক জোতগুলিকে সমবায়ের অন্তর্গত করে' বৃহত্তর উৎপাদক-সমবায় গঠন করাই হবে এই

পর্যায়ের উদ্দেশ্য। উৎপাদন বাড়ানোর উদ্দেশ্যেই কৃষিতে ব্যাপকভাবে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ব্যবহার এই পর্যায়ে সহজতর হবে।

দ্বিতীয় পর্যায়েও জমির মালিকদের মালিকানা স্বত্ব থাকবে। নীট লাভের ২৫ শতাংশ পাৰে জমির মালিকেরা, আর ৭৫ শতাংশ পাবে কৃষি–শ্রমিক তথা সমবায়ের সদস্যেরা; এখানে কৃষি–শ্রমিক ৰলতে কায়িক ও ৰৌদ্ধিক উভয় ধরণের শ্রমিককেই বোঝাৰে। জমির মালিকেরা দু'ভাবে উপকৃত হবেন। প্রথমতঃ, মালিক হিসেবে তাঁরা জমি থেকে উৎপাদিত নীট লাভের ২৫ শতাংশ পাবেন, আর যদি তাঁরা শ্রমিক বাহিনীর একজন হিসাবে সমবায়ের অংশীদার হয়ে থাকেন, তাহলে সমবায়ের সদস্যদের মধ্যে লভ্যাংশের ৭৫ শতাংশের শ্রম (কায়িক বা ৰৌদ্ধিক) অনুযায়ী আনুপাতিক অংশও পাৰেন। গ্রামীণ জনসাধারণ যাতে কৃষির ওপরে নির্ভরতা কাটিয়ে বেশী করে' শিল্প নির্ভর হতে পারে, সেই উদ্দেশ্যে এই পর্যায়ে দ্রুত বড় বড় কৃষিনির্ভর ও কৃষি–সহায়ক শিল্প গড়ে' তোলার দিকে জোর দিতে হবে। গ্রামীণ জনসাধারণের সমবায়–মানসিকতা আরও উন্নত করার উদ্দেশ্যে শিল্পোন্নয়নের পাশাপাশি শিক্ষা ও

সংস্কৃতির সংস্কার সাধনের ওপরেও জোর দিতে হবে। এই দ্বিতীয় পর্যায় থেকেই ভোগোৎপাদন গ্রামীণ জনসাধারণের জীবন ধারণের মানকে উন্নত করবে, আর জনগণের সামাজিক সুরক্ষা সংক্রান্ত ন্যূনতম চাহিদাগুলি–যেমন জীবন ধারণের জন্যে প্রয়োজনীয় ন্যূনতম জিনিসগুলি পাওয়ার সুব্যবস্থা করতে হবে। দ্বিতীয় পর্যায়ের সময়সীমা হৰে দু'বছর। প্রয়োজনৰোধে এই সময়সীমা কমানো যেতে পারে, কিন্তু কোন অবস্থাতেই ৰাড়ানো যাবে না।

তৃতীয় পর্যায়ে জমির পুনর্বণ্টন করে' বিবেকপূর্ণভাবে জমির মালিকানা দিতে হবে। কার কতখানি জমি হৰে তা নির্ভর করবে– (১) একটি পরিবার চালানোর জন্যে যতটা দরকার, ও (২) নিজে যতটা চাষ করতে পারে–তার ওপর। এই পর্যায়ে জমিতে কাজ করানোর জন্যে জমির মালিকেরা কৃষি–শ্রমিক, ভূমিহীন চাষী ও ভাগচাষীদের পাবে না বলেই তাদের পক্ষে সমবায়ে যোগদান করা বেশী লাভজনক হবে।

সূচীপত্র

বিজ্ঞানের ব্যাপক প্রয়োগের বড় বড় সমবায় গড়ে' তোলা এই পর্যায়ে সহজ হবে। কিন্তু এগুলো কখনই চীন বা (তৎকালীন) সোভিয়েত ইউনিয়নের যৌথ খামারের মত বিশালাকার হবে না। সমবায়ের আকার খুব বড় হয়ে গেলে প্রাকৃতিক সুযোগ-সুবিধাগুলোকে যথোপযুক্তভাবে ব্যবহার করার ক্ষেত্রে অসুবিধা দেখা দেয়, আর তার ফলে উৎপাদনের ক্ষেত্রে সৃষ্টি হয় নানা ধরণের জটিলতা। সাম্যবাদী দেশগুলোতে যৌথ খামারের বিশালতার কারণে তত্ত্বাবধানগত ত্রুটি থেকে যেত।

কৃষি-সমবায়গুলি নিজেরাই সমবায়ের জমির আকার নির্ধারণ করে' নেবে। কিন্তু দু'টি বিষয় বিবেচনা করে' আকার নির্ধারণ করতে হবে। প্রথমতঃ, উৎপাদনের খরচ ন্যূনতম রেখে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ব্যবহার করে' কীভাবে উৎপাদনের গুণগত ও পরিমাণগত উন্নতি নিশ্চিত করা যায়। দ্বিতীয়ত, ন্যূনতম শারীরিক পরিশ্রমের বিনিময়ে সমবায়ের সদস্যগণ কীভাবে সর্বাধিক মানসিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতির চরম পর্যায়ে পৌঁছবার নিশ্চিততা অর্জন করতে পারে।

এই তিন পর্যায়ে কৃষিতে নিয়োজিত জনসংখ্যার চাপ কমিয়ে তা ৩০ শতাংশ থেকে ৪০ শতাংশের মধ্যে রাখতে হবে। তৃতীয় পর্যায় শেষ হতে হতে বেকারত্ব ও সামাজিক সুরক্ষার মত জাজ্বল্যমান সমস্যাগুলি থেকে গ্রাম্যজীবন মুক্তি পাৰে। জনগণ যেহেতু জোর করে' চাপিয়ে দেওয়া কোন ব্যবস্থাকে গ্রহণ করবে না, সেইহেতু সমবায় ব্যবস্থার সার্বিক বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে সঙ্গতি রেখে অভ্যন্তরীণ আকুতি ও বাহ্যিক চাপ সৃষ্টির মাধ্যমে প্রকৃত মানসিক প্রস্তুতি গড়ে' তোলার দিকে খেয়াল রাখতে হবে।

সামুহিক মনস্তত্ত্বের এই পরিবর্তন রাতারাতি হবে না, হৰে জনগণের আবেগে ও আকুতিতে।

চতুর্থ স্তরে, কৃষি–জমির মালিকানাস্বও নিয়ে আর কোন বিরোধ বা সংশয়ের কোন অবকাশ থাকৰে না। এমনিভাবে ধাপে ধাপে কৃষিজমির সামাজিকীকরণ করে' ফেলার নীতি অনুসরণ করার ফলে মানুষও ক্ষুদ্র গোষ্ঠিস্বার্থের দ্বারা পরিচালিত না হয়ে সামূহিক স্বার্থের দ্বারা প্রেষিত হবার শিক্ষা লাভ করবে। মানুষের এই মানসিক বিস্তার ও দৃষ্টিকোণের

পরিবর্তন সমাজের বুকে এক সুষ্ঠু অনুকূল পরিবেশও গড়ে তুলবে। অবশ্য সমাজের বুকে সামুহিক মনস্তত্ত্বের এমন পরিবর্তন হঠাৎ সম্ভব হবে না। এ পরিবর্তন আসবে ধীরে ধীরে মানুষের মনস্তত্ত্বের ক্রম-রূপান্তরণের মধ্য দিয়ে।

সমবায় বাস্তবায়নের চতুর্থ পর্যায়ে গ্রামের প্রত্যেকটি মানুষের অর্থনৈতিক সমস্যার সমাধান হবে। খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা ও চিকিৎসার মত সমস্ত সামাজিক সংক্রান্ত বিষয়গুলি সহজভাবে জনগণকে দেওয়া যাবে। প্রতিটি সামূহিক জাগতিক, মানসিক ও আধ্যাত্মিক সম্ভাবনা সমূহের সর্বাধিক উপযোগ এই পর্যায়ে সম্ভব হবে। কৃষি, শিল্প ও জীবনধারণের অন্যান্য উপায়গুলির মধ্যে সুন্দর সঙ্গতি সংসাধিত হবে।

সমবায় প্রকল্পের প্রথম স্তর থেকে চতুর্থ স্তর পর্যন্ত সময় সীমাকে বলা যেতে পারে প্রাউট অর্থনীতির ভিত্তি প্রতিষ্ঠার পর্ব বা transitional period, এর পরেই প্রকৃতপক্ষে প্রগতিশীল সমাজতন্ত্রের স্বকীয় অর্থনৈতিক বৈশিষ্ট্যগুলি বৈবহারিক প্রয়োগের সুযোগ পাৰে।

সূচীপত্র

ফেব্রুয়ারী ১৯৮২, কলকাতা

উত্তর-পূর্ব ভারত

অসম, অরুণাচল, মিজোরাম, মেঘালয়, মণিপুর ও নাগাল্যাণ্ড নিয়ে উত্তর-পূর্ব ভারত গঠিত। ভারতের উত্তরে আছে কয়েকটি ছোট রাজ্য যেমন-নেপাল, ভূটান ও সিকিম।

নেপালের আকৃতি আয়তক্ষেত্রের মত। উত্তর থেকে দক্ষিণে বিস্তৃত দৈর্ঘ্য পূর্ব-পশ্চিম বিস্তৃত প্রস্থ থেকে বেশ বড়। নেপাল বিভিন্ন সংস্কৃতির দেশ। ভারতে যেমন ভারতীয় ৰলে' বিশেষ কোন এক সম্প্রদায়ের লোক নেই তেমনি নেপালে নেপালী ৰলে কোন বিশেষ সম্প্রদায়ি জাতির মানুষ নেই। নেপালের

অধিবাসীরা অস্ট্রিয়-মঙ্গলিও-নিগ্রো সম্প্রদায় থেকে উৎপত্তি। নেপালে বেশ কয়েকটি ভাষা আছে যেমন-নেওয়ারী, গোর্খালি, অঙ্গিকা, ভোজপুরি, রাই, লেপচা, শেরপা, ভুটিয়া ইত্যাদি। নেপালের প্রধান ভাষা হল গোর্খালি। এখানকার অধিবাসীরা বিভিন্ন ধর্মমতে বিশ্বাসী। কিছু হিন্দুরা আছেন যারা শৈব বা শাক্ত ধর্মানুশীলনে বিশ্বাসী। আবার কিছু কিছু আছেন যারা হিন্দু ও বৌদ্ধ উভয় ধর্মে বিশ্বাস করেন। দক্ষিণ নেপালের বেশীর ভাগ অংশটাই সমভূমি। কিন্তু উত্তর দিকটা হিমালয় পর্বতে বেষ্টিত। পশ্চিমে রয়েছে তেরাই ও পূর্বে রয়েছে ডুয়ার্স অঞ্চল। নেপালের কেন্দ্রের অংশটাকে বলে মদেশা। নেপালের অধিবাসীদের উৎপত্তি একই জাতীর সম্প্রদায়ের থেকে ও তারা নিজেদেরকে 'মদেশী' বলে পরিচয় দেয়। সাধারণতঃ নেপালী অধিবাসীদের নাক সূচালো, একমাত্র গোর্খাদের নাক চেপ্টা বা ভোতা। নেপালের মোরাঙ্গ জেলার ভাষা হ'ল অঙ্গিকা। নেপালের একেবারে পশ্চিমাঞ্চলের ভাষা হ'ল ভোজপুরি। পূর্বদিকে ঝাঁপা জেলায় বাংলা ভাষায় কথা বলা হয়। গোর্খারা শিব ভক্ত। শিবের একটি নাম হ'ল-গোরক্ষনাথ। যেহেতু অধিবাসীরা গোরক্ষনাথের ভক্ত, তাই তাদের গোর্খা বলা হয়। গুরুং রাই সম্প্রদায় আবার মিশ্র জাতির থেকে উৎপত্তি। তাদের পূর্ব

পিতারা ছিল ভারতীয় ও পূর্ব মাতারা ছিল মঙ্গোলীয়। তারা মহাযানী বৌদ্ধধর্মে বিশ্বাসী ও তারা গোরুর মাংস খায়। গোর্খারা মহিষের কাঁচা মাংস খায়। জোশি ব্রাহ্মণরা পাহাড়ী এলাকায় বাস করে ও তারা হ'ল পশ্চিমা ব্রাহ্মণ অর্থাৎ তারা পশ্চিম ভারতের ব্রাহ্মণ। তারা সাধারণতঃ পদবী হিসাবে

'উপাধ্যায়' ব্যবহার করে। নেপালে বসবাসকারী লামারা আবার তিব্বোতীয় বংশোদ্ভূত। নেপালের মধ্যস্থল অর্থাৎ সমভূমি অঞ্চলটা কাঠমাণ্ডু উপত্যকা নামে পরিচিত। এখানে যে নেওয়ারী অধিবাসীরা বসবাস করে তারা বেশ লম্বা ও হিন্দু ধর্ম অনুসরণ করে। নেপালের অন্যান্য অধিবাসীরা হ'ল–শেরপা, লুম্বাস, লেপচা, ভুটিয়া ও তিব্বতীয়। বাংলা ভাষী মানুষজন ঝাঁপা জেলায় বাস করেন। ঝাঁপা জেলা বাদে অন্যান্য অঞ্চলের ভাষাগুলি হল ইন্দো–তিব্বতীয়। ১৭৭৩ সাল পর্যন্ত নেপালের প্রাচীনতম লিপি ছিল বাংলায়। নেপালের শাসকেরা ছিল নেওয়ার ও বাংলা হরফে লেখা নেওয়ারী ছিল নেপালের রাজভাষা। দোলযাত্রা উৎসবের দিন ১৭৭৩ সালে বলপূর্বক পৃথ্বীনারায়ণ শাহ্ নেপাল অধিকার করেন। এখানে নেপালী হিসাবে কোন ভাষা স্বীকৃত নেই। বস্তুতঃ নেপালের অধিবাসীরা ১৭টি ভাষায় কথা বলে ও গোর্খালি তাদের মধ্যে অন্যতম।

প্রায় ১০০ বছর পরে ব্রিটিশ সেনাপতি অকটোরলোনী নেপাল অধিগ্রহণ করেন। নেপাল ও গ্রেট ব্রিটেনের মধ্যে সুগৌলি নামক স্থানে একটি স্বল্প সময়ের চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় যা "সুগৌলি চুক্তি” নামে পরিচিত। এই চুক্তি অনুযায়ী ব্রিটিশ সৈন্যবাহিনী একটি গোর্খা রেজিমেন্ট নিয়োগ করবে তাদের পদমর্যাদা অনুযায়ী। নেপালের অধিবাসীদের ভারতীয় মুদ্রায় নেপাল সীমান্তের মোতিহারি নামক স্থান থেকে তাদের বেতন দেওয়া হবে। নেপাল ও ভারতের মধ্যে কোন পাশপোর্ট বা ভিশা সিষ্টেম থাকবে না। ও দু'টি দেশের মধ্যে মুক্ত ৰাণিজ্য নীতি থাকৰে।

ভূটান ৰাঙলার উত্তরে নেপালের পূর্বদিকে অবস্থিত। ভুটানের ভাষা ও অধিবাসীদের "ভুটিয়া" বলা হয়। ভুটানের ভাষা ইন্দো–তিব্বোতীয় গ্রুপের। লোকেরা বৌদ্ধ ধর্ম অনুসরণ করে। ভুটানও ব্রিটিশ কলোনী বা উপনিবেশ হিসাৰে ছিল ও ব্রিটিশ মুদ্রা সেখানে একদা প্রচলিত ছিল। কিন্তু এখন ভুটান একটি সার্বোভৌম রাষ্ট্র।

বাঙলার উত্তরে, নেপালের পূর্বে ও ভুটানের পশ্চিমে হ'ল সিকিম রাজ্য। সিকিমের অধিবাসীরা লেপচা ও ভুটিয়া। তাদের ধর্ম হ'ল মহাযানী অথবা লামা বৌদ্ধ ধর্ম।

নেপালের পূর্বে রয়েছে NEFA-Nort East Frontier Agency যা বর্তমানে অরুণাচল নামে পরিচিত। এর পূর্ব নাম হ'ল বালিয়াপারা। ভারতের এই ছোট্ট রাজ্যটি অবস্থিত চীনের পরেই। এখানকার অধিবাসীরা অসমীয়া ও বাংলা ভাষায় কথা বলে ও বৌদ্ধ ধর্ম অনুসরণ করে। খ্রীষ্টান ধর্মযাজকেরা এর কিছু অধিবাসীদের খ্রীষ্টান ধর্মে দীক্ষিত করতে পেরেছে। স্বাধীনতার পরে এই অঞ্চলের পুনঃনামকরণ করা হয়। এর নাম হয় অরুণাচল। এটা 'বি' শ্রেণীর রাজ্য হিসাবে অর্থাৎ ছোট রাজ্য হিসাবে ভারতীয় সংবিধানে মর্যাদা লাভ করে।

দার্জিলিং–এর আসল অধিবাসীরা হ'ল–লেপচা ও ভুটিয়া। ব্রিটিশরা দার্জিলিংকে শৈল শহর হিসাবে গড়ে তুলেছিল। আয়তনে দার্জিলিং বাঙলার মেদিনীপুর জেলার গড়বেতা ব্লকের সমান। দার্জিলিং–এ প্রচুর পরিমাণে বিভিন্ন প্রজাতীর ছোট–বড় এলাচ, কমলালেবু, ভুট্টা ও চা উৎপন্ন হয়। কিন্তু এখানে

বিশেষ কোন খনিজ সম্পদ নেই। দার্জিলিং থেকে কৃষিজ ফসল রপ্তানি করা হয়। দার্জিলিং-এ প্রায় তিন লক্ষ নেপালী অর্থাৎ লেপচা ও ভুটিয়ার বসবাস। এদের মধ্যে প্রায় ২ লক্ষ নেপালী যারা অন্যান্য এলাকা থেকে তাড়িত হয়ে এসেছে তাদের ভারতে থাকার অনুমতি দেওয়া হয়েছে। কিছু কিছু নেপালী দার্জিলিং-এ থেকেছে ও কিছু কিছু জলপাইগুড়ি জেলার মাদারী হাটে জঙ্গলকেটে পরে সেখানে বসবাস করতে শুরু করে। যে সকল নেপালীদের ভারতে থাকার অনুমতি দেওয়া হয়েছিল তাদের মধ্যে গোর্খারা ছিল। দার্জিলিং জেলায় যারা বসবাস করছিল, তাদের মধ্যে দু'টি ভাগে ভাগ করা হয়েছিল-নেপালী ও নেপালী নয় এমন। আবার নেপালীদের মধ্যে আবার দু'টি ভাগ-গোর্খা ও গোর্খা নয় এমন। সুতরাং দার্জিলিং জেলায় খুব অল্প সংখ্যক গোর্খা আছে।

অসমের বাংলা ভাষাভাষী জেলাগুলি হল-কাছাড়, গোয়ালপাড়া, ধুবরি, নগাঁও ও কামরূপ। ব্রিটিশরা ১৮২৪ সালে অসম দখল করে। এটাকে বাংলা প্রেসিডেন্সী থেকে ১৯১২ সালে আলাদা করে দেয়। কাছাড় জেলার অধিবাসীরা ৰাঙালী। এই এলাকার রাজা ছিলেন শিব সিংহ ও তার রাজধানী ছিল

হাফলং। ব্রিটিশরা তাকে পরাজিত করে কাছাড় দখল করে। রংপুর সাব ডিভিশন–গোয়ালপারা, কুচবিহার, সিতাই, দিনহাটা, মাথাভাঙ্গা ও শিতলকুচি প্রভৃতি অঞ্চল নিয়ে গঠিত। ব্রিটিশ অধিগ্রহণের আগে এই অঞ্চল কুচবিহার নেটিভ রাজ্যের অন্তর্গত ছিল। পরবর্তীতে গোয়ালপারা আলাদা হয়ে যায় ও বাকী অংশ ব্রিটিশ রংপুর উপবিভাগ নামে পরিচিত ছিল। গোয়ালপাড়া পরে আলাদা জেলায় পরিণত হয় ও তার প্রধান কার্যালয় হয় ধুবরি। ধুবরির উত্তরাংশ ভুটান সংলগ্ন ও এই অংশের অধিবাসীরা রাজবংশী ৰাঙালী যারা বাংলার রংপুরী উপভাষায় কথা বলে। লোকগণনা রিপোর্টে তাদের মাতৃভাষাকে ভুল করে অসমিয়া ভাষা হিসাবে দেখানো হয়। নওগাঁ জেলার উত্তরাংশ বন ও জঙ্গলে পরিপূর্ণ। দক্ষিণাংশ পাহাড় ও বনে পরিপূর্ণ, সেখানে হাতিদের বাস। অধিকাংশ অধিবাসীরা বাঙালী যারা বাংলা ভাষায় কথা বলে। মাত্র অল্প সংখ্যক লোক আসামীতে কথা বলে। এখানকার অধিকাংশ লোকেদের পদবী হল মণ্ডল, ভূঁইয়া ইত্যাদি। হোজাই, লংঙ্কা ও লামডিং এলাকার লোকেরা হ'ল ৰাঙালী।

কামরুপ জেলার প্রধান কার্যালয় হল গৌহাটি যা আবার অসমের রাজধানী। অধিকাংশ লোকেরা অসমীয়া। কিছু কিছু মহকুমা যেমন– নলবাড়ি, বরপেটা, হাওলি প্রভৃতি বনজঙ্গলে পরিপূর্ণ ও বাংলা ভাষী লোকের বাস। বরপেটা জেলার কিছু অংশ সম্পূর্ণরূপে বাঙালাভাষী লোকের বাস, কিন্তু বাঙালী হিন্দুদের থেকে বাঙালী–মুসলিমরাই এখানে বেশী।

মেঘালয় রাজ্যটি গারো পাহাড়, সংযুক্ত খাসিয়া ও জয়ন্তিয়া পাহাড় ও উপজাতীয় কাউন্সিল নিয়ে গঠিত। কুমুদ রঞ্জন সিংহ প্রাচীন মেঘালয় রাজ্যের রাজা ছিলেন। এখানকার অধিবাসীরা হল গারো, খাসিয়া ও বাঙালী। বাঙালীরাই অন্যান্যদের থেকে এখানে সংখ্যায় বেশী। শিলং আগের থেকে বাঙালী শহর নামে পরিচিত।

মণিপুরের রাজপরিবারের লোকেরা বাংলা ভাষায় কথা বলতেন। ত্রিপুরা ও মণিপুর রাজ্যের রাজারা চৈতন্য মহাপ্রভুর দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন। মণিপুরের অধিবাসীরা গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের অনুসরণ করত। তাদের প্রধান ধর্মগ্রন্থ ছিল চৈতন্য চরিতামৃত যা বাংলা ভাষায় রচিত। মণিপুরের

রাজধানী হল ইম্ফল। ভাষা হল মিথেই মণিপুরী যা বাংলা হরফে লেখা। মণিপুরের সৈন্যবাহিনী প্রধানতঃ কুকিদের দ্বারা গঠিত।

ভারতের উত্তর-পূর্বাংশের বিভিন্ন জাতি বা সম্প্রদায়ের মধ্যে আন্তরিকতা ও ভ্রাতৃত্ববোধ গড়ে তুলতে হবে। বাঙালী হিন্দু ও বাঙালী মুসলিমদের মধ্যে আন্তরিক বন্ধন সু-সংগঠিত করতে হবে। সমস্ত রকমের সামাজিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও শিক্ষা সংক্রান্ত কাজকর্ম বুদ্ধি ও কৌশলের সহিত করা উচিৎ। স্থানীয় লোকেদের বিরুদ্ধে যে শোষণ ও বঞ্চনা তার বিরুদ্ধে আন্দোলন ও বিক্ষোভ শীঘ্র গড়ে তুলতে হবে। বাংলাভাষী অঞ্চলগুলি বাঙালীস্তান আন্দোলনের আওতায় আনতে হবে। উত্তর-পূর্ব ভারতের ভবিষ্যৎ খুবই উজ্জ্বল।

উত্তরবঙ্গে, অসম উপত্যকা, করিমগঞ্জ, শিলচর ও কাছাড় এখানকার মানচিত্র। মাটি ও জলবায়ু রাঢ় অঞ্চলের থেকে সম্পূর্ণরূপে আলাদা। রাঢ় অঞ্চল ৩০০ মিলিয়ন বছরের পুরানো ও হিমালয় পর্বতমালার যখন সবে উৎপত্তি, তখন এসব জলের তলায় ছিল। হিমালয় পর্বতমালা গঠিত হবার পর এসব অঞ্চল

সমুদ্রের উপরে উঠে আসে ও বালি, পলি দিয়ে গঠিত হয়। সেই সময় এই সকল জায়গাগুলি একই সঙ্গে তৈরী হয়নি। সেজন্য উত্তরবঙ্গে তিন ধরণের বিশেষ মাটি পাওয়া যায়। একটা হ'ল দিয়ারা নদীর তীরে পলি মাটি, দ্বিতীয় টাল সাধারণ পলিমাটি, তৃতীয় বালিমাটি। রাঢ় অঞ্চলের পাহাড়ী অঞ্চল খাসিয়া ও জয়ন্তিয়া পাহাড়ী অঞ্চলের থেকে উঁচু। ৩০০ মিলিয়ন বছর ধরে এই পাহাড়গুলি সতত ক্ষয়ে যাওয়ার ফলে রাঢ় অঞ্চলের পর্বতগুলি ছোট হয়ে যায়। প্রাচীনকালে রাঢ় অঞ্চলের নদীগুলি ছিল বরফে পুষ্ট। বর্তমানে বৃষ্টির জলে পুষ্ট। ত্রিপুরার নদীগুলিতে রাঢ় অঞ্চলের নদীগুলির মত বৃষ্টির জলে পুষ্ট। তবে রাঢ় অঞ্চলের বৃষ্টির সময়-কাল ত্রিপুরার থেকে কম। ফলে ত্রিপুরার বেশীর ভাগ নদীগুলি বেশী সময় ধরে জলে ভর্তি থাকে। ত্রিপুরার শিল্প বিকাশের জন্যে জলবিদ্যুৎ প্রকল্প সহজে করা যেতে পারে। যদি সরকার সস্তায় ত্রিপুরায়, উত্তরবঙ্গে, অসম উপত্যকায় বিদ্যুৎ উৎপন্ন করতে চায়, তাহলে জলবিদ্যুৎ হল শক্তির আদর্শ উৎস। তুলনায় সৌরশক্তির মূল্য হৰে বেশী। এই বিশাল এলাকায় অনেক বড় বড় নদী আছে যেমন-মহানন্দা, বালাসাই, তিস্তা, বুড়িতিস্তা, জলঢাকা, গোরাধী, ব্রহ্মপুত্র, বরাক, কুশিয়ারা, গোমারী ও ফেনি।

সূচীপত্র

এই নদীগুলি থেকে প্রচুর পরিমাণে জলবিদ্যুৎ উৎপন্ন করা যাবে। এই অঞ্চলের মৃত্তিকা কিছুটা বেলেযুক্ত। কিন্তু রাঢ় অঞ্চলের মাটি আঠালো। এই ধরণের কিছুটা বালিযুক্ত আঠালো। মাটি–পাট, ডাল শস্য ও অন্যান্য গ্রীষ্মকালীন শস্যের জন্য আদর্শ। গ্রীষ্মকালীন ফসলের মধ্যে, ডাল, মটর, ছোলা ইত্যাদি এখানে ভাল হয়। উত্তরবঙ্গের নদীগুলিতে প্রচুর পরিমাণে পলিমাটি থাকে তাই এসব অঞ্চলের মাটি নরম। সুতরাং বাঁধ নির্মাণের সময় কংক্রীটের ভিত্তি করা অবশ্যই দরকার। গত ১৩৫ বছর ধরে কোসী নদী প্রায় ১০০ বার তার গতিপথ পরিবর্তন করেছে, তার প্রধান কারণ হল এই এলাকার নরম মাটি। সেজন্য প্রয়োজন যে সমস্ত বাঁধ তৈরী হবে তার ভিত্তি ও চার পাশ কংকীটের করতে হবে, যাতে বাঁধগুলি বেশী মজবুত হৰে ও বেশীদিন টিকৰে।

এখানে প্রচুর পাট হয়। পাটকে নির্ভর করে নাইলন, রেয়ন, দেশলাই কাঠি, প্লাসটিক ও পাটের উলের কারখানার বিকাশ লাভ হতে পারে। নাইলন ও উল উৎপাদনের মধ্যে দিয়ে উন্নতমানের গরমের পোশাক উৎপন্ন করা যেতে পারে। এই

সূচীপত্র

এলাকায় পাটের সুতোর কারখানা গড়ে তোলা যেতে পারে। রাঢ় অঞ্চলের সুতোর কারখানা গড়তে গেলে কারখানায় কৃত্রিমভাবে বাষ্পায়নের ব্যবস্থা করতে হবে। কিন্তু উত্তরবঙ্গের স্থানীয় আবহাওয়াটা খুবই ভাল আঁশ জাতীয় পদার্থ উৎপাদনের ক্ষেত্রে। সুতরাং কৃত্রিম বাষ্পায়নের প্রয়োজন নেই পাটের তৈরী সুতো কারখানার জন্যে।, উত্তরবঙ্গে আতা–নোনা, সজনে, তুঁত গাছ প্রচুর পরিমাণে জন্মায়। ফলে এখানে প্রচুর রেশম উৎপন্ন করা যেতে পারে। বালুরঘাট, রায়গঞ্জ ও মালদার উত্তরাংশ বাদে বাকী অংশে ক্ষার জাতীয় মাটি হওয়ায় আম ও লিচু ভাল হয়। আনারস ও কলাও এখানে প্রচুর পরিমাণে করা যাবে। কাঁটাল চাষের পক্ষে ভাল জায়গাগুলি হ'ল–জলপাইগুড়ি, কুচবিহার, ধুবরী, করিমগঞ্জ, কাছাড়, অসম উপত্যকা ও শিলচর ও ত্রিপুরা। কলা, আনারস ও কাঁটাল থেকে উন্নতমানের আঁশ তৈরী করা যায় যার সাহায্যে কাপড়ের শিল্প গড়া যেতে পারে। আনারস ও কলা চাষের জন্যে জলীয় বাষ্প সমৃদ্ধ আবহাওয়া প্রয়োজন। কিন্তু কাঁটালের তেমন কোন আবহাওয়া লাগে না। এটা সব ধরণের জলবায়ুতে হতে পারে। বিশেষ করে ত্রিপুরার জলবায়ু কাঁটাল চাষের পক্ষে খুবই ভাল। সুন্দর আঁশ ছাড়াও অ্যালকোহলও কাঁটাল থেকে তৈরী হয়।

ত্রিপুরার অ্যালকোহল সম্পর্কিত যে সকল শিল্প যেমন ঔষধ তৈরীর কারখানা এখানে গড়ে তোলা যেতে পারে। উন্নতমানের চিনিও কাঁটাল থেকেও তৈরী হতে পারে। তরাই অঞ্চলে কমলানেবুর উপর ভিত্তি করে এখানে কমলার জুস তৈরীর কারখানা গড়ে উঠতে পারে। জলপাইগুড়িতে ধানের তুষ থেকে ব্রান তেল তৈরী হতে পারে ও এই সঙ্গে লাইম স্টোনের দ্বারা সিমেন্ট তৈরীর কারখানা তৈরী করে অনেকটা উপকৃত হতে পারে। দার্জিলিং ও অসম উপত্যকায় প্রচুর পরিমাণে তামা পাওয়া যেতে পারে। তাছাড়া, করিমগঞ্জ ও ত্রিপুরায় নরম বাঁশ প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হয় যা কাঁচামাল হিসাবে কাগজ, প্লাষ্টিক ও রেয়ন শিল্পে ব্যবহৃত হতে পারে। বাঁশের সবুজ পাতা থেকে নতুন ধরণের বিকল্প খাবার তৈরী হতে পারে। সুন্দর আঁশযুক্ত ফাইবার আনারসের পাতা থেকে তৈরী হতে পারে। যদি নদীর উপর বাঁধ দেওয়া যায়, তাহলে কৃত্রিম খাল নির্মিত হতে পারে। এতে করে আসা-যাওয়ার নূতন জলপথ হতে পারে। রাস্তার দুই ধারে শাল, সেগুন ও মেহগিনি গাছ লাগানো যেতে পারে। স্থানীয় জলবায়ু এই ধরণের গাছের দ্রুত বেড়ে ওঠার পক্ষে অনুকুল। এদের সাহায্যে নন-মালবেরী সিল্ক উৎপন্ন হতে পারবে। এখানে শিল্প গড়তে জলবিদ্যুৎ উৎপাদন করা যেতে

সূচীপত্র

পারে। সৌরশক্তি থেকেও বিদ্যুৎ উৎপন্ন করা যায়। কিন্তু এটা বেশ ব্যয় সাপেক্ষ। রায়গঞ্জ, বালুরঘাট, ও উত্তর মালদায় আউস ধান জন্মাৰে প্রচুর পরিমাণ। উত্তর কাছাড়, মিকির হিল, লামডিং-এ ত্রিপুরার মতই সমস্যা রয়েছে। মেঘালয়ের নদীগুলির কিছু অংশ বরফ জলে পুষ্ট ও কিছু অংশ বৃষ্টির জলে পুষ্ট। এই এলাকায় প্রচুর বৃষ্টিপাতের সুবাদে এখানে জলবিদ্যুৎ উৎপন্ন করার সুবিধা রয়েছে। মাটি তেমন উর্বর না হওয়ায় খাদ্যশস্য ভাল জন্মায় না। তবে এখানে আখের চাষ বেশ লাভজনক হতে পারে। সুতরাং কাগজ ও চিনির কল তৈরীর সুযোগ রয়েছে বা এই কারখানাগুলিও গড়ে উঠতে পারে। মেঘালয়ের পাহাড়গুলি ত্রিপুরার মতই ও সমভূমি সমুহ অনেকটা উত্তরবঙ্গের মত।

যে অঞ্চলে প্রচুর বৃষ্টিপাত হয় সেখানে আম ও লিচুর চাষ করা যায়। কিন্তু কিছু কিছু জায়গায় প্রচুর পরিমাণে পোকার উপদ্রব দেখা দেয়। ভারতের মধ্যে সব থেকে বেশী আম ও লিচু এই এলাকায় উৎপন্ন হয়। যতই উপকুলবর্তী এলাকার দিকে যাওয়া যায় ততই আর্দ্র জলবায়ু দেখা যায়। এই ধরণের জলবায়ু আনারস, কলা ও সুপারি চাষের পক্ষে আদর্শ।

ইংরাজীতে সুপারিকে বলে "arecanut"। ভারতে সুপারিকে ইংরাজীতে ৰলে "betel nut"। Betel একটি তামিল শব্দ যার অর্থ মিউজিক (music)। যতই পশ্চিম দিকে যাওয়া যায় ততই আবহাওয়া শুষ্ক হতে থাকে। এই ধরণের জলবায়ু কলা আনারস চাষের পক্ষে একদম ভাল নয়। বিহারের মিথিলায় কোন আনারস বা কলা উৎপন্ন হয় না। উত্তরপূর্ব ভারত সামাজিক-অর্থনৈতিক দিক দিয়ে যথেষ্ট সম্ভাবনাময়। এই সম্ভাবনাকে যথাযথভাবে সবশ্রেণীর মানুষদের সামগ্রিক উন্নতির জন্যে কাজে লাগাতে হবে।

দক্ষিণৰঙ্গ

দক্ষিণবঙ্গের প্রাচীন নাম সমতট। এই সমতট সমুদ্র নিকটবর্তী স্থান। কথ্য বাংলায় সমতটকে ৰলে ৰাগড়ি।

সমতটের পূর্বে বঙ্গ ডবাক্, পশ্চিমে রাঢ়, উত্তরে বরেন্দ্রভূমি আর দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর। অর্থাৎ মুর্শিদাবাদের পূর্বাংশ আর কুষ্টিয়া, নদীয়া, চব্বিশ পরগণা, কলকাতা, যশোর, খুলনা, বরিশাল, ফরিদপুর আর পটুয়াখালি–এতগুলি জেলা নিয়ে দক্ষিণবঙ্গ। এর পশ্চিমে ভাগীরথী নদী, উত্তরে গঙ্গা ও পদ্মা আর পূর্বে বয়ে চলেছে পদ্মা ও যমুনা নদী। এই তিনটি নদী নিয়ে দক্ষিণবঙ্গ যেন ত্রিভুজাকৃতি।

গঙ্গা, ভাগীরথী, পদ্মার পলিমাটি দিয়ে গঠিত দক্ষিণবঙ্গ প্রাচীনত্বের দৃষ্টিতে রাঢ় থেকে অনেক সাম্প্রতিককালের। রাঢ়ের মাটি ৩০ কোটি বছরের পুরনো আর সমতট মাত্র দশ হাজার থেকে পনের হাজার বছরের পুরনো। তাই আট হাজার বছরের বেশী পুরনো কোন পুরাতাত্ত্বিক নিদর্শন সমতটে পাওয়া যাবে না। সুন্দরবন অঞ্চল তো আরও নোতুনতর। সমতটের মাটি ভিজে আর উর্বর।

সমতটের আবহাওয়া আর্দ্র, তাই এখানকার অধিবাসীরা পরিশ্রমী নয়। বছরের অধিকাংশ সময় বৃষ্টিপাত হয়। একদিকে চরম গরম, অন্যদিকে অত্যধিক বৃষ্টি, এই দুইয়ের বিরুদ্ধে

যুঝতে হয় বলে সংগ্রাম মুখর। যেহেতু সমতট মূলতঃ পলিমাটি দিয়ে তৈরী, আর কিছু অংশ সমুদ্রোত্থিত, তাই এখানে কোন খনিজ সম্পদ নেই। এক সময় সমতট মুক্তো আর অন্যান্য সমুদ্র–সম্পদের (sea-products) এর জন্যে বিখ্যাত ছিল। বাঙলার বণিকেরা মুক্তোর ব্যবসা করতে চীন, রোম, মিশর আর মেসোপটেমিয়ায় যেতেন, কেননা সেখানে এর খুব চাহিদা ছিল।

সমতটের সভ্যতার সূত্রপাত আট হাজার বছর আগে। সাতশ' বছর আগে অর্থাৎ পাঠান রাজত্বের শুরুর দিকে এক প্রলয়ঙ্করী সাইক্লোনে সমতট ডুবে যায়। সমুদ্রের জল তখন প্রায় বিশ ফুট উঁচু হয়ে দু'শ' মাইল স্থলভাগে ঢুকে যায় ও সবকিছুকে ধ্বংস করে দেয়। নগর–শহর–গ্রাম–গাছপালা–পশু–মানুষ সম্পূর্ণ ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। জল নেমে গেলে দেখা যায় সেই অঞ্চলে কেউ জীবিত নেই। রাঢ়ের মানুষ তারপরে গেল সমতটে, তারা কৃষি সরঞ্জাম নিয়ে চাষবাস শুরু করল সেই বিশাল জনমানুষহীন স্থানে। গাছপালা, শস্য–শিল্পে শ্যামলিমায় সমতট ভরে উঠল। তৈরী হ'ল বিশাল বনাঞ্চল, যা আজকের

সুন্দরবন। সেই জঙ্গলের কিয়দংশ কেটে পরিষ্কার করে তারা গড়ে তুলল গ্রাম–বসতি।

প্রাকৃতিক প্রকোপকে নিয়ন্ত্রণ করতে গেলে সমুদ্রতীরবর্তী বরাবর এক মাইল চওড়া বনসর্জন করতে হবে। এতে শিশু, চিলগুজা, কাজু, কাঁটাল, পাইন, ঝাউ প্রভৃতির জঙ্গল তৈরী করতে হবে। এই গাছগুলো স্বাভাবিক প্রাচীরের মত সাইক্লোন ও প্রাকৃতিক ধ্বংস থেকে এই অঞ্চলকে রক্ষা করবে। এতে করে কৃষিজমির পরিমাণ হ্রাস থেকে রক্ষা পাওয়া যাবে। নূতন বনসর্জন বৃষ্টিপাতের প্রাচুর্য ঘটাবে। কাজু, কাঁটাল প্রভৃতি অর্থকরী ফসলের উৎপাদন বাড়াবে। তাতে স্থানীয় লোকের ক্রয়ক্ষমতা বেড়ে যাবে। যদি কোন এলাকায় ইতোমধ্যে এই ধরণের প্রাচীর তৈরী হয়ে থাকে তবে তাকে নষ্ট করা চলবে না। বরঞ্চ অরণ্য সর্জন ৰাড়াতে হবে। যদি শিশুগাছ ঘন ঘন লাগনো যায় তবে তার পাতার ছিদ্র মেঘকে টেনে এনে বৃষ্টিপাত ঘটাৰে। যা আবহাওয়ার পরিবর্তন ঘটাৰে।

ওই বিধ্বংসী সাইক্লোন সমতটের আবহাওয়ায় এক বড় পরিবর্তন ঘটাল, আর সমতটের মাটি, বিশেষ করে চব্বিশ

পরগনার দক্ষিণাঞ্চল সম্পূর্ণ লবণাক্ত হয়ে পড়ল। নোনা মাটিতে শস্য ভাল ফলতে চায় না; বস্তুতঃ নোনা মাটি কৃষির পক্ষে প্রায় অনুপযুক্ত। মাটি আর ইটের তৈরী বাড়ীঘর এই ক্ষয়িষ্ণু প্রভাবে তাড়াতাড়ি ভেঙ্গে পড়ে। সমুদ্রের নোনা জলও কৃষিকাজে একেবারেই কাজে লাগানো যায় না। দক্ষিণবঙ্গের চাষীরা অতিকষ্টে বছরে একটি ফসল তুলতে পারে, যা পর্যাপ্ত নয়। এই নোনা আবহাওয়ার কারণে সমতটের মানুষ বছরভর পেটের রোগে ভোগে। তাই কৃষি, ব্যবসা-বাণিজ্যের বিশেষ সম্ভাবনাও প্রায় নেই। একসময় এখানে কিছু মাঝারী ধরণের কুটির শিল্প ছিল, আজ তাও অপসৃয়মান। এই শোচনীয় আর্থিক পরিস্থিতির সঙ্গে সমতট প্রচণ্ড মানস-অর্থনৈতিক (psysho-economic) শোষণের শিকার।

অথচ এই সমতট অতীতে বাঙলার পঞ্চাশ ভাগ সম্পদ আর গৌরবের অংশীদার ছিল। প্রাচীন রোমের ঐতিহাসিকেরা বাঙলাকে গঙ্গারিডি রূপেই (গঙ্গা নদী ও রাঢ়ের মধ্যবর্তী স্থান) বর্ণনা করতেন। বাঙলার ঐতিহাসিক উত্তরাধিকার গঠনে সমতটের অবদান সমধিক, কেননা এই সমতট বাঙালীর সংগ্রামী চেতনার প্রতীক-স্বরূপ ছিল। প্রতিটি যুগে সমতটের

মানুষ বিদেশী আক্রমণের ঝড়কে সামলিয়েছে। বিদেশী আক্রমণকারীরা দক্ষিণবঙ্গের উপকূল দিয়েই বাঙলায় প্রবেশের সর্বদা চেষ্টা করত। সমতটের গৌরব, প্রাকৃতিক সৌন্দর্য আর আর্থিক উন্নতি বিদেশী পর্যটকদের কাছে বিশেষ আকর্ষণীয় ছিল। কিন্তু সেই অঞ্চল, লবণাক্ত আবহাওয়া আর আর্থিক শোষণের কারণে আজ চরম দুর্দশাগ্রস্ত। এখন সমতটকে নোতুন করে গড়ে তুলতে হবে।

প্রায় চার হাজার বছর আগে সাগর নামে সমতটের এক প্রতাপশালী রাজা ছিলেন, তিনি এক দুর্ধর্ষ নৌশক্তি গড়ে তুলেছিলেন। তাঁর সার্বভৌম কর্তৃত্বে এই নৌবহর বঙ্গোপসাগরকে রক্ষা করত। তাঁর পুত্র ভগীরথ যিনি ইঞ্জিনিয়ার ছিলেন, পূর্বরাঢ় ও বাঙলার দক্ষিণাংশে কৃষির উন্নতির জন্যে দক্ষিণ মালদা থেকে বঙ্গোপসাগর পর্যন্ত এক খাল তৈরী করেছিলেন। এটি আজ ভাগীরথী নদী নামে পরিচিত। পুরনো বাংলা ছড়ায় এই খাল 'ভগার খাল' নামে অভিহিত। (সাগর রাজার নামানুসারে) বঙ্গোপসাগরকে 'সাগর' বলা হত।

সমতটের সবচেয়ে বড় অভিশাপ এর লবণাক্ততা, সেজন্যে এই অঞ্চলকেই বলা হয় 'নোনা মাটির বাঙলা'। তাই দক্ষিণৰঙ্গকে এই লবণাক্ততার হাত থেকে বাঁচাতে উপযুক্ত ব্যবস্থা নেওয়া প্রয়োজন। প্রথমে রাঢ়ের বিভিন্ন নদী যেমন–সুবর্ণরেখা, কংসাবতী, দামোদর, অজয়, ময়ূরাক্ষী, রূপনারায়ণ–থেকে মিষ্টি জল নিয়ে আসতে হৰে সমতটে। মাটির নীচে বিশাল পাইপ বসিয়ে, তার মাধ্যমে মিষ্টি জলকে প্রবাহিত করে নিয়ে এসে, এখানকার খাল–বিল–পুকুর, নদী আর জোড়ে ফেলতে হবে। এর ফলে সাগর–সঙ্গমের নিকটবর্তী স্থান ছাড়া সমতটের সব নদী আবার মিষ্টি জলে পরিপূর্ণ হয়ে উঠবে।

এইভাবে যখন এখানকার মাটি তার প্রাকৃতিক রূপ ফিরে পাৰে ও লবণাক্ততা থেকে মুক্ত হৰে, তখন বছরে চারটি ফসল তো পাওয়া যাবেই, তৎসহ অন্যান্য অর্থকরী ফসলও উৎপন্ন হবে। এছাড়া এখানকার বায়ুতেও লবণভাব কমে যাবে। সামগ্রিকভাবে এই অঞ্চলে উন্নত কৃষি, ব্যবসা–বাণিজ্য আর শিল্পোন্নয়নের অনুকূল পরিবেশ তৈরী হবে।

শিল্পকেন্দ্রের জন্যে প্রয়োজনীয় বিদ্যুৎ পাওয়া যাবে বঙ্গোপসাগরে উত্থিত বড় বড় ঠেউ আর তরঙ্গ থেকে। এইভাবে দক্ষিণবঙ্গের ঘরে ঘরে কুটিরশিল্প গড়ে উঠৰে। যাতে করে চাষী পরিবারের মেয়েরাও শিল্পোৎপাদনের অংশ নিতে পারবে। এর সুদূরপ্রসারী প্রভাবে আজকের ক্রমবর্ধমান বেকার সমস্যারও সমাধান হয়ে যাবে। দক্ষিণবঙ্গ বিদ্যুৎ-উৎপাদনে অবশ্যই স্বনির্ভর হবে। এছাড়া উইণ্ড মিলের মাধ্যমে অতিরিক্ত বিদ্যুৎ-উৎপাদনও করা যাবে।

তাহলে দেখা গেল দক্ষিণৰঙ্গের টিকে থাকা নির্ভর করে লবণাক্ততা থেকে মুক্ত হওয়ার ওপর। অধিকাংশ নদী আর খাল এখন পাঁকে ভর্তি হয়ে রুদ্ধ জলাশয়ে পরিণত হয়েছে। এগুলোকে পুনরুদ্ধার করতে হবে, আর উপযুক্ত নিকাশী ব্যবস্থাও গড়ে তুলতে হবে। এককালে দক্ষিণবঙ্গ জাহাজ শিল্পের জন্যে বিখ্যাত ছিল, আর এখানে অনেকগুলি জাহাজনির্মাণ কেন্দ্রও ছিল। ১৫০ বছর আগেও এই কেন্দ্রগুলি থেকে বড় বড় জাহাজ তৈরী হত।

দক্ষিণৰঙ্গের আর একটি লাভজনক শিল্প হচ্ছে লবণ-শিল্প। অতীতে এখানকার লবণ সমগ্র ভারতের চাহিদা মিটিয়েও বাইরে

সূচীপত্র

রপ্তানী হত। ব্রিটিশ রাজত্বে সুপরিকল্পিত ভাবে এই লবণ–শিল্পকে ধ্বংস করা হয়েছে, যার ফলে প্রায় পাঁচ মাস মানুষ তাদের বংশানুক্রমিক জীবিকা থেকে বঞ্চিত হয়েছে। দক্ষিণৰঙ্গের নবনির্মাণে এই লবণ–শিল্পকে আবার গড়ে তুলতে হৰে। অতীতকাল থেকেই সমতট বার বার রাজনৈতিক দুর্গতির কবলে পড়েছে, কিন্তু এই অঞ্চলের মানুষ আবার জেগে উঠৰে আর সমস্ত বাধাকে অতিক্রম করতে পারবে।

দক্ষিণৰঙ্গের উপকূল অঞ্চলে অনেক প্রকারের সমুদ্র–শৈবাল পাওয়া যায়। যা ওষুধ শিল্পের জন্যে প্রয়োজনীয়। কৃষিভিত্তিক ও কৃষিনির্ভর (agro and agrico) শিল্পের বিকাশের মাধ্যমে স্থানীয় জনসাধারণ বেকারীর জ্বালা থেকে মুক্ত হতে পারবে; এর সঙ্গে সঙ্গে কুটির–শিল্প, ক্ষুদ্র শিল্প আর সমবায় সংস্থাগুলি গরীবের আয়ও বৃদ্ধি করৰে। লবণাক্ততার অভিশাপ থেকে মুক্ত হয়ে এখানকার মানুষ তাদের প্রাণশক্তি ফিরে পাৰে। তার এক–নবজীবনে উত্তরণ ঘটবে আর তারা সুস্বাস্থ্য, সুদীর্ঘ জীবন, উষ্চমানের জীবনধারণের অধিকারী হবে।

২০ এপ্রিল ১৯৮৯, কলকাতা

সূচীপত্র

কাঁথি অববাহিকা পরিকল্পনা

সমুদ্র উপকূলবর্তী কাঁথি অববাহিকা এলাকা, রসুলপুর নদী যেখানে সমুদ্রে মিলিত হয়েছে, সেইখান থেকে শুরু করে সুবর্ণরেখা নদীর সমুদ্র–সঙ্গম পর্যন্ত বিস্তীর্ণ। ইংরেজরা কাঁথির নাম পাল্টে করেছিল কন্টাই। কারণ মুর্শিদাবাদ জেলায় কান্দি ও মেদিনীপুরের কাঁথি তাদের কাছে একই রকম শোণাত। তাই তারা কাঁথির নাম পাল্টে কন্টাই (Contai) করে দিয়েছিল।

কাঁথি এলাকায় যত ধরণের সম্পদ রয়েছে তাদের অবলম্বন করে, ক্ষুদ্র, মাঝারি বা বৃহৎ শিল্প উদ্যোগের মধ্য দিয়ে সুসংগঠিত ভাবে পরিকল্পনা উন্নয়নের কাজকে এগিয়ে নিযে যেতে হবে। পৃথিবীর প্রায় সব অঞ্চলেই প্রকৃতি নানাভাবে অকৃপণ হাতে সম্পদ ছড়িয়ে রেখেছে। জলে–স্থলে–অন্তরীক্ষে, মরুভূমিতে, পাহাড়ে, সমুদ্রগর্ভে, গভীর অরণ্য ইত্যাদি বহু

এলাকায়–কোথাও প্রকৃতি তার সম্পদ ছড়িয়ে দিতে কার্পণ্য করেনি। মানুষের বুদ্ধি, বোধি, কঠোর উদ্যোগ, পারস্পরিক সহযোগিতা ও বাণিজ্যিক বুদ্ধি দ্বারা সেই সম্পদকে কাজে লাগিয়ে এক একটি অঞ্চলকে শিল্পে, কৃষিতে, ৰাণিজ্যে বিকশিত ও স্বয়ংসম্পূর্ণ করে তুলতে হবে। প্রাউটের অর্থনীতির অন্তর্ভুক্ত হ'ল–অর্থনৈতিক বিকেন্দ্রীকরণ, আঞ্চলিক বৈষম্য দূরীকরণ, ক্রয়ক্ষমতা দান ও জীবনযাত্রায় উন্নতি ঘটিয়ে স্বয়ংসম্পূর্ণ অর্থনৈতিক অঞ্চল গঠন। কাঁথি অববাহিকা পরিকল্পনার ক্ষেত্রেও প্রাউটিষ্টরা এই নীতিগুলি কার্যকর করবে।

কাঁথি অববাহিকার উন্নয়ন প্রকৃতপক্ষে উপভুক্তি (block-level) অর্থনৈতিক উন্নয়ন প্রকল্পের অন্তর্ভুক্ত। এই প্রকল্পের বৈশিষ্ট্য হবে–বহুকৌণিক সুসন্তুলিত সর্বাত্মক গ্রামীণ উন্নয়ন প্রকল্প (Multidimensional Balanced Integral Rural Development Planning)। কাঁথি এলাকায় কত পরিমাণ বা কী পরিমাণ সম্পদ ও সম্ভাবনা লুকিয়ে আছে, সে ব্যাপারে গত ৪০ বছর ধরে কোন সরকারই কোনরকম গঠনমূলক পদক্ষেপ গ্রহণ করেনি। কাঁথি এলাকায় রয়েছে বহুবিধ সমস্যা। সেই বিশেষ বিশেষ সমস্যাগুলিকে দূর করে সম্পদগুলিকে কীভাবে কাজে

লাগানো যাবে, তার জন্যে পরিকল্পনা তৈরী করতে হবে। তবে কাঁথি এলাকায় অন্যান্য সমস্যার মধ্যে সবচেয়ে বড় সমস্যা হ'ল এই অঞ্চলের সামুদ্রিক ঝড়।

কাঁথি এলাকা সমুদ্র তীরবর্তী একটা নীচু এলাকা। এই স্থানের সমুদ্র উপকূল [অঞ্চল] থেকে ২০০–৩০০ মাইল দূরে প্রায়ই বঙ্গোসাগরের বুকে নিম্নচাপের সৃষ্টি হয়। ফলে এই অঞ্চলের মানুষ, জনবসতি, কৃষিক্ষেত্র ও অন্যান্য স্থান প্রায়ই প্রৰল ঝড়ের দ্বারা আক্রান্ত ও ক্ষতিগ্রস্ত হয়। প্রকৃতির এই নিষ্ঠুরতাকে বশে আনার জন্যে কাঁথি অববাহিকা অঞ্চলের সমুদ্র উপকূল বরাবর এক মাইল চওড়া করে শিশুগাছ, চিলগুজা গাছ, কাজু বাদামের ঝাড়, কাঁটাল গাছ, পাইন ও ঝাউ ইত্যাদি লাগিয়ে দিয়ে কৃত্রিম বনাঞ্চল গড়ে তুলতে হবে। ঝড়ের ঝাপটা ও বাতাসের ক্ষুধিত নখের আঁচড় যাতে গাছপালা উপড়ে, ঘর–বাড়ী উড়িয়ে এই অঞ্চলের মানুষের ক্ষতি করতে না পারে, তার জন্যে এই কৃত্রিম বনরেখা প্রাচীরবর্ণ হিসেবে কাজ করবে। এক নোতুন ধরণের বন–সর্জন–প্রকল্পকে (afforestation policy) কাজে লাগাতে হবে। এতে সুফলও হৰে অনেক। সমুদ্রের ঝড় রোধ করা যাবে, কৃষি ও গাছপালার

ক্ষতি প্রতিরোধ হবে, নোতুন বনজ সম্পদ বৃদ্ধি পাৰে, বৃষ্টিপাতের পরিমাণ বৃদ্ধি করা যাবে। কাজু ও কাঁটাল জাতীয় অর্থকরী ফসলের চাষ বাড়িয়ে এই অঞ্চলের মানুষের ক্রয় ক্ষমতাকে বাড়িয়ে তোলা যাৰে। এই বনসৃষ্টি করতে গিয়ে কোথাও যদি গ্রাম বা জনপদ মাঝে পড়ে যায়, তবে সেই গ্রাম বা বসতি ভেঙ্গে ফেলা হবে না। তাদের পাশ কাটিয়ে সমুদ্র উপকূল বরাবর বন-রেখাকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে। শিশুগাছ যদি ঘন করে লাগানো হয়, তবে এই গাছের পাতা মেঘ টেনে আনবে। তাতে বৃষ্টিও হৰে। ফলে আঞ্চলিক আবহাওয়ায় একটা বড় ধরণের কল্যাণকর পরিবর্তন আসবে।

কাঁথির এই উপকূল এলাকায় ভূমিক্ষয় রোধের ব্যবস্থা হিসেবেও এই কৃত্রিম বন ব্যাপকভাবে সাহায্য করবে। ঝাউ আর শিশুগাছের শিকড় ছড়িয়ে পড়বে মাটির গর্ভে জালের মত বিস্তীর্ণ হয়ে, তাতে মৃত্তিকা কণাগুলি দৃঢ়ভাবে ভূমিসংলগ্ন হয়ে থাকতে বাধ্য হবে। ফলে ভূমিক্ষয়ও রোধ করা যাবে। গ্রামে এই ভূমিক্ষয়কে বলে 'খোয়াই'। এছাড়া কাঁথি এলাকায় সমুদ্র বেলাভূমিতে বালুগুলি যাতে ফাঁকা পড়ে না থাকে তার জন্যে সমুদ্রবেলায় তরমুজ, খরবুজা, পটোলের চাষ করে খোয়াই রোধ

করা যাবে। এভাবে চাষের ফলে সমুদ্রতীরবর্তী সৈকত ভূমির বালু উড়ে যাবে না। খালি পড়ে থাকলেই সমুদ্রের দমকা হাওয়ার ঝাপ্টায় বালু উড়িয়ে নিয়ে যায় আর ভূমিক্ষয় ঘটায়। তাতে সমুদ্র গ্রাস করতে করতে এগিয়ে আসে।

কাঁথি অববাহিকায় ব্যাপকভাবে সামুদ্রিক শিল্প গড়ে ওঠবার সম্ভাবনা রয়েছে। যেমন–মুক্তোর চাষ, লবণ উৎপাদন কেন্দ্র, আয়োডিন ও ফসফরাস্ উৎপাদন কারখানা, ঝিনুক ও শঙ্খ শিল্প, সামুদ্রিক গুল্ম–ভিত্তিক শিল্প (Sea-weed-Industry), অর্থকরী ফসল উৎপাদন ইত্যাদি।

মুক্তোর চাষ

সমুদ্রের জল ধরে রেখে কৃত্রিম উপায়ে ব্যবসায়িক ভিত্তিতে এই অঞ্চলে ঝিনুকের চাষ ও মুক্তোর চাষ করা সম্ভব। সম্পূর্ণ কৃত্রিম উপায়েও এখানে মুক্তোর চাষ গড়ে উঠতে পারে। এই মুক্তোর বাজারে ও দূরদেশের আন্তর্জাতিক বাজারে প্রেরণ করে যথেষ্ট অর্থ উপার্জন করা সম্ভব। এছাড়া মুক্তো–নির্ভর অলঙ্কার

শিল্পও গড়ে উঠতে পারে কাঁথি এলাকায়। এই ধরণের উদ্যোগ– পশ্চিমবঙ্গের এই অনুন্নত এলাকায় গ্রামীণ অর্থনীতিকে নোতুন সম্পদ ও সম্ভাবনায় ভরিয়ে তুলতে পারে। জাপানে কৃত্রিম উপায়ে মুক্তোর চাষ সেই দেশের উপকূলবর্তী গ্রাম্য জেলের পরিবারদেরও ভাগ্য পাল্টে দিয়েছে। পশ্চিমবঙ্গের কাঁথিতেও মুক্তো চাষের যথেষ্ট সুযোগ রয়েছে।

লবণ উৎপাদন কেন্দ্র

কাঁথির সমুদ্র উপকূলে এক মাইল প্রস্থযুক্ত যে দীর্ঘ বনরেখা গড়ে তোলা হৰে তারই ফাঁকে ফাঁকে নির্মাণ করা যাবে লবণ উৎপাদন কেন্দ্র (Salt manufacturing units)। সমুদ্রের ধারে ধরে নির্মিত হবে লবণের পুকুর (salt tank)। এতে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ভাবে শত শত পরিবারের কর্মসংস্থানও হৰে। কাঁথি অববাহিকা অঞ্চলের বেকার সমস্যাও দূরীভূত হবে। লবণের জন্যে পশ্চিমৰঙ্গকে গুজরাট, মহারাষ্ট্র বা দক্ষিণ ভারতের ওপর নির্ভরশীল থাকতে হবে না। রাজ্য থেকে অর্থের বহিঃস্রোতও

বন্ধ হয়ে যাবে ও তাতে পশ্চিম ৰাঙলায় সামগ্রিক অর্থনৈতিক কল্যাণ সাধিত হবে।

আয়োডিন–ফসফরাস্ উৎপাদন কারখানা

কাঁথি এলাকার সমুদ্রে এমন অনেক সামুদ্রিক গাছ–গাছড়া রয়েছে যাদের থেকে বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতির সাহায্যে আয়োডিন, ফসফরাস, পটাসিয়াম, সোডিয়াম ও ক্লোরাইড় প্রভৃতি মূল্যবান রাসায়নিক পদার্থ সংগ্রহ করা সম্ভব। এইসব রাসায়নিক দ্রব্যের সাহায্যে এই অঞ্চলে অনেক রাসায়নিক কারখানা গড়ে উঠতে পারে। আয়োডিনের সাহায্যে এই এলাকায় গড়ে উঠতে পারে ওষুধ নির্মাণের কারখানা।

ঝিনুক ও শঙ্খশিল্প

কাঁথি সমুদ্রতটে অজস্র ধরণের সুন্দর সুন্দর ঝিনুক পাওয়া যায়। ওইসব ঝিনুক দিয়ে অলঙ্কার, গৃহসজ্জা, শিল্প, নানারকম

হস্তশিল্প গড়ে তোলা সম্ভব। এছাড়া শঙ্খশিল্প এই অঞ্চলে প্রসার লাভ করতে পারে।

সামুদ্রিক গুল্ম–ভিত্তিক শিল্প (Sea-weed-Industry)

কাঁথি অঞ্চলের সমুদ্র–গর্ভে রয়েছে নানা ধরণের জলজ গাছ ও গুল্ম। এইসব জলজ উদ্ভিদের দেহ থেকে নিষ্কাশিত হতে পারে নানারকমের ওষুধ ও প্রোটিন জাতীয় খাদ্য। এইসবের জন্যেই কাঁথি অববাহিকায় নানাস্থানে একাধিক sea-weed-processing factory নির্মাণ করা যেতে পারে। সামুদ্রিক গাছগাছড়ায় প্রোটিন পর্যাপ্ত পরিমাণে রয়েছে। এদের মধ্যে অনেক গাছগাছড়াই তৃণবর্গীয় ও তাদের মধ্যে থেকে প্রচুর প্রোটিন সংগ্রহ করা যাবে। তৃণবর্গীয় এইসব weeds থেকে সংগৃহীত প্রোটিন নিরামিষভোজীরা সাত্ত্বিক খাদ্যরূপে গ্রহণ করতে পারবেন। যদি কোন সামুদ্রিক গাছ–গাছড়া থেকে সংগৃহীত প্রোটিন ভক্ষণ করে কারও শরীরে এলার্জি দেখা দেয়, তবে সেই জাতীয় সামুদ্রিক গাছগাছড়ার প্রোটিনকে তামসিক খাদ্য বলে বুঝতে হবে। প্রোটিন জাতীয় খাদ্য ওষুধ রূপে

ব্যবহারের জন্যে প্রোটিনযুক্ত ওষুধ ও বটিকা নির্মাণের কারখানাও গড়ে তোলা যাৰে কাঁথি এলাকায়।

অর্থকরী ফসল উৎপাদন

কাঁথি এলাকায় অর্থকরী ফসল হিসেবে নারকেল, পটোল–তরমুজ–খরবুজা, কাজু, কাঁটাল, সবেদা, সুপারী, পান ও কলার চাষ খুব ভালভাবেই করা যাবে।

মেদিনীপুর জেলার দক্ষিণ ও দক্ষিণ–পূর্ব অংশের মাটি লবণযুক্ত। তাই এই অঞ্চলে প্রচুর নারকেল জন্মায়। একই কারণে কাঁথির সমুদ্র উপকূলে ও পার্শ্ববর্তী এলাকায় উষ্চমানের নারকেল উৎপন্ন হতে পারে। কেরালার অধিক ফলনশীল (high breed) নারকেল গাছ লাগিয়ে মাত্র পাঁচ বছরের মধ্যেই গাছে নারকেল ধরতে শুরু করবে। নারকেল পাতাকে জ্বালানী হিসেৰে ব্যবহার করা চলৰে, পাতার শলাকে ঝাড়ু শিল্প গড়ে তুলতে কাজে লাগানো যাবে, নারকেল তেল উৎপাদনের কারখানা গড়ে তোলা যাৰে। মাথায় ও রন্ধন কাজে ব্যবহারের

জন্যে অনেকগুলি নারকেল তেল উৎপাদন কারখানা ক্ষুদ্র আকারে গড়ে তুলতে পারলে, সমগ্র পশ্চিমবঙ্গ ও উত্তর–পূর্ব ভারতের রাজ্যগুলিতেও এই তেল ভাল বাজার পাবে।

নারকোলের মালা দিয়ে অনেক ধরণের সুন্দর সুন্দর বাহারী কারুশিল্প গড়ে তোলা সম্ভব হবে। তাতে গ্রামে গ্রামে কুটির শিল্প গড়ে ওঠার নোতুন সুযোগ সৃষ্টি হবে। নারকোলের জল বৈজ্ঞানিক উপায়ে কুতুবন্দী (বোতলে ভরে) পানীয় হিসেবে দূর দূর স্থানে বিক্রয়ের ব্যবস্থা করা যেতে পারে। নারকোলের শাঁস দিয়ে মিষ্টি তৈরী হতে পারবে, নারকেল গাছের শুষ্ক গুঁড়ি গৃহনির্মাণের কাজেও ব্যবহার হতে পারবে। এককথায় কাঁথি এলাকায় যদি ব্যাপকভাবে নারকেল বাগান গড়ে তোলা যায় তবে এই ব্লকের মানুষদের অর্থনৈতিক অবস্থার বৈপ্লবিক পরিবর্তন ঘটানো সম্ভব হবে। শুকনো নারকেল ছোবড়া দিয়ে পাপোশ শিল্প, দড়ি শিল্প, গরমকালে জানালা–দরজায় ব্যবহারের জন্যে শীতল–পর্দা নির্মাণ শিল্পও গড়ে তোলা যাবে। শুকনো নারকেল আয়ুর্বেদ চিকিৎসায় ওষুধরূপে ব্যবহৃত হয়। নারকেল গুড়ের বিরাট বাজার রয়েছে বাঙলা ও ভারতে। তাতেও প্রচুর অর্থ উপার্জন করতে পারবে এলাকার লোকেরা।

কাঁথি, দীঘা ও ওই এলাকায় সমুদ্রতট রীতিমত প্রশস্ত। তাই সমুদ্রের ধারে পটোল, তরমুজ ও খরবুজার ভাল লাভজনক চাষ করা সম্ভব। জলে না ডুবে গেলে সমুদ্র তীরে বার মাসই পটোলের চাষ হতে পারে। তাতে স্থানীয় গরীব চাষীদের সৌভাগ্যের নোতুন দ্বার উন্মোচিত হবে। এছাড়া তরমুজ ও খরবুজার চাষও এই এলাকায় ব্যাপকভাবে হতে পারে। ভারতের মত গ্রীষ্মপ্রধান দেশে এদের চাহিদা রয়েছে প্রচুর। এগুলি জনপ্রিয় অর্থকরী ফসল।

বাংলা ভাষায় কাজু বাদামকে ৰলে হিল্লী বাদাম। ভারতে ও ভারতের বাইরে কাজু বাদাম অতি লাভজনক অর্থকরী ফসলরূপে বিবেচিত হয়। কাঁথি অববাহিকা এলাকায় মৃত্তিকা ও আবহাওয়া কাজু বাদাম উৎপাদনের পক্ষে উপযোগী। বিজ্ঞানের প্রয়োগ করে আধুনিক উপায়ে ওই অঞ্চলে কাজু বাদামের চাষ বহুলাংশে বৃদ্ধি করা যাবে। কাজু বাদামকে ভেজে, কাঁচা বা প্যাকিং করে অথবা কাজু বাদামের গুঁড়ো মিশিয়ে মিষ্টি তৈরী করে বাজারে বিক্রি করলে ও কাজুর নানারকম অর্থকরী ব্যবহারের ব্যবস্থা করলে গ্রামের লোকেরা অর্থ উপার্জনের বেশ ভাল উপায় খুঁজে পাৰে।

সূচীপত্র

কাঁটাল বা কন্টকীফলের মধ্যেও লুকিয়ে আছে অনেক সম্ভাবনা। গ্রাম ৰাঙলার মানুষেরা কাঁচা অবস্থায় ইঁচড়ের তরকারী খেয়ে শরীরের পুষ্টিসাধন করতে পারবেন। পাকা কাঁটালের রসও টিনজাত করে বিক্রি করা যাবে। কাঁটালের বিচি শুকিয়ে আলুর বিকল্পরূপে ব্যবহৃত হতে পারে। ভারত তথা ৰাঙলায় আলুর ব্যবহার শুরু হয়েছে মাত্র কয়েকশ' বছর আগে। তার আগে সব্জি বা তরকারীতেও ৰাঙলার মায়েরা কাঁটালের বিচি ব্যবহার করতেন ব্যাপকভাবে। পাকা কাঁটালের রস ও বিচির খাদ্যমূল্য খুবই বেশী।

কাঁথি অববাহিকার জমি ও আবহাওয়া সবেদা ফল উৎপাদনের পক্ষেও খুব উপযোগী। সমুদ্রের লোনা হাওয়া যতদূর যায় ততদূর পর্যন্ত এই ফল ভাল করে ফলবে। তার চেয়ে বেশী দূরে গেলে আর তত উৎকৃষ্ট মানের সবেদা ফল উৎপন্ন হবে না। সবেদা একটা অতিপ্রিয়, উপাদেয় ও স্বাস্থ্যকর অর্থকরী ফসল।

কাঁথি অঞ্চলে প্রচুর সুপারী, পান ও কলাও উৎপন্ন হতে পারে। এই তিনটি ফসলই অর্থকরী ও মুনাফাদায়ক।

পৃথিবীর সর্ববৃহৎ সাগর সৈকত

দীঘার সাগর সৈকত পৃথিবীর মধ্যে সর্ববৃহৎ। কোথাও কোথাও এই সৈকত দু'মাইল বিস্তৃত। দীঘার উপকূল ধরে কাঁথি এলাকায় বনসৃষ্টি করার সঙ্গে সঙ্গে যদি পাকা রাস্তা ও রেল লাইন সৈকতের পাশ দিয়ে নির্মাণ করে দেওয়া যায়, তবে ভারত তথা ৰাঙলার ভ্রমণবিলাসী মানুষেরা দীঘাকে আকর্ষণীয় ভ্রমণকেন্দ্র রূপে বেছে নেবে। সমুদ্র সৈকতের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য উপভোগ করার জন্যে অন্য প্রদেশ থেকেও তখন দীঘাতে লোক বেড়াতে আসতে পারবে। ভাল হোটেল, পানীয় জলের সুব্যবস্থা, দাঁতন থেকে দীঘা অবধি রেলপথ নির্মাণ, সাংস্কৃতিক কেন্দ্র স্থাপন ইত্যাদি হলে দীঘা এক জনপ্রিয় ও আকর্ষণীয় সৈকতাবাস হয়ে উঠৰে। তার ফলে এই অঞ্চলের মানুষের আর্থিক দুরবস্থা বহুলাংশে দূরীভূত হবে। নোতুন নোতুন দোকান, হাট–বাজার

তরি-তরকারির চাহিদা ও পরিবহন ব্যবস্থা ব্যাপক কর্ম সংস্থানের সুযোগ গড়ে তুলবে।

নোতুন বন্দর

দীঘা থেকে কিছু দূরে যেখানে সুবর্ণরেখা নদী বঙ্গোপসাগরে মিলিত হচ্ছে, সেই সঙ্গম মুখে ভাল বন্দর গড়ে উঠতে পারে। হলদিয়া বন্দরের ভবিষ্যৎ খুব ভাল নয়। তাই সুবর্ণরেখা-ৰঙ্গোপসাগরের মোহনায় যদি নোতুন বন্দর গড়ে তোলা যায় তবে পশ্চিমবঙ্গের মানচিত্রে আরও একটা ৰাণিজ্য কেন্দ্র স্থান পাৰে। কলকাতা বন্দর ও হলদিয়া বন্দর দিয়ে যে সব জিনিস আমদানি-রপ্তানি হয়, সেগুলো এই বন্দর দিয়ে তো যাবেই, এছাড়া এই অঞ্চলের কৃষিপণ্য, নারকেল, পান-সুপারি, কলা, তরমুজ, পটোল ইত্যাদি রপ্তানি করা যাবে। এই বন্দর নির্মিত হলে কাঁথি অববাহিকার নোতুন নোতুন রপ্তানি শিল্প-কারখানাও গড়ে তোলা যাবে। কাঁথির মানুষ আর চাকুরীর খোঁজে কলকাতা, দুর্গাপুর, টাটা বা মুম্বাইতে দৌড়োদৌড়ি করবে না।

গোটা কাঁথি অববাহিকায় তথা মেদিনীপুর জেলার দক্ষিণাংশে এক অর্থনৈতিক বিপ্লব ঘটে যাবে।

হাওড়া-দাঁতন-দীঘা রেলওয়ে

কাঁথি মহকুমায় কোনও লেরপথ নেই।*

• লেখাটি রচনার সময় ওখানে কোন রেলপথ ছিল না। কিন্তু বর্তমানে তা হয়েছে।-সম্পাদক।

এই অঞ্চলের দ্রুত বিকাশের জন্যে দাঁতন থেকে দীঘা অবধি রেলপথ নির্মাণ করতেই হবে। এর ফলে কলকাতা থেকে যাত্রীরা সরাসরি দীঘা পৌঁছুতে পারবেন। এই রেললাইন বসলে কাঁথি অববাহিকার উন্নয়ন পরিকল্পনা দ্রুত বাস্তবায়িত হতে শুরু করবে। স্থানীয় অঞ্চলে শিল্প বিস্তার ও ব্যবসা-বাণিজ্যেরও প্রসার ঘটবে। দাঁতন-দীঘা রেলপথই হবে কাঁথি মহকুমার lifeline। এছাড়া কাঁথি শহর থেকে দীঘা হয়ে সমুদ্র উপকূলের পাশ দিয়ে হলদিয়া পর্যন্ত রেললাইন বসালে, এই অঞ্চলের ব্যবসা-বাণিজ্য ও শিল্পের দ্রুত অগ্রগতি ঘটৰে ও ভ্রমণকারীদের পক্ষে ও সমুদ্র উপকূলবর্তী এই অঞ্চল এক আকর্ষণীয় রেল ভ্রমণের স্থানরূপে পরিণত হৰে।

সূচীপত্র

কাঁথির মৃতপ্রায় দু'টি শিল্প

ভাবতে দুঃখ হয় এত সম্পদ ও সম্ভাবনাময় কাঁথি এলাকায় মাদুর ও তাঁত শিল্প ছাড়া অন্য কোনও শিল্পই গড়ে ওঠেনি। এই দু'টি শিল্পও বর্তমানে মৃতপ্রায় ও ধ্বংসের মুখে। কাঁথি এলাকাকে অর্থনৈতিক দিক থেকে গড়ে তোলার ব্যাপারে বিভিন্ন কর্তৃপক্ষ গত ৪০ বছর ধরে চরম উপেক্ষা ও অদূরদর্শিতার পরিচয় দিয়েছে। এই এলাকার মাদুর শিল্প ও তাঁত শিল্প এখন পুঁজির অভাবে ধুঁকছে। কম সুদে ঋণ দিয়ে, মাদুর-শিল্পীদের সমবায় প্রথায় উৎপাদনে উৎসাহ দিয়ে, এদের উৎপন্ন দ্রব্যকে সর্বভারতীয় বাজারে বিক্রি করার ব্যবস্থা করলে ও গরম-উষ্ণ আবহাওয়া সম্পন্ন আরব দেশগুলোতে মাদুর রপ্তানী করার ব্যবস্থা করলে, স্থানীয় গরীব মাদুর শিল্পীরা প্রচুর অর্থ উপার্জন করতে পারবেন। বাঙলার ৯০% মাদুর মেদিনীপুর জেলাতে উৎপন্ন হয়।

অনুরূপভাবে কাঁথি অঞ্চলের তাঁতীদের হাতে চালানো সেকেলে তাঁতের (handloom) বদলে বিদ্যুৎ-চালিত আধুনিক তাঁতের ব্যবহার করার শিক্ষা দিতে হবে। তবেই এই অঞ্চলের তাঁতীরা দ্রুত উৎপাদন করে আধুনিক ৰড় বড় বস্ত্র কারখানার সঙ্গে প্রতিযোগিতায় টিকে থাকতে পারবে। তাঁতীদের সমবায় উৎপাদন কেন্দ্র গড়ে তোলবার জন্যে সরকারের উচিত ছিল ব্যবস্থা গ্রহণ করা। কিন্তু এই ব্যাপারেও এই অঞ্চলে কিছুই করা হয়নি। কেবল অতি উচ্চমানের সূক্ষ্ম কারুকার্যখচিত বিশেষ ধরণের বস্ত্র নির্মাণের ক্ষেত্রেই হস্তচালিত তাঁত ব্যবহার করা যেতে পারে। এছাড়া তাঁত শিল্পকে আধুনিক রুচি ও চাহিদা অনুযায়ী, তার উৎপাদিত সামগ্রীর মানকেও বজায় রাখতে হবে।

কাঁথি এলাকার তাঁতি পরিবার ও মাদুর শিল্পে নিযুক্ত মানুষদের সংঘবদ্ধ করে এই দুই শিল্পের আধুনিকীকরণ ও উন্নতি ঘটাতে পারলে হাজার হাজার মানুষের অর্থনৈতিক অবস্থা ভাল করে তোলা সম্ভব।

কাঁথি অঞ্চলের জেলেদের অর্থ উপার্জনের একটা বড় উপায় হ'ল শুঁটকি মাছ। তারা শুঁটকি মাছ তৈরী করে বাজারে চালান দেয়। মাছকে শুকোতে গিয়ে মাছের দেহ পচে যায় ও বাতাসে অসহ্য দুর্গন্ধ ছড়ায়। এতে পরিবেশ তো দূষিত হয়ই। এর প্রতিক্রিয়া স্বরূপ অরাতি অণু জীবতেরা (Negative Microvita) এই অঞ্চলের সমুদ্র তীরবর্তী স্থানগুলোকে আক্রমণ করে। জনস্বাস্থ্য ও জনকল্যাণের পক্ষে এই ব্যবস্থা মোটেই সমর্থনযোগ্য নয়। আধুনিক বিজ্ঞানের সাহায্যে যন্ত্রপাতি প্রয়োগ করে মাছকে dehydration plant-এ শুকিয়ে নিতে হবে। তাতে বাতাসে আর দুর্গন্ধ ছড়াবে না। এই ব্যাপারে সরকার বা সমবায় সমিতিকে এগিয়ে আসতে হবে ওই ধরণের কারখানা বসানোর জন্যে। তবে মানস–অর্থনৈতিক (psycho-economy) তত্ত্ব অনুযায়ী এই ধরণের ক্ষতিকারক তামসিক খাদ্য উৎপাদনকে প্রোৎসাহন দেওয়া চলবে না। কিন্তু মানুষের দীর্ঘ দিনের অভ্যাস ও মনস্তত্ত্বের কথা ভেবে ও জেলেদের বিকল্প রোজগারের ব্যবস্থা না করা পর্যন্ত, এই ধরণের মাছ বিক্রীর ব্যবস্থাকে হঠাৎ করে ৰন্ধ করা উচিত হবে না। তবে জনস্বাস্থ্য ও পরিবেশ দূষণের কথা চিন্তা করে যত দ্রুত সম্ভব এই ধরণের দুর্গন্ধযুক্ত মাছ বিক্রীর ব্যবসা উঠিয়ে দেওয়াই সমীচীন হবে।

জুন ১৯৮৮, কলকাতা

বাঙলার জন্যে উপযোগী কয়েকটি উন্নয়ন কার্যক্রম

এবার দীঘার কথা বলা যাক। পূর্বে দীঘার নাম ছিল দীর্ঘকা–'দীর্ঘ' মান 'লম্বায় বড়' আর 'ক'–এর অর্থ 'ভূমি'। এইভাবেই হয়েছে আজকের দীঘা। দীঘার নিকটে যে রামনগর আছে তার নামকরণ হয়েছে মেদিনীপুর জেলার শেষ মহারাজা রামনারায়ণ হাতার নামানুসারে। তখন জেলার রাজধানী ছিল কাঁথি। রামনগর একবার প্রচণ্ড ঝড়ের কবলে পড়েছিল, তখন ব্রিটিশরা জেলার মুখ্যালয় কাঁথিতে স্থানান্তরিত করেছিল। কিন্তু তারা কাঁথির নাম পাল্টে করল কন্টাই কেননা প্রায় কাছাকাছি নামের আর একটি জেলার মুখ্যালয়ের নাম ছিল (কান্দি)। দীঘা–সহ চারিপাশের এলাকা ছিল প্রধানতঃ বৌদ্ধমতাবলম্বী।

দীঘার সমুদ্রতট পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে চওড়া। সমগ্র দীঘা অঞ্চল জুড়ে সমুদ্র উপকূল বরাবর সামুদ্রিক ঝাউ ইত্যাদি লাগিয়ে বৃহৎভাবে বনসর্জন করতে হবে। যার ফলে সামুদ্রিক

ঝড় আটকানো সম্ভব হবে। সেটা হলে দীঘা অঞ্চলে নানা ধরণের গাছ লাগানো যাবে। এখানে নারকেল তো খুব ভালই জন্মায়। তুমি যদি গাড়ি করে দীঘার সমুদ্র তীরবর্তী রাস্তা ধরে পাঁচ মাইল যাও তাতে দেখবে কিছু বনাঞ্চল আছে। অবশ্য সমুদ্রের আগ্রাসনকে ঠেকানোর জন্যে দীঘার সমুদ্রতটে সেরকমভাবে পাথরের দেওয়াল তৈরী করা হয়নি। আনুমানিক প্রতি সাত বছরে একবার বিশাল ঝড় এসে গাছ-পালাকে ধুয়ে নিয়ে চলে যায়, যার ফলে গাছ বেশী বড় হবার সুযোগই পায় না। যদি প্রতি বছর নিয়মিতভাবে আর ব্যাপকভাবে তট বরাবর গাছ লাগানো হতে না থাকে আর পাথরের দেওয়াল ঠিকভাবে তৈরী করা না হয়, তাহলে ভূমিক্ষয় আরও বেড়ে চলবে, আর ঝড়ের তীব্রতা রুখবার কোনো উপায়ই থাকবে না।

ট্রেন লাইনকে নিয়ে যেতে হবে একেবারে ভোগরাই পর্যন্ত যেখানে সুবর্ণরেখা নদী সমুদ্রে পড়ছে। বর্তমানে ভোগরাই ওড়িষ্যার অন্তর্ভুক্ত। সেই স্থানে বা দীঘার অন্য সুবিধাজনক স্থানে বন্দর গড়ে তুলতে হবে যা দিয়ে নারকেল, মাছ, পান, সুপারি, উঁচু মানের কাজুবাদাম ইত্যাদি রপ্তানি করা যাবে। এর

ফলে এই অঞ্চলের সামাজিক- অর্থনৈতিক উন্নয়ন দ্রুততর হবে। ভ্রমণকারীদের কাছে আকর্ষণীয় করার জন্যে দীঘার সমুদ্রতট বরাবর মেরিন ড্রাইভ তৈরী করতে হবে আর এর উপযুক্ত সৌন্দর্যায়ন করতে হবে।

কণিকায় প্রাউট

একবিংশ খণ্ড

ইতিহাস ও অন্ধবিশ্বাস

সূচীপত্র

এটা হ'ল রেনেসাঁ ইয়ুনিবার্সালের সম্মেলন। আজ আমাদের আলোচ্য বিষয়, "ইতিহাস ও অন্ধবিশ্বাস।"

প্রথমেই তোমাদের আমি বলতে চাই, ইংরাজির 'হিষ্টরি' আর সংস্কৃতের 'ইতিহাস' শব্দ দু'টি সমার্থক নয়। অতীতের ঘটনার কালানুক্রমিক বিবরণী যাকে ইংরাজিতে 'হিষ্টরি' বলা হয়, সংস্কৃতে তাকে বলা উচিৎ 'ইতিবৃত্ত', 'ইতিকথা', 'পুরাবৃত্ত' বা 'পুরাকথা'। যে 'ইতিবৃত্তে' বা 'হিষ্টরি'তে শিক্ষাগত মূল্য আছে তাকে আমরা ইতিহাস ৰলৰ। ইতিহাসকে এইভাবে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে,

ধর্মার্থকামমোক্ষার্থং নীতিবাক্যসমন্বিতম্।
পুরাবৃত্ত কথাযুক্তম্ ইতিহাসঃ প্রচক্ষতে।।

সূচীপত্র

"যে প্রকারের পুরাবৃত্ত, ভৌতিক চাহিদা, মানসিক আকাঙ্ক্ষা, মানস–আধ্যাত্মিক ও আধ্যাত্মিক বাসনাকে চরিতার্থ করতে পারে ও একই সঙ্গে নীতিবাক্য সমন্বিত, তাকে ইতিহাস বলা উচিত?।”

এই সংজ্ঞা অনুসারে 'মহাভারত'কে অবশ্যই ইতিহাস বলা যেতে পারে। যারা এটাকে শুধুমাত্র মহাকাব্য বা শিক্ষণীয় গল্প বলে মনে করে তাদের সঙ্গে আমি সহমত নই। তাহলে তোমরা এখন বুঝতে পারছ "The history of India" নামে যে বইটা সাধারণতঃ স্কুল কলেজে পড়ান হয়ে থাকে তাকে 'ভারতবর্ষের ইতিহাস' না বলে 'ভারতের ইতিকথা' বলা উচিত।

যে বই ইতিহাসের প্রসঙ্গ ছাড়া শুধুমাত্র নীতিশিক্ষা দিয়ে থাকে তাকে 'পুরাণ' বলা হয়। এই রকমের বই আমাদের ঐতিহাসিক ঘটনা নির্ধারণ করতে সাহায্য করে না। প্রকৃতপক্ষে তাদের অতিরঞ্জিত ও কল্পিত কাহিনী পাঠকের মনে বিভ্রান্তির সৃষ্টি করে। উদাহরণস্বরূপ আমরা রামায়ণের কথা উল্লেখ করতে পারি। শিক্ষণীয় মূল্য অত্যন্ত মহৎ হওয়া সত্ত্বেও রামায়ণ ইতিহাস বা ইতিকথা নয়। এটি একটি পুরাণ। রামায়ণের সমস্ত

চরিত্রই কল্পিত। রামায়ণে বর্ণিত উড়ন্ত যান পুস্পক রথ, মানুষের মনে ভ্রান্তধারণার সৃষ্টি করতে পারে যে রামায়ণের যুগে ভারতবর্ষের লোকেরা এরোপ্লেন তৈরী করতে জানত। আমাদের পূর্বপুরুষদের সম্পর্কে এইরকম লিখিত তথ্য পড়লে লোকে ইতিহাসকে ভুল বুঝবে আর অবাস্তবকে বাস্তব মনে করে মিথ্যা বিশ্বাসের দিকে পরিচালিত হ'বে আর এইভাবে অন্ধবিশ্বাসের শিকার হবে। এটা শুধুমাত্র রামায়ণ বা অন্যান্য বিখ্যাত পুরাণ–কথার সমস্যা নয়, অনেক প্রাচীন কাহিনী ও উপন্যাসকে ভুল করে ইতিহাস ৰলে গণ্য করা হয় ফলে অন্ধবিশ্বাসের বীজ সমসাময়িক পাঠকের মনের গভীরে প্রবেশ করে।

মানুষের মনে অন্ধবিশ্বাসের শিকড় জন্মাবার অনেক কারণ আছে। এই কারণগুলিকে অনেক শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়; যেমন ইতিহাস সম্পর্কে অজ্ঞতা, বিজ্ঞান সম্পর্কে অজ্ঞতা, বিচারবুদ্ধিহীন আসক্তি জনিত কুসংস্কার, আর অন্ধবিশ্বাস যা অভ্যাসে পরিণত হয়ে গেছে। ইতিহাস সম্পর্কে অজ্ঞতার কারণে যে অন্ধবিশ্বাস জন্মায় আমরা আজ সেটাই বিশ্লেষণ করৰ।

প্রথমেই জাতিভেদ প্রথা নিয়ে আলোচনা করা যাক। এটা অনস্বীকার্য বা অকাট্য সত্য যে সৃষ্টির উষাকালে পৃথিবীতে মানুষের বসতি ছিল না। ভূমাচক্রের কেন্দ্রানুগা শক্তি তথা প্রতিসঞ্চয় ধারায় পঞ্চভূত তত্ত্ব থেকে প্রথমে উদ্ভিদ তারপরে অনুন্নত প্রাণী ও সবশেষে মানুষ উদ্ভূত হয়। ইতিহাসের অধ্যয়ন আমাদের শিখিয়েছে যে প্রায় দশ লক্ষ বছর পূর্বে সেই সময়কার বনমানুষের সমতুল্য একশ্রেণীর আধা মানব পৃথিবীতে উদ্ভূত হয়েছিল। এই আধা-মানবরা ছিল লাঙ্গুলবিহীন বনমানুষ... মানুষের প্রথম দিকের পূর্বপুরুষ (গরিলা, শিম্পাঞ্জী, ওরাং-ওটাং ইত্যাদি)। মানব জাতির উৎপত্তি অধ্যয়ন করে ও মানুষের প্রাচীনতম পূর্বপুরুষদের খুঁজে বার করার পর প্রতিটি শিক্ষিত মানুষকে স্বীকার করতেই হ'ৰে, সমস্ত মানুষই এই আধা-মানব গোষ্ঠী থেকে এসেছে। তর্কসঙ্গত ভাবে মানুষের কোন গোষ্ঠীই দাবী করতে পারবে না যে তাদের পূর্বপুরুষেরা অন্যদের পূর্বপুরুষ থেকে উন্নত ছিল। প্রতিটি বুদ্ধিমান মানুষকে স্বীকার করতেই হ'ৰে জাতিভেদ প্রথা মনুষ্য সৃষ্ট, ঈশ্বর দত্ত নয়। যেহেতু মানুষ বনমানুষ থেকে সৃজিত হয়েছে তাই সবার জাতি এক। ব্রাহ্মণদের পূর্বপুরুষ ব্রাহ্মণ বাঁদর ছিল আর কায়স্থদের পূর্বপুরুষ কী কায়স্থ বাঁদর

ছিল? এই রকম হাস্যকর ধারনা ঐতিহাসিকদের মজার খোরাক হ'বে। প্রকৃতপক্ষে কথার মারপ্যাঁচে বা বুদ্ধির লড়াইতে অপরকে হারিয়ে প্রাচীনযুগের যে মানুষেরা নিজেদের উচ্চজাতিতে প্রতিষ্ঠিত করেছিল আজ তাদের বংশধরেরা সেটাকে তাদের পৈত্রিক বংশ বলে দাবী করে। একই সঙ্গে অপেক্ষাকৃত অল্প বুদ্ধির লোকেদের নিচু জাতের, এমন মানতে বাধ্য করা হয়েছিল।

অনেকেই আজ রক্তের শুচিতা নিয়ে কথা বলেন। এই বিষয় নিয়েও আলোচনা করা যাক। রক্তের বিশুদ্ধতা বলতে যদি কেউ শুদ্ধ আর্য রক্তের কথা বলেন, তবে জিজ্ঞাসা করৰ, যে- আর্যরা মধ্য এশিয়া ও আর্কটিক অঞ্চল থেকে ভারতে অভিপ্রয়ান করেছিল, তাদের রক্তে কী অনার্য রক্তের মিশ্রণ হয় নি? নিশ্চয়ই আর্য ও অনার্যদের মধ্যে রক্তের বিমিশ্রণ হয়েছিল। আর সেই কারণেই তারা যে রাস্তা ধরে ভারতে প্রবেশ করেছে সেই অনুসারে ধীরে ধীরে তাদের ত্বকের রঙ সাদা থেকে কালো অথবা পীতাভতে পরিবর্তিত হয়েছে। আর্য-অনার্যের রক্তের সংমিশ্রণের কারণে আমরা ভারতবর্ষে কালো ত্বকের ব্রাহ্মণ ও সাদা ত্বকের শূদ্র দেখতে পাই।

সূচীপত্র

কিছু কিছু লোক জাতিপ্রথা সম্পর্কে ইতিহাসের বই উল্লেখ করে জাতি প্রথাকে সমর্থন করেন। বিভিন্ন জাতি সম্পর্কে অনেক ঐতিহাসিক পুঁথি দুরুহ সংস্কৃত ভাষায় লেখা হয়েছে বটে কিন্তু একটা মৌলিক ত্রুটি আপাতদৃষ্টিতে প্রতীয়মান। আমরা যদি এই পুঁথিগুলির শ্লোকগুলিকে বিশ্বাস করি তবে সেটা আমাদের এই বিশ্বাস করতে শেখাবে যে একটি জাতি পরমপুরুষের মুখ থেকে, আর এক জাতি তাঁর হাত থেকে, আর এক জাতি তাঁর দেহের মধ্যভাগ থেকে ও আর এক জাতি তাঁর চরণদ্বয় থেকে উদ্ভূত হয়েছে। যারা নেশাগ্রস্থ তারাই কেবল এই রকম শাস্ত্রকে প্রামাণিক ৰলে বিশ্বাস করবে! স্পষ্টতঃ কোন মানুষই মুখ থেকে জন্মাতে পারে না। যদিও দার্শনিকভাবে স্বীকার করা হয়েছে যে এই প্রপঞ্চময় মহাবিশ্ব এক বিশাল নিরাকার ব্রহ্মদেহ থেকে সৃষ্ট কিন্তু এটা কল্পনা করা নেহাতই মূর্খামি যে ব্রহ্মহ্মদেহের মুখ, হাত, উরু, পা আছে আর তাই থেকে উঁচুনিচু বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন বিভিন্ন জাতির সৃষ্টি হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে ঋগ্বেদের এই শ্লোকটি যা নেহাৎই একটি প্রক্ষিপ্ত অংশ, জাতিপ্রথার ত্রুটিপূর্ণ ধারনাকে বাঁচিয়ে রাখার

জন্যে ব্যবহৃত হয়েছে। অধিকন্তু এই শ্লোকের প্রকৃত অর্থ এর থেকে ভিন্ন।

ব্রাহ্মণোহস্য মুখমাসীৎ বাহু রাজন্যোভবৎ।
মধ্য তদস্য যদ্বৈশ্যঃ পদভ্যাম্ শূদ্রো অজায়ত।

পরমসত্তার মুখ হতে ব্রাহ্মণ, বাহু হতে ক্ষত্রিয়, উরু হতে বৈশ্য ও পা থেকে শূদ্রের উৎপত্তি।

প্রকৃতপক্ষে এখানে "ব্রাহ্মণের" অর্থ যারা "সত্ত্বগুণী" ও "বুদ্ধিজীবী স্বভাবের”। রূপকের সাহায্যে বোঝান হয়েছে বুদ্ধিজীবিরা পরমসত্তার মুখের প্রতীকস্বরূপ। যোদ্ধারা (রজোগুণী) বীরবাহু তুল্য, পুঁজিবাদী বণিক–ব্যবসায়ীগণ ভূমাদেহের মধ্যভাগ সদৃশ আর শ্রমিকবর্গ চরণযুগলের প্রতীকস্বরূপ। এটাই হ'ল শ্লোকের যথার্থ ব্যাখ্যা।

জাতিভেদ প্রথার মধ্যে ইতিহাসেও হাজার রকমের অসঙ্গতি সহজেই ধরা পড়ে। উদাহরণস্বরূপ, জাতিপ্রথা যদি দৃঢ়ভাবে

মানা হয় তবে মানতে হবে ইতিহাস অনুসারে মাত্র দশ শ্রেণীর ব্রাহ্মণ ছিল; পাঁচজন উত্তর ভারতের থেকে আর পাঁচজন দক্ষিণ ভারতের। ব্রাহ্মণদের অন্যান্য গোষ্ঠী যারা এই দশ শ্রেণীর মধ্যে আসে না তাদের অব্রাহ্মণ বলে গণ্য করা হবে। এছাড়া বিভিন্ন জাতির ইতিহাসে ব্যাপক রূপে নিয়োগ প্রথার (নিজের স্ত্রী ব্যতিরেকে অন্য স্ত্রীর গর্ভে সন্তানের পিতা হওয়া) উল্লেখ পাওয়া যায়, যার ফলে ব্যাপক বিমিশ্রতা ঘটেছিল। অধিকন্তু বৌদ্ধযুগে জাতিপ্রথার কড়াকড়ি শিথিল হয়ে গিয়েছিল আর বিভিন্ন জাতির সংমিশ্রণ খুব সাধারণ হয়ে গেছিল। যে সব অঞ্চলে গোঁড়া লোকেরা জাতপাতের নিয়মকে কঠোরভাবে অনুসরণ করার চেষ্টা করেছিল সেখানে নোতুন নোতুন জাতি ও উপজাতি গঠিত হয়েছিল।

তোমাদের আমি একটা গল্প বলি যা জাতপাতের ইতিহাসের পরস্পরবিরোধী প্রকৃতিকে তুলে ধরবে। বাঙলার ব্রাহ্মণদের বর্ণ ইতিহাসে উল্লেখ করা হয়েছে রাজা জয়ন্ত শূর কান্যকুব্জ থেকে পাঁচজন নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণকে বাঙলাদেশে নিয়ে এসেছিলেন। এই পাঁচজন ব্রাহ্মণকে রাঢ় ও বরেন্দ্রভূমির লক্ষাধিক ব্রাহ্মণদের পূর্বসুরি বলা হয়। (এই পঞ্চ ব্রাহ্মণ প্রত্যেকেই কী প্রচুর

সংখ্যক ৰাঙ্গালী মহিলাকে বিবাহ করেছিল? না হ'লে তাদের এত বেশী উত্তরপুরুষ কী ভাবে হয়েছিল?) এটাও বলা হয়েছে ওই ব্রাহ্মণদের সঙ্গে পাঁচজন শূদ্র তাদের পরিচারক হিসেৰে এসেছিল আর তারাই ৰাঙলার কায়স্থদের পূর্বপুরুষ। এবারে কায়স্থদের বর্ণ ইতিহাসে উল্লেখ করা হয়েছে, রাজা জয়ন্ত শুর কান্যকুব্জ থেকে পাঁচজন যোদ্ধাকে নিয়ে এসেছিল আর তারাই রাঢ় আর বরেন্দ্রভূমির কায়স্থদের পূর্বপুরুষ। এই কায়স্থরা সকলেই যোদ্ধা ছিল আর চামড়ার জুতা পরিধান করে ঘোড়ার পিঠে চড়ে এসেছিল। যোদ্ধা হিসেৰে দক্ষ হলেও তারা রান্না করতে জানত না, তাই পাঁচজন পাচক তাদের সঙ্গে নিয়ে এসেছিল। এই পাচকরাই ছিল রাঢ় ও বরেন্দ্রভূমির ব্রাহ্মণদের পূর্বপুরুষ। স্পষ্টতঃ প্রশ্ন ওঠে এই সব বর্ণ ইতিহাস কী বিশ্বাস যোগ্য?

কায়স্থদের বর্ণ ইতিহাস অনুসারে বাঙলার কায়স্থদের প্রথম পিতৃপুরুষ হলেন চিত্রগুপ্ত (চার পাঁচটি গোষ্ঠী ছাড়া সব কায়স্থরাই চিত্রগুপ্তকে প্রথম পিতৃপুরুষ ৰলে মেনে থাকে)। মজার ব্যাপার হ'ল চিত্রগুপ্ত হ'ল শুধুমাত্র এক কাল্পনিক চরিত্র। তিনি ব্রহ্মের পৌরাণিক পুত্র। বর্ণ ইতিহাসে বলা হয়েছে চিত্রগুপ্তর

বারটি পুত্র ছিল। চারু, সুচারু, চিত্রচারু, অরুণ, যতীন্দ্র, হিমবান, মতিমান, ভানু, বিভানু, বিশ্বভানু আর বীর্যভানু। এই বার জন পুত্র থেকে বার ঘর কায়স্থরা এল–অন্বষ্ঠ, শ্রীবাস্তব, ভট্টনাগর, মাথুর, সাক্সেনা, গঁদ, সূর্যধ্বজ, বাল্মীকি, কুলশ্রেষ্ঠ, আস্থানা, নিগম আর করণ। কিন্তু মজার বিষয় হ'ল এই বারঘর কায়স্থদের দু'টো করে হাত আছে আর তাদের পিতৃদেবের চারটি হাত দেখান হয়েছে। চার হাতে ধরে আছেন, বজ্র, গদা, লেখনী ও কালির দোয়াত। যদিও চিত্রগুপ্তকে মানুষ বলে ধরা হয় কিন্তু তিনি ছিলেন এক অদৃশ্য রাজত্বের অভিলেখপাল। চিত্রগুপ্তের কাহিনী বিশ্বাসযোগ্য কিনা তা আমি তোমাদের ওপর ছেড়ে দিলুম।

ভারতবর্ষের কিছু সম্প্রদায়ের মানুষ আছেন যারা প্রাচীন গালগল্প ও পুরাণকে খুব বেশী মাত্রায় গুরুত্ব দেন আর এ ব্যাপারে একটা অস্বাস্থ্যকর প্রবণতাও রয়েছে। তারা এমন করেন কারণ তারা ইতিহাস সম্বন্ধে অজ্ঞ। আমি শুনেছি যে এদেশের নাম ভারতবর্ষ হচ্ছে পুরাণের রাজা ভরতের নামে। কিন্তু আসল সত্যটা অন্য। রাজা ভরতের নামে ভারতবর্ষ হয়নি। নামের সঙ্গে সাযুজ্য থাকার জন্যে জনগণ বিভ্রান্ত

হয়েছিল। ব্যুৎপত্তি অনুযায়ী 'ভর' মানে হচ্ছে ভরণপোষণ করা। 'বর্ষ' অর্থ হচ্ছে বিস্তীর্ণ ভূমি। সুতরাং ভারতবর্ষ অর্থ সেই বিস্তীর্ণ ভূমি যা তার জনগণকে ভরণ-পোষণের ব্যবস্থা করে ও তাদের মানস-আধ্যাত্মিক বিকাশের পথ সুগম করে। যখন আর্যরা কষ্টকর পরিবেশ থেকে উর্বর ও প্রাচুর্যময় ভারতে প্রবেশ করলো তখন তারা সম্পদের প্রাচুর্য, স্বাস্থ্যকর পরিবেশ, সবুজ শষ্য ও প্রাকৃতিক সৌন্দর্য দেখে মোহিত হয়। তাই তারা এই ভূমির নাম দেয় ভারতবর্ষ।

আর্যদের একটা স্বভাব ছিল তারা বিভিন্ন ভূখণ্ডের বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী অথবা সেখানকার অধিবাসীদের চরিত্র ও বিশেষ স্বভাব অনুযায়ী ভূখণ্ডের একটা নামকরণ করতেন। উদাহরণস্বরূপ যে অংশে তাঁরা প্রথম আসেন সে অংশে দেখেছিলেন প্রচুর পরিমাণে শিলাখণ্ড। শিলাখণ্ডের রঙ জামের মত। উত্তর-পশ্চিম দিকের এই শিলাখণ্ডগুলি জামের মত বলে তাঁরা এই অঞ্চলের নাম দেন জম্বুদ্বীপ। এতদ অঞ্চলে দুটি বৃহৎ জলাশয় (Lake) থাকায় তারা এর নাম দেন 'দ্বিগর্ত্তভূমি'। গর্ত মানে লেক। যেহেতু উত্তরাংশে ঘন জনগোষ্ঠী থাকতেন বলে তাঁরা তার নাম দেন "খশমেরু”। মেরু মানে হচ্ছে দেশ অর্থাৎ

যেটা খশ জাতীয় মানুষদের দেশ। যাইহোক ভারতবর্ষের নিজস্ব গুণাবলী ও সম্পদের প্রাচুর্যের জন্যে তারা এর নাম দেন ভারতবর্ষ। পুরাণের রাজা ভরতের সঙ্গে এই নামের কোন সম্বন্ধ নেই।

কিছু সংখ্যক গোষ্ঠী মাথার পেছনে কবরী বন্ধন করে ও শরীরে আড়াআড়িভাবে উপবীত ধারণ করাকে গুরুত্ব দিতেন। তাদের বিশ্বাস ছিল ওই দু'টি প্রথা অনুসরণ না করলে মানুষ ধার্মিক হয় না। প্রাচীনকালে যাযাবর আর্যরা যখন ভারতবর্ষে অভিক্রমণ করে ও স্থায়ীভাবে প্রতিষ্ঠিত হয় তখন ইতোমধ্যে এই দেশে দ্রাবিড় ও অস্ট্রিক শ্রেণীর লোকেরা বসবাস করত। স্বাভাবিক ভাবেই আর্য ও অনার্যের মধ্যে জাতীয় সংমিশ্রণ হয়েছিল। অবশেষে এত বেশী মাত্রায় সামাজিক মিশ্রণ হয়েছিল যে বোঝা মুস্কিল হ'ত কারা আর্য সংস্কৃতির মূল ধারক ও বাহক আর কারা নয়। বৈদিক ধর্ম ও আর্য সংস্কৃতির ধারক ও বাহক হিসেৰে জনগণের মধ্যে নিজেদের আলাদা পরিচিতি দেবার জন্যে আর্যরা মাথার পেছনে টিকি রাখতে শুরু করল। ইতোমধ্যে ভারতবর্ষে খুব বেশী পরিমাণে জাতীয় মিশ্রণ হয়ে যাওয়া সত্ত্বেও আর এই প্রথার অনুসারীদের অনেকেরই গায়ের

রঙ কালো হয়ে যাবার পরেও কবরীৰন্ধনের মাধ্যমে আর্যরা তাদের আর্য পরিচয় প্রচার করত। বাহ্যিক ক্রিয়াকলাপ ও ধর্মানুসরণের মধ্যে কীভাবে বিন্দুমাত্র সম্পর্ক থাকতে পারে?

উপবীত ধারণ করার প্রথা সম্পর্কে ৰলতে হয়, নিজের আধ্যাত্মিক প্রগতি ও তুলোর সুতো ধারণ করার মধ্যে কোন সম্পর্ক সূত্র খুঁজে বার করার জন্যে মাথা ঘামাবার দরকার নেই। ঘটনাটা হ'ল, আর্যরা ছিল মধ্য এশিয়ার উত্তরাংশ ও রাশিয়ার মূল অধিবাসী, তারা ছিলেনও খুব মদ্যপ্রেমী। বৈদিক যুগের আর্যরা যারা ভারতবর্ষে এসেছিল তারা রাশিয়ার অনেক প্রাচীন প্রথাকে অনুসরণ করত, যার কিছু কিছু আজকের রাশিয়াতেও দেখা যায়। বিজ্ঞানের উন্নয়নের পূর্বে সেই আদিমযুগে অন্যান্য অসংখ্য উপজাতি ও গোষ্ঠীর মত আর্যরাও মূলতঃ সর্বপ্রাণবাদী ছিল। বিভিন্ন প্রাকৃতিক শক্তিকে দৈবিক সত্তার বহিঃপ্রকাশ ৰলে তারা মনে করত আর তাদের সমস্ত সৌভাগ্য বা দুর্ভাগ্যকে ওই সব দেবদেবীর ক্রিয়া বলে মনে করত। প্রাকৃতিক বিপর্যয় থেকে নিজেদের রক্ষা করার জন্যে তারা মন্ত্রোচ্চারণ করত, নিজেদের প্রিয় খাদ্যদ্রব্য তাকে উৎসর্গ করত আর দেবদেবীকে প্রসন্ন করার জন্যে কাঠ জ্বালিয়ে যজ্ঞ

করত। এইভাবে যজ্ঞ ও হোমের উদ্ভব হয়েছিল আর এইভাবেই আর্যরা ঘি, পশুর মাংস, তাদের প্রিয় খাদ্য ইত্যাদি যজ্ঞাগ্নিতে আহুতি দিত। আকাশের মেঘের রঙ আর ধোঁয়ার রঙ এক রকম হওয়ার কারণে আর্যরা ভ্রান্ত চিন্তা করত যে যজ্ঞাগ্নির ধোঁয়া উঁচু আকাশে উঠে মেঘ হয়ে বর্ষা নামিয়ে আনৱে। আর্যদের ভ্রান্ত ধারণা ছিল যে, যে–ব্যধিগুলি দুর্গন্ধযুক্ত, নোংরা জায়গা থেকে জন্মায় ও ছড়ায় সেই গুলি যজ্ঞের আহুতির সুগন্ধিত ধোঁয়াতে নিবারণ করা যায়। সেই যুগে যখন বিজ্ঞান খুবই প্রারম্ভিক অবস্থায় ছিল অনুন্নত আর্যরা ভৌতিক লাভের আশায় এইসব যজ্ঞকর্মে ব্যাস্ত থাকত। দূর্ভাগ্যবশতঃ এখনও কিছু মানুষের দল আছে যারা মনে করে যজ্ঞাদি ক্রিয়াকর্ম না করলে ধর্মসাধনা অসম্পূর্ণ থাকৱে।

ব্রাহ্মণ পুরোহিতদের পাঁচটি শ্রেণী (হোতা, ঋত্বিক, উদগাতা, অধ্বর্যু ও ব্রাহ্মণ) যারা এই যজ্ঞক্রিয়া করত তাদের নিখুঁত স্থৈর্য ও অত্যন্ত মানসিক প্রশান্তি নিয়ে এই ধার্মিক দায়িত্ব পালন করতে হ'ত। আর্যরা আশা করত তাদের পুরোহিতরা এইরকমই আচরণই করবে। পুরোহিতরা এই যজ্ঞানুষ্ঠানের সময় মদ্যপান করা থেকে বা মাতালদের স্পষ্টতঃই সাবধানে এড়িয়ে চলত।

সূচীপত্র

মাতালদের দূরে রাখার জন্যে পার্থক্য চিহ্ন রূপে তারা একটুকরো মৃগচর্ম বাঁ-দিকের কাঁধে আড়াআড়ি ভাবে পরে থাকত। যেহেতু এই প্রতীক যজ্ঞের সময় ব্যবহার করা হ'ত তাই একে যজ্ঞোপবীত বলা হয়। যখন তারা তাদের মৃত পূর্বপুরুষদের উদ্দেশ্যে শ্রাদ্ধাদি ক্রিয়াকর্ম করত, তখন ওই একই প্রতীক ডানদিকের কাঁধে আড়াআড়ি ভাবে পরত। একে বলা হ'ত প্রাচীরবীত। যখন ওই প্রতীককে গলায় জড়িয়ে রাখা হ'ত তখন তাকে বলা হ'ত নিবীত। যেহেতু নারীরা যজ্ঞানুষ্ঠানের অধিকারী ছিলেন তাই মনে করা যেতে পারে তারাও যজ্ঞোপবীত ধারণ করতেন।

পরবর্তীকালে যখন হরিণের চর্ম কিছুটা মহার্ঘ হ'ল আর ভারতবর্ষের আর্যরা তুলোর ব্যবহারে পরিচিত হ'ল তখন মৃগচর্মের পরিবর্তে তুলোর সুতোর ব্যবহার করা শুরু হ'ল। আরও পরবর্তীকালে বাঁ কাঁধের ওপর সবসময় তুলোর সুতো পরা তাদের ধর্মীয় আচারের অংশ বিশেষ হয়ে গেল। প্রাচীন কালের আর্যদের মধ্যে যজ্ঞানুষ্ঠান বা যজ্ঞ উপবীতের গুরুত্ব যাই থাকুক না কেন, আজকের এই অপেক্ষাকৃত উন্নত বিজ্ঞানের যুগে যখন মানুষেরা তাদের বুদ্ধিমত্তা ও উন্নত

প্রযুক্তি ব্যবহার করে প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের সঙ্গে সংগ্রাম করছে, আর যখন দেব-দেবীকে প্রসন্ন করার জন্যে যজ্ঞাগ্নিতে ঘি ঢালতে হয় না তখন যজ্ঞ উপবীত ধারণ করার যৌক্তিকতা কতখানি তা বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়ই ঠিক করুন।

শব্দের প্রকৃত অর্থ না জানার জন্যে বহু মানুষেই বিভ্রান্ত হয়ে পড়ে ও কু-সংস্কারকে বিশ্বাস করে। আমি প্রায়শঃ দেখি অনেক লোকেই অনর্থক তুচ্ছ বিষয় নিয়ে বিতণ্ডা শুরু করে, যেমন রাম বড় না কৃষ্ণ ৰড়, অথবা শিব বড় না নারায়ণ ৰড়। সংস্কৃত 'রম' ধাতু থেকে 'রাম' শব্দ নিষ্পন্ন হয়েছে। ব্যুৎপত্তিগত ভাবে 'রাম' শব্দের অর্থ, “যে সত্তা আনন্দস্বরূপ”, অর্থাৎ পুরুষোত্তম। ঠিক ওই রকম সংস্কৃত 'কৃষ' ধাতু থেকে কৃষ্ণ শব্দ নিষ্পন্ন হয়েছে। "কৃষ্ণ” শব্দের অর্থ, "যে সত্তা সমগ্র মহাবিশ্বকে নিজের দিকে আকর্ষণ করেন", অর্থাৎ পুরুষোত্তম। তাহলে একই সত্তার দু'টো নাম, "রাম" ও "কৃষ্ণ”। ঠিক ওই ভাবে "শিব” শব্দের অর্থ পরমপুরুষ [পরম চৈতন্য]। দু'টি শব্দের সমাহারে 'নারায়ণ' শব্দটি নিষ্পন্ন হয়েছে-'নার' আর 'অয়ন'। 'নার' শব্দের অর্থ প্রকৃতি ('নার' শব্দের অর্থ ভক্তিও হয়) আর 'অয়ন' শব্দের অর্থ হ'ল 'আশ্রয়' তাহলে 'নারায়ণ'

শব্দের অর্থ হ'ল প্রকৃতির আশ্রয়–পরমা প্রকৃতির আশ্রয়–পরমচৈতন্য। এইভাবে 'শিব' ও 'নারায়ণ' একই সত্তার মাত্র দু'টি নাম। তাহলে এই বিষয় নিয়ে বিবাদের জায়গা কোথায়? পারস্যের শব্দ 'খুদা' আর সংস্কৃত শব্দ 'স্বয়ম্ভু' (কেউ কেউ মনে করেন, বৈদিক শব্দ 'স্বয়ম্ভু' পরিবর্তিত হয়ে পারস্যের শব্দ 'খুদা' তে পরিণত হয়েছে) একই সত্তার দু'টি নাম। তাহলে 'খুদা' বড় না 'স্বয়ণ্ডু' বড় এই নিয়ে বিতণ্ডা কী চলতে পারে? ব্যুৎপত্তিগত জ্ঞানের অভাবে শব্দের সঠিক অর্থ নির্ধারণ না করে লোকেরা অনর্থক বিতণ্ডা করে সমাজকে ভাগ করেছে। যদি সমস্ত মানুষই পরমপুরুষের সন্তান হয় তবে এটা কী করে সম্ভব যে শুধুমাত্র মুসলমানরা আল্লার প্রিয় সন্তান, আর শুধুমাত্র হিন্দুরা নারায়ণের প্রিয় সন্তান?

বাস্তবে এই মহাবিশ্বের সমস্ত সৃষ্ট বস্তুই পরম ব্রহ্মের সন্তান–সমস্ত কিছুই তাঁর সসীম প্রকাশ। কেউ ছোট নয়, কেউ তুচ্ছ নয়। সবাই ভ্রাতৃত্বের ৰন্ধনে বাঁধা।

আমাদের কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে একসঙ্গে এগিয়ে চলতে হ'ৰে। অজ্ঞানতার ময়লা পাঁকে বা অন্ধবিশ্বাসের কুয়াশাচ্ছন্ন পরিবেশে

মানুষ ৰদ্ধ থাকলে কারোরই উপকার হ'ৰে না। অন্ধবিশ্বাস ও মহাম্মন্যতার মিথ্যা ধারণা মানব জাতির ধ্বংসের পথই শুধুমাত্র প্রশস্ত করবে।

২৭ অগস্ট ১৯৫৮ আর ইউ, রামনগর

সমাজের দায়িত্ব

সমাজের সমান্তরাল মানস তরঙ্গের মূলভাবটি মোটামুটিভাবে নিন্মলিখিত তত্ত্বগুলির (গড়মাত্রা) মাধ্যমে নির্ধারিত হয়। (১) এক সাধারণ ভাষা, (২) একই রকমের রীতি–রীবাজ ও আচার–পদ্ধতি, (৩) একই রকমের জীবন–যাপনের প্রণালী, (৪) একই ধরনের ঐতিহ্য, (৫) জাতিগত সাদৃশ্য, (৬) ভৌগলিক সাদৃশ্য, (৭) সমান সংস্কৃতি আর (৮) সম

উদ্দেশ্য বা লক্ষ্য। দূর্ভাগ্যক্রমে সমাজ সংরচনাকালে এই উপাদানগুলিকে সাধারণতঃ উপেক্ষা করা হয় কারণ তারা সামুহিক মনস্তত্ত্বের কারণ নয়, কিন্তু তার নিমিত্ত মাত্র যার মাধ্যমে সামুহিক মনস্তত্ব প্রবাহিত হয়। বাস্তবিক সামাজিক সংরচনার জন্যে অপরিহার্য প্রাণশক্তি হ'ল সম অনুভূতি ও সম মানসতরঙ্গ। এই কারণেই আমরা বলে থাকি সমাজ হ'ল সম মানসতরঙ্গের অভিব্যক্তি আর একসঙ্গে এগিয়ে চলার মানসিক প্রবণতার জন্যে এর উদ্ভব হয়।

এটা সুস্পষ্ট যে বহু মানুষের অপরিমেয় সমষ্টিগত শক্তিদ্বারা সমাজ পোষিত। তাই সমাজ সম্পর্কে জনপ্রিয় ধারণা হ'ল এটি বহু ব্যষ্টির সমষ্টি। কিন্তু শুধুমাত্র বহু ব্যষ্টির সমষ্টি নয়, যাদের মানসতরঙ্গ ভিন্ন ভিন্ন দিকে প্রবাহিত অর্থাৎ যাদের মানসতরঙ্গ সমান্তরাল নয় বরং মতানৈক্যের কারণে বিপথগামী এবং বিকৃত, তাকে সমাজ বলা যায় না।

বৌদ্ধিক বা ভৌতিক রূপে যতই অনুন্নত হোক না কেন, যখন পরিবারের প্রতিটি সদস্য অন্য সদস্যের স্বাচ্ছন্দ্য ও মঙ্গলকে গুরুত্ব দেয় আমরা সেখানে সমাজের এক ক্ষুদ্র চিত্র

দেখতে পাই। পৃথিবীতে অনেক পরিবার আছে যেখানে শারীরিক ও ৰৌদ্ধিক তারতম্য থাকা সত্বেও প্রতিটি সদস্য অপর সদস্যের কল্যাণের জন্যে সচেতন। এটি হ'ল আদর্শ পরিবার। সমাজের জন্যেও এটা আদর্শ স্বরূপ হওয়া উচিৎ যদিও আজকের দিনে এটা অত্যন্ত বিরল।

সমাজের দায়িত্ব হ'ল তার সাধারণ সম্পত্তির সঠিক রক্ষণাবেক্ষণ ও উপযোগ করা। সমাজকে সুনিশ্চিত করতে হ'ৰে যাতে সবাইকে এই সাধারণ সম্পত্তিতে সমান রূপে ভোগ-দখলের অধিকার দেওয়া হয় যাতে সবাই সুস্থ শরীর ও মন নিয়ে একসঙ্গে বেঁচে থাকতে পারে।

আজকের পৃথিবী হয় পুঁজিবাদ না হয় চরম বস্তুবাদকে অর্থাৎ কম্যুনিজম অনুসরণ করছে। এই ব্যবস্থায় যাদের অপেক্ষাকৃত বেশী জ্ঞান, বুদ্ধি বা দৈহিক বল আছে তারা বেশী বেশী করে ভৌত সম্পদকে অযথা ভাবে আত্মসাৎ করছে। লোকে ভুলে গেছে যে আমরা পরমা প্রকৃতি থেকে ভৌত সম্পদের সঙ্গে সঙ্গে সূক্ষ্ম সম্পদ আহরণ করি। পরিবারের কোন সদস্য পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের সঙ্গে যদি একত্ব

অনুভব না করে, যুক্তিদ্বারা স্বীকৃত সবার প্রয়োজনকে বা যৌথ অধিকারের মহৎ নীতিকে স্বীকার না করে, তবে তাকে সামাজিক সত্তা বলে গণ্য করা যাবে না। বিশ্বৈকতাবাদী আধ্যাত্মিক ভাবাদর্শ অনুসারে ব্যষ্টি মালিকানাকে চরম বলে গণ্য করা হয় না। এইজন্যে সমাজ সম্পর্কে আনন্দমার্গের চিন্তা–ভাবনা পুঁজিবাদকে সমর্থন করে না।

একটা যৌথ পরিবারে প্রতিটি সদস্য/সদস্যা নিজেদের ইষ্ছার পূর্তি, খাদ্য, বস্ত্র, চিকিৎসা ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় জিনিসের ব্যবস্থা পরিবারের আর্থিক ক্ষমতা অনুসারে করে থাকে। যদি কোন বিশেষ সদস্য তার প্রয়োজনের অতিরিক্ত খাদ্য, বস্ত্র, বই বা ওষুধ জমা করে তবে কী পরিবারের অন্য সদস্যরা অসুবিধার সম্মুখীন হ'ৰে না? ওই অবস্থায় সেই সদস্য/সদস্যার কার্য সমাজের জন্যে অসঙ্গত ও ক্ষতিকর হ'ৰে। সমাজের দায়িত্ব হ'ল ওই রকম ত্রুটিপূর্ণ সমাজ ব্যবস্থাকে তৎক্ষণাৎ ভেঙ্গে ফেলা।

আজকের দিনে পৃথিবীতে পুঁজিবাদীরা প্রচুর পরিমাণে সম্পদ ও সম্পত্তি জমা করে নিজেদের কুক্ষিগত করে রাখছে আর

অন্যদের ক্ষুধার যন্ত্রণায় ছেড়ে দিচ্ছে। তারা যাতে জমকালো পোশাক পরে ঘুরে বেড়াতে পারে সেইজন্যে জনগণকে ছেঁড়া জামাকাপড় পরতে বাধ্য করছে। নিজেদের শক্তি বৃদ্ধির জন্যে তারা অপরের প্রাণরস চুষে ছিবড়ে করে দিচ্ছে। সমাজের দায়িত্ব হ'ল এইসব লোকেদের ভুল যে কোন ভাবে ধরিয়ে দেবার জন্যে ও তাদের সমাজবিরোধী ক্রিয়াকলাপ বন্ধ করার জন্যে সব রকম পদক্ষেপ নেওয়া। অপরকে শোষণ করে ধনী হবার আকাঙ্ক্ষা সবসময়ে এক রকমের মানসিক ব্যাধি।

পুঁজিবাদীদের যুক্তি, "আমরা আমাদের বুদ্ধি ও পরিশ্রম দিয়ে ধন সম্পত্তি আহরণ করি। যদি বুদ্ধি ও কর্ম ক্ষমতা থাকে তবে অপরও ওইভাবে ধন সম্পত্তি সংগ্রহ করুক। তাদের কে বাধা দিচ্ছে?" তারা স্বীকার করতে চায় না যে পৃথিবীতে উপভোগ্য পণ্যদ্রব্য সীমিত, কিন্তু সবাইয়ের মৌলিক চাহিদা মেটানো প্রয়োজন। যদি কোন ব্যষ্টি প্রচুর পরিমাণে ধন সম্পত্তি আহরণ করা শুরু করে তবে সাধারণ ভাবেই অপরেরা তাদের ন্যূনতম প্রয়োজন থেকে বঞ্চিত থাকবে। অপরের প্রয়োজনকে চিনতে না পারার ব্যর্থতাই এক ধরণের ব্যাধি। কিন্তু এই ব্যাধির দ্বারা আক্রান্তরাও আমাদের ভাই-বোন, একই মানব

সমাজের সদস্য। হয় মানবিক আবেদন দ্বারা অথবা পরিস্থিতির চাপ তৈরী করে তাদের এই মানসিক ব্যাধি সারাতে হবে। এই জন্যে, তাদের স্থূল সম্পদ আহরণের প্রতি এই ঘোরতর নেশাকে মানসিক ও আধ্যাত্মিকতার দিকে পরিচালিত করতে হ'ৰে। মানুষের ভৌত ক্ষুধা তৃষ্ণার পরিতৃপ্তির সঙ্গে সঙ্গে সবাইকে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে নিজেদের মানস–আধ্যাত্মিক আকাঙ্ক্ষা পূরণের জন্যে উন্মুক্ত ভাবে শিক্ষাদান করতে হ'বে।

এমন এক সমাজশৃঙ্খলা বানাতে হ'বে যেখানে সবাই তার ক্ষমতা অনুসারে কাজ করবে। শারীরিক ভাবে বেশী সক্ষম ব্যষ্টিদের শারীরিক পরিশ্রমের কাজ দেওয়া হ'বে আর মানসিক ভাবে বেশী সক্ষম ব্যষ্টিদের মানসিক পরিশ্রমের কাজ দেওয়া হ'বে। যারা শারীরিক বা মানসিক পরিশ্রম দিতে অপারগ তাদের দেখাশোনার দায়িত্ব সমাজের হ'ৰে।

যাদের কাজ করার জন্যে শারীরিক ক্ষমতা আছে, সমাজ শুধুমাত্র তাদেরকেই সামাজিক ক্ষমতা প্রদান করবে না। সবাইয়ের সম অধিকার থাকবে; এক জনের অধিকার অপরের অধিকারকে লঙ্ঘন করবে না। সকলকেই তাদের সাধ্য মত

মানসিক ও আধ্যাত্মিক প্রগতি করার জন্যে পূর্ণ অধিকার সুনিশ্চিত করতে হ'ৰে। কোন প্রকারের কোন ৰাধা থাকৰে না। কিন্তু সামাজিক শান্তি ও আনন্দ বজায় রাখার জন্যে ভৌত ক্ষেত্রে সমষ্টির স্বার্থের জন্যে ব্যষ্টির অধিকারকে খর্ব করতে হ'বে।

একটা সামাজিক সংরচনা গঠন করার সময় আমরা আধ্যাত্মিক অভীষ্টকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দেৰ। সবাইকে এইটা বুঝতে হ'ৰে যে, যদি জনগণের আধ্যাত্মিক অভীষ্ট কিছু না থাকে, তবে তারা পার্থিব উন্নতি লাভ করলেও আত্মকেন্দ্রিক হয়ে পড়ৰে ও তাদের মনে গোষ্ঠী-কেন্দ্রিক ভাবপ্রবণতার বিকাশ হৰে। এই রকম মানুষেরা পার্থিব জ্ঞানের চর্চা করে কিন্তু আধ্যাত্মিকতার চর্চা করে না। আধ্যাত্মিকতার চর্চায় এইরকম প্রশ্নের গভীর মনন জড়িয়ে থাকে যেমন, "আমি কে?, আমার লক্ষ্য কী?, আমার লক্ষ্যে কীভাবে আমি পৌঁছাৰ"? ইত্যাদি।

আজকের বুদ্ধিজীবিরা আধ্যাত্মিকতার প্রসার প্রতিরোধের চেষ্টা করে কারণ তারা নৈতিকভাবে অসম্পূর্ণ আর তাদের মানসতরঙ্গ সামুহিক স্বার্থের বিপরীত দিশায় প্রবাহিত হয়।

সূচীপত্র

ফলস্বরূপ সমাজে আজ অনৈতিকতা, দুর্নীতি ও অসততা অবাধে প্রসারণশীল। একটি সুস্থ ও শক্তিশালী সমাজব্যবস্থা এই প্রবণতাকে বন্ধ করবে।

ইতিহাসের গবেষণায় এটা সুস্পষ্ট যে আজ পর্যন্ত এই গ্রহে সুস্থ ও সবল সমাজ গড়ে ওঠে নি। এর প্রধান কারণ সঠিক আধ্যাত্মিক ভাবাদর্শের অ–পর্যাপ্ত প্রসার। যদিও বিভিন্ন সময়ে অল্পকিছু সংখ্যক লোক এক শক্তিশালী ও সুস্থ সমাজ প্রতিষ্ঠা করার চিন্তা করেছিল কিন্তু সুচিন্তিত কার্য ও অন্যকে এই রকম সমাজের প্রয়োজনীয়তা বোঝাবার পরিবর্তে তারা যুক্তি আর বিতর্কে জড়িয়ে পড়েছিল। পরিণামে শেষ পর্যন্ত তারা ভাবাদর্শের পরিবর্তে নিজেদেরকেই তুলে ধরেছিল। এইভাবে ভাবাদর্শ হয়ে গেল গৌণ ও পরিশেষে ধুয়ে মুছে পরিষ্কার হয়ে গেল কারণ জনগণেরা তাদের মহাত্মা বা মহাপুরুষ ৰলে পূজা করতে শুরু করে দিয়েছিল। ভাবাদর্শের অভাবে একটা শক্তিশালী সমাজ গড়ে উঠল না আর নানা প্রকার ত্রুটি মানুষের জীবনে অলক্ষিতভাবে প্রবেশ করল।

ভগবান কৃষ্ণ এই রকম একটা সুস্থ ও সবল সমাজ গড়বার সর্বপ্রথম প্রচেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু মহাভারতের যুদ্ধে তাঁর অনেক সময় নষ্ট হয়। শেষ পর্যন্ত এই রকম মানব সমাজ গড়বার জন্যে তাঁর কাছে যথেষ্ট সময় ছিল না। ঠিক সেই রকম ভগবান শিব... যিনি তন্ত্রের আদি প্রবক্তা, আধ্যাত্মিকতার মজবুত ভিত্তি স্থাপনের জন্যে তাঁকে অনেক সময় ব্যয় করতে হয়েছে। প্রবল ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও তিনি একটি শক্তিশালী সমাজ ব্যবস্থা গড়ে তুলতে পারেন নি। আজ তাঁদের যৌথ শক্তি এক সুস্থ মানব সমাজ গড়ে তুলতে সাহায্য করবে।

জুন ১৯৬০

গান্ধীবাদের সামাজিক ত্রুটি

সমাজ একটি সামূহিক সত্তা, এটা কোন ব্যষ্টি বিশেষের অধিকার ভুক্ত নয়। সমাজের উদ্দেশ্য হ'ল সামূহিক কল্যাণকে

ধারাবাহিকভাবে উন্নীত করা। সমাজের প্রতিটি ব্যষ্টি, সামূহিক স্বার্থের জন্যে যখন বৈয়ষ্টিক স্বার্থকে ত্যাগ করার অপরিহার্যতাকে উপলব্ধি করবে, তখন আর একমাত্র তখনই শক্তিশালী ও স্বাস্থ্যকর সমাজ গড়ে তোলা সম্ভব। এবারে প্রশ্ন হ'ল, সমাজ ও ব্যষ্টির মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক কী হওয়া উচিত?

প্রতিটি ব্যষ্টি দু'টি অসাধারণ ও অমূল্য সম্ভাব্য–ক্ষমতার অধিকারী... মানসিক ও আধ্যাত্মিক। এই দু'টি সম্ভাব্য–ক্ষমতার ওপর সামূহিক নেতৃত্ব কোন প্রকার হুকুম জারি করতে পারে না। তাদের অধিকার সীমা শুধুমাত্র পার্থিব সম্পদ অবধি সীমাৰদ্ধ। ভৌতক্ষেত্রে ব্যষ্টি যদি সমষ্টির স্বার্থকে লঙ্ঘন না করে তবে ব্যষ্টি ও সমষ্টি উভয়ই সমস্যা এড়িয়ে মঙ্গলময় অবস্থার উপভোগ করবে। এই কারণে সামূহিক স্বার্থের বিরুদ্ধে ব্যষ্টি অধিকারকে খর্ব করা হয়েছে। কিন্তু মানসিক ও আধ্যাত্মিক জগতে প্রতিটি ব্যষ্টির উন্নতি ও প্রগতির সম্পূর্ণ স্বাধীনতা আছে।

এই পরিপ্রেক্ষিতে মার্ক্সবাদ হ'ল অযৌক্তিক, অস্বাভাবিক ও অবৈজ্ঞানিক তত্ত্ব। মহাবিশ্বের সমস্ত পার্থিব সম্পদ যদি সুচারুরূপে বন্টন করে দেওয়াও হয় তবুও লোকে সন্তুষ্ট হবে না। তাদের অন্তঃকরণ থেকে একটা হাহাকার উত্থিত হবে, "আমি আরও চাই, আমি আরও চাই।" এর কারণ হ'ল মানুষের মনের বাসনা সীমাহীন। এই অসীম বাসনা একমাত্র অনন্তের জগতে তৃপ্ত হতে পারে। পার্থিব জগতে অসীম আকাঙ্ক্ষার তৃপ্তি সম্ভব নয় কারণ, যদিও পার্থিব সম্পদ অত্যন্ত সুবিশাল তবুও তা অনন্ত নয়। তাই বিজ্ঞজনেরা তাদের অসীম বাসনাকে মানসিক ও আধ্যাত্মিক জগতে ঘুরিয়ে দেন।

গান্ধীবাদে আমরা দু'টি ত্রুটি খুঁজে পাই–মানসিক ও ভৌতিক। যদিও গান্ধীবাদ শুদ্ধ পুঁজিবাদ নয়, কিন্তু নিঃসন্দেহে এটা পুঁজিবাদকে রক্ষা করার এক পথ। পুঁজিবাদীরা এর মাধ্যমে নিজেদের রক্ষা করার পুরো আশ্রয় পেয়ে যায়। গান্ধীবাদ মনে করে যে পুঁজিবাদ জনগণের সম্পত্তির ন্যাসরক্ষক (ট্রাষ্টি) কিন্তু এটা কীভাবে সম্ভব? যারা জনগণের পরিশ্রমের রক্তে নিজেদের সমৃদ্ধ করে তারা জনগণের রক্ষক কীভাবে হ'ৰে? শোষিত

জনগণ কীভাবে বিশ্বাস করবে যে শোষক তার রক্ষাকর্তা হবে? তাহলে গান্ধীবাদ সরাসরি মনোবিজ্ঞান বিরোধী তত্ত্ব।

দ্বিতীয়তঃ গান্ধীবাদ সব সময় লড়াই, সব রকমের সংগ্রাম, এমনকি শ্রেণীসংগ্রামকেও এড়িয়ে যাবার চেষ্টা করে। মার্ক্সবাদ অনুসারে দু'টি প্রধান শ্রেণী আছে–শোষক ও শোষিত। গান্ধীবাদ এই ধরনের বিভাজন স্বীকার করে না। বাস্তবে সমাজে চারটি শ্রেণী আছে–শূদ্র, ক্ষত্রিয়, বিপ্র ও বৈশ্য। প্রভাবশালী বা ক্ষমতাশীল শ্রেণী অন্যান্য শ্রেণী গুলিকে যথাসাধ্য শোষণ করে। শোষক শ্রেণীর অন্তর্নিহিত পরাক্রম ও জীবনীশক্তির ওপর শোষণের মেয়াদ কমবেশী হ'তে পারে কিন্তু জাগতিক অগ্রগতির ধারা এই নমুনাকেই অনুসরণ করে। গান্ধীবাদ অনুসারে যুক্তি–পরামর্শের দ্বারা শোষকের হৃদয় পরিবর্তন সম্ভব। তত্ত্বগত ভাবে এই মত স্বীকার করা গেলেও এটা না স্বাভাবিক না বৈবহারিক। একটা ছাগল বাঘকে বোঝাতে চাইলেও কী বাঘ ছাগলকে খাবে না? সংগ্রাম স্বাভাবিক ও অপরিহার্য। 'সংগ্রামের মাধ্যমেই প্রগতি আসে' এই ধারনা তন্ত্রও সমর্থন করে। সংগ্রামকে পরিহার করা গান্ধীবাদের পুঁজিবাদী সুলভ ত্রুটি। সেজন্য পৃথিবী কখনো গান্ধীবাদকে গ্রহণ করবে না।

সূচীপত্র

আনন্দমার্গের মত অনুসারে যখন যুক্তি–পরামর্শ ব্যর্থ হয় তখন শক্তি সম্প্রয়োগ অপরিহার্য। পরিশেষে আমরা বলতে পারি শ্রেষ্ঠ নিয়ম হ'ল, "ধার্মিককে রক্ষা কর আর দুষ্টের শাস্তি বিধানকর"। যদি এই নীতি অনুসরণ করা হয় তবেই একমাত্র মানব সমাজের উন্নতি সম্ভব।

যারা পরমপুরুষকে নিজেদের ধ্যেয় হিসাবে মানে ও যারা স্বার্থপরতা থেকে মুক্ত, একমাত্র তাঁরাই সমাজের বিশ্বাসযোগ্য নির্ভরশীল 'ট্রাষ্টি' হতে পারে। যাঁরা যম–নিয়মে প্রতিষ্ঠিত ও জীবনে ব্রহ্মকেই অভীষ্ট ৰলে গ্রহণ করেছে তারাই একমাত্র মানবজাতির কল্যাণকে সুরক্ষিত রাখতে সমর্থ। একমাত্র এইরকম ব্যষ্টিরাই সদবিপ্র আর একমাত্র তারাই মানবতাকে প্রতিনিধিত্ব করতে পারে–সমগ্র সৃষ্টিকে তারাই নিস্বার্থভাবে সেবা করতে পারে। নিজেদের আচরণ, সেবার প্রতি নিষ্ঠা, কর্তব্যপরায়নতা ও চরিত্রবলের দ্বারা সদবিপ্ররা পরিচিত হবেন। তারা দৃঢ়ভাবে ঘোষণা করবেন, "সমস্ত মানুষই একই জাতির অন্তর্ভুক্ত, সবারই রয়েছে সম অধিকার, সবাই একই মানব পরিবারের সদস্য"। একমাত্র এই সদবিপ্ররাই বজ্রদীপ্ত কণ্ঠে

শোষকদের সাবধান করতে পারে, “একে অপরকে শোষণ করতে পারবে না, ধর্মের নামে কোন শোষণ করা চলবে না।” এই সদবিপ্ররাই সমাজের অভিভাবক হবেন। সমাজচক্রের নিয়মানুসারে নিরন্তর চলতে থাকা শ্রেণীসংগ্রামকে সদবিপ্ররা কখনই বন্ধ করবে না। তারা শুধুমাত্র সুনিশ্চিত করবে যে শাসক যেন সমাজকে শোষণ করতে না পারে। অর্থাৎ তারা শাসককে শাসন করবে।

গান্ধীবাদের প্রবক্তা বিনয়ী স্বভাবের মানুষ। তিনি এই সংগ্রাম পছন্দ করেন না, কিন্তু সেটা তো অস্বাভাবিক ও অবৈবহারিক। কেবল মাত্র বৈবহারিক তত্ত্বকেই গ্রহণ করা যায়। শুদ্ধ ভাববাদের থেকে বাস্তবিকতা বা বৈবহারিকতা জন্মায় না।

সেপ্টেম্বর ১৯৬০ রাঁচি

মানবসমাজকে কিভাবে একতাৰদ্ধ করা যাৰে

ব্যষ্টি তথা সমাজের উন্নয়ন ও সমৃদ্ধি সাধন করতে হলে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের জীবনযাত্রার মধ্যে যে-যে ক্ষেত্রে মিল বা ঐক্য রয়েছে শুধুমাত্র সেগুলোকেই আমাদের বেশি উৎসাহ যোগাতে হবে। পার্থক্যগুলিকে নয়। এটা স্বাভাবিক যে সমাজে পোষাক-পরিচ্ছদ, আচার-ব্যবহার, সাংস্কৃতিক অভিব্যক্তি, খাদ্যাভ্যাস, ভাষা প্রভৃতি বিষয়ে পার্থক্য আছে ও থাকৰে। কিন্তু এই সব পার্থক্যকে যদি অযথা বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয় তাহলে সামাজিক সমস্যাগুলি শুধুমাত্র ৰেড়েই যাৰে আর তার ফলে সমাজের সংহতি নষ্ট হয়ে যাৰে-এমন কি তার অস্তিত্বটাই বিপন্ন হয়ে পড়বে। বর্তমান সমাজের অধোগতি রোধ করার জন্যে কোনো ব্যবস্থা যদি অবিলম্বে না নেওয়া হয় তাহলে বিভিন্ন কারণের ফলশ্রুতি হিসেবে কালক্রমে স্বতঃই সমাজে

নেতিবাচক বিধিব্যবস্থা গড়ে উঠবে। সুতরাং বিভেদমূলক বিষয়গুলিকে কখনই কোনভাবেই উৎসাহ দেওয়া উচিত হবে না।

সমাজে পার্থক্যগুলিকে নিয়ে সরব হওয়া থেকে সমাজপতি ও রাজনৈতিক নেতাদের বিরত থাকা উচিত। বরং এটাই তাঁদের জোর দিয়ে বলতে হবে, জটিল বিভেদমূলক বিষয়গুলি উত্থাপনের এটা উপযুক্ত সময় নয়। উদাহরণ হিসেবে ভারতীয় ভাষাগুলিকে নাও। ভারতে অনেক লোকই আছেন যাঁরা ভাষা নিয়ে অনর্থক লড়াই করেন। কিন্তু যখন দেশের এত লোক ক্ষুধা, দুর্ভিক্ষ, ব্যাধি, অশিক্ষা, আর্থিক দুরবস্থাতে ভুগছে তখন এই ভাষা সমস্যা নিয়ে মেতে ওঠার এটাই কি উপযুক্ত সময়? ভারতের জনসাধারণ কি তুলনামূলক বিচারে কম গুরুত্বপূর্ণ এই ভাষা সমস্যা নিয়ে তাদের মূল্যবান সময় নষ্ট করতে পারে? সেটা না করে তাদের অবিলম্বে শোষণের বিরুদ্ধে প্রচারাভিযান শুরু করে দেওয়া দরকার। কারণ এটাই বিভেদসৃষ্টিকারী শক্তিগুলিকে নিয়ন্ত্রণে রাখবে। এটা যদি না করা হয় তাহলে বিভেদসৃষ্টিকারী শক্তিগুলি সমাজে নানা প্রকার বাধা ও বিরোধ

সৃষ্টি করৰে আর তাতে লোকের জ্বলন্ত সমস্যাগুলির কোন সমধান হবে না।

ঐক্যের উপায়:

কোন দেশের প্রগতি দেশের ঐক্যের ওপর নির্ভর করে। সেই জন্যে ঐক্যসৃষ্টিকারী বিষয়গুলিতেই গুরুত্ব দেওয়া উচিত। বিভেদসৃষ্টিকারী শক্তিগুলিকে দূর করতে হলে আমাদের নিম্নে লিখিত তিনটি অধিক্ষেত্রে বিরামবিহীন সংগ্রাম চালিয়ে যেতে হবে।

(১) সামাজিক-আর্থিক অধিক্ষেত্র:

সমাজের কিছু লোক মস্ত ধনী আর জনসাধারণের একটা বিরাট অংশ নিদারুণ দারিদ্র্যে ধুঁকছে। স্বাভাবিকভাবেই একটা দৃঢ় সমাজব্যবস্থা গড়ে তুলতে হলে সামাজিক-আর্থিক বৈষম্যকে সম্পূর্ণরূপে নির্মূল করতে হবে।

সামাজিক–আর্থিক বৈষম্য দূরীকরণের সাথে সাথে সমাজের সামুহিক সম্পদের প্রগতিশীল হারে বৃদ্ধি ঘটাতে হবে। তাহলেই জনসাধারণের ক্রমবর্ধমান চাহিদা সাফল্যের সঙ্গে পূরণ করা সম্ভব হবে। ওড়িষ্যার উদাহরণই নেওয়া যাক। এই রাজ্যে কৃষি উৎপাদন প্রায় সম্পূর্ণরূপে, বিশেষ করে বর্ষাকালে মৌসুমী বায়ুর ওপর নির্ভরশীল। কিন্তু যদি সেচব্যবস্থা যথাযথভাবে উন্নত হত তাহলে এই রাজ্যে কৃষি উৎপাদন শতকরা ৩০০ ভাগ বৃদ্ধি পেত ও তাতে অতিরিক্ত চার কোটি মানুষের খাদ্যের সংস্থান হত। বর্তমান উৎপাদনে মাত্র দেড় কোটি লোকের খাদ্যের সংস্থান হচ্ছে। ওড়িষ্যা খনিজ সম্পদেও সমৃদ্ধ। প্রচুর পরিমাণে কয়লা, বক্সাইট, ম্যাঙ্গানিজ ও অন্যান্য খনিজ সম্পদ সেখানে সহজলভ্য কিন্তু এই সব খনিজ সম্পদের অনেকগুলিই বাইরের অন্যান্য দেশে রপ্তানী করা হচ্ছে। যদি এই সব কাঁচামাল যথাযথভাবে এই রাজ্যেই শিল্পজাত দ্রব্য উৎপাদনে ব্যবহৃত হত তাহলে ওড়িষ্যায় কমপক্ষে চারটি বৃহদায়তন ইস্পাত শিল্প স্থাপিত হতে পারত। এতে জনসাধারণের ক্রয়ক্ষমতা অনেকটাই বেড়ে যেত। দুর্ভাগ্যবশতঃ দেশের অযোগ্য রাজনৈতিক নেতারা যুক্তিসঙ্গতভাবে কিছু চিন্তা করেন না। বরং, তাঁরা এমন সব পরিকল্পনা রচনা করেন যা সামাজিক–আর্থিক অসাম্য তো দূর

করেই না, আর সামুহিক সম্পদেরও বৃদ্ধি ঘটাতে পারে না। এই সব নেতারা ঘোড়ার সামনেই গাড়ীটা রেখে দিয়ে বিরাট ভুল করেছেন।

একটি সামাজিক–আর্থিক সংগ্রামের সাধারণ কর্মসূচীর মাধ্যমে বিশ্বের সমস্ত দেশের অর্থনৈতিক ভাবে বঞ্চিত জনসাধারণকে ঐক্যবদ্ধ করা যেতে পারে। এই সংগ্রামে একদিকে পুঁজিপতিদের নির্মম শোষণের বিরুদ্ধে সংগ্রাম চালিয়ে যেতে হবে ও অন্যদিকে উন্নয়নমূলক কর্মসূচীর মাধ্যমে সামুহিক সম্পদ বৃদ্ধি করতে হবে। সেচব্যবস্থা, খনিজ সম্পদ, কৃষি সম্পদ ও শিল্পের ব্যাপক উন্নয়ন ঘটিয়ে দেশের সামূহিক সম্পদ খুব সহজেই বৃদ্ধি করা যেতে পারে।

'সামাজিক বৈষম্য মসৃণভাবে দূর করতে ও সামূহিক সম্পদ বৃদ্ধি করতে হলে সারা পৃথিবী জুড়ে স্বনির্ভর সামাজিক–অর্থনৈতিক অঞ্চল স্থাপিত হওয়া উচিত। রাজনৈতিক সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে রাজ্য (state) বানানো সতর্কতার সঙ্গে এড়িয়ে যেতে হবে। একটা রাজনৈতিক একক (unit) [রাজ্য অথবা রাষ্ট্র] কয়েকটি সামাজিক–অর্থনৈতিক অঞ্চল নিজ নিজ অর্থনৈতিক

সমস্যা নিয়ে একত্রে থাকতে পারে। যেমন, বিহার একটি রাজনৈতিক (unit) একক কিন্তু এখানে ছোটনাগপুর পাহাড় অঞ্চল মরছে অপ্রতুল সেচ সমস্যায় আর উত্তর বিহারের সমভূমি অঞ্চল ভুগছে প্লাবন হেতু জল নিষ্কাশন সমস্যায়। রয়েলসীমা, শ্রীকাকুলাম ও তেলেঙ্গানা অঞ্চল অন্ধ্রপ্রদেশ রাজনৈতিক এককে (unit) অবস্থিত কিন্তু তাদের সামাজিক-অর্থনৈতিক সম্ভাবনা সম্পূর্ণরূপে পৃথক। এই সব অঞ্চল থেকে সর্বাধিক পরিমাণে কল্যাণ (benefit) পেতে হলে একই রাজনৈতিক এককে (unit) আছে কি নেই সেটা বিচার না করে এখানে পৃথক পৃথক সামাজিক-অর্থনৈতিক অঞ্চল (Socio-Economic Zone) তৈরী করতে হবে। রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত বা ভাষার ভিত্তিতে রাজ্য বানানো মস্ত ভুল। যদি একজন পুঁজিপতি ও একজন শ্রমিক একই ভাষায় কথা ৰলে তা হলেই কি কেউ ভাববে যে ভাষার মিল থাকার জন্যে তারা পরস্পরের বন্ধু?

(২) মানস-ভাবাবেগের অধিক্ষেত্র:

মানসিক ক্ষেত্রেও কিছু কিছু বিষয় আছে যা বিভিন্ন ভাষাভাষী জনগোষ্ঠীকে ঐক্যবদ্ধ করে রাখে। যেমন, উত্তর

ভারতের সমস্ত ভাষা ও দক্ষিণ ভারতের কিছু ভাষা সংস্কৃত থেকে উদ্ভুত ও বিকাশপ্রাপ্ত হয়েছে। এই সব ভাষাগুলি সংস্কৃতের দ্বারা খুবই প্রভাবিত। এই অবস্থায় কারও পক্ষে সংস্কৃত পঠন–পাঠনের বিরুদ্ধাচরণ করা উচিত হবে না। এটাকে একটা সামান্য ব্যাপার বলে মনে হতে পারে কিন্তু উৎসাহ পেলে এটা ভারতীয় সমাজে ঐক্যবন্ধনের একটা বিরাট হেতু হয়ে উঠবে।

সামাজিক ঐতিহ্যেও একটা মিলনসূত্র গড়ে তোলা যেতে পারে। প্রত্নতাত্ত্বিক গবেষণা ও খনন কার্যে প্রাপ্ত গৌরবময় অতীত সভ্যতার প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন আর মনীষীদের জীবনচরিত একটা দৃঢ় জাতীয় ভাবাবেগের সৃষ্টি করতে সাহায্য করবে। যেমন, খনন কার্যে আবিষ্কৃত মহেঞ্জোদারো ও হরপ্পা সভ্যতা প্রাচীন ভারতীয় সংস্কৃতির উৎকর্ষতাকে তুলে ধরেছে।

ইতিহাস পাঠেও উৎসাহ দান করা উচিত। 'ইতিহাস' ও সংস্কৃত শব্দ 'ইতিকথা' (ইংরেজী প্রতিশব্দ history) সমার্থক নয়। ইতিকথা শব্দটির অর্থ হচ্ছে অতীত ঘটনার পঞ্জীভূক্ত নথি। ইতিহাস শব্দটির অর্থ হচ্ছে ইতিকথার (history) সেই অংশ

যার শিক্ষাগত মূল্য রয়েছে। কোনো দেশের ইতিহাস বা সাংস্কৃতিক ইতিকথা সেই সমাজের সদস্যদের মধ্যে ঐক্যভাব জাগিয়ে তোলে ও তারা তাদের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য সম্বন্ধে সচেতন হয়। যেমন, ঐতিহাসিক মহাকাব্য, মহাভারত পাঠ জনসাধারণের মনে গর্ব ও প্রেরণা সঞ্চার করেছে, আর এটা সমষ্টিগত ঐক্যের চেতনা জাগিয়ে তুলেছে।

প্রাচীন মুনি–ঋষিদের দিব্য জীবনের স্মৃতিচারণও জনগণকে এক সূত্রে গেঁথে দেয়। যখন লোকে অতীতের মহান নেতাদের ও পুণ্যাত্মা সন্তদের কথা নিজেদের হৃদয়ে লালন করে তখন সেটা সমষ্টিগত ঐক্যের ভিত্তি গড়ে তোলে।

(৩) আধ্যাত্মিক ভাবাবেগের অধিক্ষেত্র:

সম–আধ্যাত্মিক উত্তরাধিকার ও সম–আধ্যাত্মিক লক্ষ্যের ভাবাবেগেই একমাত্র ভাবাবেগ (sentiment) যা জনসাধারণকে স্থায়ী ঐক্যের বন্ধনে আবদ্ধ করতে পারে। সামাজিক–আর্থিক ও মানসিক ভাবাবেগের বিষয়গুলি সামাজিক ঐক্য ও সংহতি সৃষ্টি

করতে যে খুবই প্রয়োজনীয় তাতে সন্দেহ নেই কিন্তু এই সব সৃষ্ট ভাবাবেগ নিতান্তই সাময়িক বা ক্ষণস্থায়ী। ভূমার ভাবনায় যে ভাবাবেগ সৃষ্ট হয় সেটাই স্থায়ী। বিশ্বৈকতাবাদের ভাবনা হৃদয়ে গ্রহণ করলে সমাজে সামাজিক–অর্থনৈতিক ঐক্য ও ভ্রাতৃভাব একটা সুদৃঢ় ভিত্তিতে স্থাপিত হবে। লোকে বিশ্বপিতা ও বিশ্বভ্রাতৃত্বের ভাবনায় ভাবিত হবে। 'আমরা সকলে যে সেই একই সত্তা থেকে এসেছি আবার সকলে যে সেই একই সত্তায় মিশে যাব' এরকম একটা দৃঢ়প্রত্যয় সকলের মনে এক অভিনব ঐক্যের ভাবাবেগ সৃষ্টি করবে। সমস্ত লোক বিশ্বপ্রেম ও সৌহার্দ্যের বন্ধনে আবদ্ধ থেকে নিজেদের এক বলে অনুভব করবে যা শেষ পর্যন্ত বিশ্বসমাজ সংরচনার পথ প্রশস্ত করবে। নীচের কবিতায় মহান বিশ্বপ্রেমিক কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত এই ভাবাবেগটিই প্রকাশ করেছেন:

"রাগে অনুরাগে নিদ্রিত জাগে
আসল মানুষ প্রকট হয়।
বর্ণে বর্ণে নাহিক বিভেদ
নিখিল ভুবন ব্রহ্মময়।।"

সূচীপত্র

যখন প্রেম নিদ্রিত আত্মাকে জাগিয়ে দেয় তখনই ভিতরের আসল মানুষটি বেরিয়ে আসে। তখন বর্ণে বর্ণে, জাতিতে জাতিতে কোন ভেদ-বিভেদ থাকে না। কারণ পরমপুরুষ এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড জুড়ে বিরাজ করছেন।

যেখানে যেখানে মিলন সূত্র রয়েছে সেগুলোকে উৎসাহিত করতে হবে আর বিভেদের ভাবগুলিকে নিরুৎসাহিত করতে হবে, দূর করে দিতে হবে। সমাজের ঐক্য বজায় রাখতে ও মানুষের সমৃদ্ধি সাধন করতে হলে এই মৌলিক দৃষ্টিভঙ্গী (fundamental approach) অবশ্যই রাখতে হবে। আমাদের সবসময়ই মনে রাখতে হবে:

"জগৎ জুড়িয়া এক জাতি আছে
সে জাতির নাম মানুষ জাতি
একই পৃথিবীর স্তন্যে পালিত,
একই রবিশশী মোদের সাথী।।"

পার্থক্যের বিষয়গুলি:

মানব সমাজের চারটি ক্ষেত্রে বিভিন্নতা আছে–খাদ্য, পোষাক, ভাষা ও ধর্মমত।

(১) খাদ্য:

ভারতে চারটি সুস্পষ্ট খাদ্যাঞ্চল আছে যেখানে হয় নারিকেল তেল, সরষের তেল, তিল তেল, নয় তো বনস্পতি তেল বা ঘি ব্যবহৃত হয়। পঞ্জাব ও উত্তরপ্রদেশের অধিকাংশ লোকই রুটি বেশি পছন্দ করে যেখানে পূর্ব ও দক্ষিণ ভারতের লোকেরা ভাতই বেশি পছন্দ করে। মানুষ যে খাদ্য গ্রহণ করে সেটা নির্ভর করে ভৌমপ্রাকৃতিক অবস্থার ওপর। এই ভৌমপ্রাকৃতিক অপরিহার্যতাকে অগ্রাহ্য করে যদি ভারতের সমস্ত মানুষকে একই রকম খাদ্য খেতে বাধ্য করা হয় তাহলে সেটা হৰে একটা মারাত্মক ভুল।

(২) ভাষাঃ

প্রতিটি দেশেই গোষ্ঠীগত (racial) সাংস্কৃতিক প্রকৃতি অনুযায়ী ভাষার উদ্ভব ও বিকাশ হয়ে থাকে। যদিও ভাষার মূল উৎস সর্বত্রই এক তবুও স্থান-স্থানান্তরে ভাষার পার্থক্য এসে যায়।

রক্তের প্রকৃতি ও নাক, চোখ, চুলের গড়ন বা আকৃতি ও চামড়া দিয়ে গোষ্ঠীগত (racial) বৈশিষ্ট্য নির্ণয় করা হয়। নৃতাত্ত্বিক মানব সংরচনার পার্থক্য হওয়ার কারণে গোষ্ঠীগত (racial) বৈশিষ্ট্যে ভিন্নতা এসে যায়। পৃথিবীতে চারটি মৌলিক জনগোষ্ঠী (race) আছে-আর্য (ককেশীয়), মঙ্গোলীয়, অস্ট্রিক ও নিগ্রো। আর্যদের গায়ের বর্ণ লাল অথবা শাদা, মঙ্গোলীয়দের হলদে, অস্ট্রিকদের বর্ণ শ্যাম (হালকা কালো) ও নিগ্রোদের বর্ণ হয় কৃষ্ণ। অস্ট্রিক-নিগ্রো বিমিশ্রণ জাতিদের দ্রাবিড় বলা হয়।

আর্যদের তিনটি শাখায় ভাগ করা যায়। প্রথম হচ্ছে-নর্ডিক আর্য। এদের গায়ের রঙ লালচে শাদা, চুলের রঙ লালচে অথবা সোণালী, চোখের মণির রঙ বিড়ালের চোখের মত কটা, দেহের রক্ত উষ্ণ ও নাক টিয়ার ঠোঁটের মত বাঁকানো। দ্বিতীয় হচ্ছে এ্যালপাইন আর্য। এদের গায়ের রঙ দুধ শাদা,

চুলের রঙ কালচে নীল, চোখের মণি নীল, নর্ডিকদের থেকে কিছুটা কম উষ্ণ রক্ত ও বাজপাখীর মত টিকালো নাক। তৃতীয় হচ্ছে, ভূমধ্যসাগরীয় আর্য। এদের গায়ের রঙ শাদা, চুল কালো, চোখের তারা কালো, সাধারণ নাক, এ্যালপাইনদের চাইতে কম উষ্ণ রক্ত ও দেহের কাঠামো মাঝারী আকৃতির। যে সব লোকেরা দক্ষিণ ফ্রান্সে, আরব দেশে ও বল্কান রাষ্ট্রে বাস করে তারা ভূমধ্যসাগরীয় উপগোষ্ঠীর অন্তর্গত।

মঙ্গোলীয়দের পাঁচটি শাখায় ভাগ করা যেতে পারে। প্রথম হচ্ছে নিপ্পন (জাপান)। এদের নাক চ্যাপ্টা, চোয়াল উঁচু ও বড় বড় চেহারা হয়। দ্বিতীয় হচ্ছে মূল চৈনিক। এদের নাক চ্যাপ্টা ও চোখ সরু ও ছোট। তৃতীয় হচ্ছে মালয় শাখা। এদের দেহ ছোটখাট ও নাক চ্যাপ্টা। চতুর্থ হচ্ছে ইন্দো-বার্মান শাখা। এদের নাক চ্যাপ্টা ও দেহ তুলনামূলক ভাবে ৰড়। পঞ্চম হচ্ছে ইন্দোটিবেটান শাখা। এদের নাক চ্যাপ্টা আর এরা দেখতেও বেশ ভাল। এই সব শাখার সব লোকেদেরই গায়ের রঙ হলদে আর তাদের দেহে লোম প্রায় নেই।

অস্ট্রিকদের চেহারা মাঝারী আকৃতির আর তাদের গায়ের রঙ কালো মাটির মত।

নিগ্রোদের গায়ের রঙ কালো, চুল কোঁকড়ানো, মোটা ঠোঁট, আর্যদের তুলনায় কিছুটা কম উষ্ণ রক্ত ও প্রায়শ উচ্চতায় লম্বা।

ভারতে বিভিন্ন জনগোষ্ঠী রয়েছে যাদের মধ্যে আছে ইন্দো-টিবেটান গোষ্ঠী, যেমন-লাদাকী, কিন্নরী, গাঢ়োয়ালী, নেপালী, সিকিমী, ভুটানী, নেওয়ারী, মিজো ও গারো; ভূমধ্যসাগরীয় (আর্য গোষ্ঠী) যেমন-কশ্মীর ব্রাহ্মণ ও শাদা বা লালচে রঙের মানুষ আর দ্রাবিড় (গোষ্ঠী) যেমন-অন্ধ্রপ্রদেশীয়, কর্ণাটকী, কেরলীয় ও তামিল।

প্রাগৈতিহাসিক যুগে সমগ্র উত্তর অর্থাৎ বিন্ধ্য পর্বতের উত্তর থেকে তিব্বত পর্যন্ত সমগ্র অঞ্চলটি ছিল সমুদ্রের নীচে। বিন্ধ্য পর্বতের দক্ষিণ অংশে বর্তমান আরব সাগর, দক্ষিণ আফ্রিকা, অস্ট্রেলিয়া ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া নিয়ে গড়ে উঠেছিল গণ্ডোয়ানা

দ্বীপপুঞ্জ। অস্ট্রিকরা বাস করত গণ্ডোয়ানা ভূমির দক্ষিণাংশে, নিগ্রোরা বাস করত দক্ষিণ–পশ্চিমাংশে ও অস্ট্রিক–নিগ্রো যারা আজকের দ্রাবিড় তারা বাস করত মধ্য অঞ্চলে। বিভিন্ন নৃ–গোষ্ঠীর (ethnic group) জৈব–গোষ্ঠীগত সংরচনা (bio-ra- cial structure) দিয়ে তারা কোন্ জনগোষ্ঠীর সেটা নির্ণয় করা হয়। সাম

সাধারণ নিয়মে একটা সরল সংস্কৃতি একটি দুর্বল সংস্কৃতির ওপর প্রভূত প্রভাব বিস্তার করে। বিভিন্ন সংস্কৃতির মানুষদের ভাষা স্বাভাবিকভাবে (automatically) অন্য শ্রেণীদের ওপর প্রভাব বিস্তার করে। যেমন, যদিও আর্য ও অনার্য সংস্কৃতির মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য ছিল তবুও আর্যদের ভাষার এত প্রভাব ছিল যে পূর্ব ও উত্তর ভারতের সমস্ত ভাষাগুলিকে প্রধানতঃ সংস্কৃতের ওপর নির্ভর করতে হয়েছিল। সংস্কৃতের প্রভাব এত ব্যাপক ছিল যে এমন কি দক্ষিণ ভারতেও দ্রাবিড়ীয় ভাষাগুলির ওপর এই ভাষা খুবই প্রভাব বিস্তার করেছিল। নীচের পরিসংখ্যানে দেখা যায় পূর্ব ও উত্তর ভারতের ভাষাগুলি কী পরিমাণে বৈদিক সংস্কৃতের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিল। বাংলায় সংস্কৃত শব্দ রয়েছে ৯২%, ওড়িয়ায় ৯০%, মৈথিলীতে ৮৫%,

তামিলে ৩% ও মালয়ালমে ৭৫%। উত্তর ভারত থেকে কিছু লোক সমুদ্রপথে মাদ্রাজের পশ্চিমাংশে গিয়ে বসতি স্থাপন করেছিল। সেইজন্যে মালায়ালম ভাষায় সংস্কৃত শব্দের ছড়াছড়ি দেখা যায় যদিও তার ক্রিয়াপদগুলি তামিল ভাষা থেকে এসেছে।

সমাজে উষ্চবর্ণের মানুষদের ওপর আর্যসংস্কৃতির প্রভাব বিশেষ রকমের হলেও অন্যান্য শ্রেণীদের ওপরও তার সাধারণ প্রভাব ছিল। কিছু কিছু অস্ট্রিক জনগোষ্ঠী আছে যেমন–ধাংগৃশ ইত্যাদি যারা ঘরে অস্ট্রিক উপভাষায় কথা বলে কিন্তু পরিবারের বাইরে তারা ভোজপুরী ভাষায় কথা বলে। সেই রকম রাঁচী জেলার সিংমুড়া আর ত্রিপুরার ত্রিপুরীরা ঘরে নিজেদের উপভাষায় কথা বলে ও বাইরে বাংলা ভাষায় কথা বলে। গাড়োয়াল ও কুমায়ুনের লোকেরা তিব্বতী ও চীনা ভাষার পরিবর্তে ইন্দো–আর্য ভাষায় কথা বলতে শুরু করেছে। তামিল, তেলুগু, মালয়ালম, কন্নড় ও তুলু ভাষা দ্রাবিড়ীয় ভাষাগুলির অন্তর্গত। তিব্বতী, চৈনিক ও ইন্দো–চৈনিক ভাষার বর্ণমালা এক, যদিও চৈনিক ও জাপানী ভাষার লিপি চিত্রলিপি। সিংহলের (শ্রীলঙ্কা) অধিবাসীরা সিংহলী ভাষায় (এই ভাষায়

৮৭% সংস্কৃত শব্দ) ও তামিল (৩% সংস্কৃত শব্দ) ভাষায় কথা বলে। গুণতিলক ও বন্দরনায়ক সম্প্রদায়ের লোকেরা বাংলা থেকে সিংহলে (শ্রীলঙ্কা) এসে বসতি স্থাপন করেছিলেন ও সিংহলী সম্প্রদায়ভুক্ত হয়েছিলেন। ৰর্মার লোকেরা বিভিন্ন ভাষায়-বর্মী, কান, কাচীন, শান ও অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ ও কম গুরুত্বপূর্ণ ভাষায় কথা বলে। সিংহলীদের মত তাদের বর্ণমালাও ইন্দো-আর্য বর্ণমালার ভিত্তিতে গড়ে উঠেছে।

ইন্দো-আর্য ভাষাগুলি হচ্ছে মারাঠী, রাজস্থানী, গুজরাটী, পঞ্জাবী, কশ্মিরী, খড়িবলী, ব্রজ, বুন্দেলখণ্ডী, অবধী, ছত্তিশগড়ী, ভোজপুরী, অঙ্গিকা, মগহী, বাংলা, ওড়িয়া, অসমীয়া, গাঢ়োয়ালী, কুমায়ুনী ও গোর্খালী। অস্ট্রিক ভাষাগুলিতে রয়েছে মুণ্ডাভাষাগুলি, সাঁওতালী, কেরাই ও মানখামার উপভাষাগুলি। তিব্বতী-বর্মী ভাষার অন্তর্ভুক্ত হয়েছে অসমীয়া ও মণিপুরী ভাষা আর নাগর উপভাষা বাদে অসমের সমস্ত ভাষা ও উপভাষা। তিব্বতীচৈনিক ভাষায় অন্তর্গত হয়েছে লাদাকী, কিন্নরী, কিরাত, লেপচা, নেওয়ারী, গারো, খাশী ও মিজো। চৈনিক-জাপানী ভাষার অন্তর্গত রয়েছে মান্দারিণচৈনিক,

ক্যান্টোনিজ, জাপানী, কাম্বোডীয়, ইন্দোনেশিয় ও মালয়েশিয় ভাষা ও উপভাষা।

মূলতঃ চার ধরনের লিপি আছে–ইন্দো–আর্য, রোমান, সেমিতিক (গ্রীক ভাষায় আলফা, বিটা, গামা ইত্যাদি তথা হিব্রুভাষায় আলেফ্, বে, গিমেল ইত্যাদি) ও চৈনিক বা চিত্রলিপি। সব চাইতে প্রাচীন লিপি আজ থেকে ৬০০০ ছয় হাজার বৎসর আগে উদ্ভাবিত হয়েছিল যার নাম দেওয়া হয়েছে "সৈন্ধবী" লিপি। খরোষ্ঠী লিপি এর প্রায় ১০০০ এক হাজার বছর পরে এসেছে। ব্রাহ্মীলিপি লেখা হয় বামদিক থেকে ডান দিকে ও খরোষ্ঠী লিপি ডান দিক থেকে বাম দিকে।

কুটিলা লিপি ব্যবহৃত হত এলাহাবাদ ও এলাহাবাদের পূর্বে। বিহার, পূর্ব উত্তরপ্রদেশ, বাংলা, ওড়িষ্যা ও অসমে কুটিলা লিপি ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হত। সম্রাট অশোকের প্রাচীন শিলালিপি ব্রাহ্মী লিপিতে লিখিত হয়েছিল।

এলাহাবাদ, ডাকা (ঢাকা), কলিকাতা, পটনা প্রভৃতি অঞ্চলে প্রাপ্ত শিলালিপিগুলি কুটিলা লিপিতে লেখা রয়েছে। রাজা হর্ষবর্ধন তাঁর শিলালিপিতে ও সরকারী মোহরে কুটিলা লিপি ব্যবহার করেছিলেন বলে পরবর্তীকালে এই লিপি 'শ্রীহর্ষলিপি' নামে পরিচিত হয়। বর্তমানের বাংলা লিপি শ্রীহর্ষলিপি।

'সারদা লিপি' উত্তর-পশ্চিম ভারতে ব্যবহৃত হত আর 'নারদা' বা 'নাগরী' লিপি ব্যবহৃত হত দক্ষিণ-পশ্চিম ভারতে। নাগরী লিপিতে অক্ষরের মাথায় সরলরেখা টেনে মাত্রা দেওয়া হয় না। সেটা যখন দেওয়া শুরু হ'ল তখন তাকে বলা হ'ল 'দেবনাগরী লিপি'। কশ্মীর ও পঞ্জাবের সারস্বত ব্রাহ্মণেরা সারদা লিপি ব্যবহার করতেন আর গুজরাতের নাগর ব্রাহ্মণেরা ব্যবহার করতেন নাগরী লিপি। বর্তমান শ্রীহর্ষলিপির বয়স প্রায় ১৩০০ বৎসর আর নাগরী লিপির বয়স ৩০০ বৎসর।

প্রাচীন ভারতে বৈদিক সংস্কৃত দ্রাবিড়ীয় ও অস্ট্রিক ভাষাগুলোকে অবদমন করার চেষ্টা করেছে ঠিক যেমন ইয়ুরোপে লাতিন ভাষা অন্য সব ইয়ুরোপীয় ভাষাগুলিকে ধ্বংস করার চেষ্টা করেছিল। মধ্যপ্রাচ্যে আরবীভাষা সমস্ত ফার্সী

(পারসিয়ান) ভাষাগুলোকে ধ্বংস করার চেষ্টা করেছিল, আর ভারতে সংস্কৃত ভাষা সমস্ত প্রাকৃত ভাষাকে অবদমন করার চেষ্টা করেছিল। যখন বুদ্ধদেব তাঁর দর্শন পালি ভাষায় প্রচার করতে শুরু করলেন তখন সংস্কৃত পণ্ডিতেরা তাঁকে সংস্কৃত ভাষা ব্যবহার করতে ৰলেছিলেন। কিন্তু ৰুদ্ধ সেই পরামর্শ কানে নেন নি। ভারতে মধ্যযুগে কবীর ভাব প্রকাশের মাধ্যম হিসেবে সংস্কৃত ভাষার ব্যবহারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন–

'সংস্কৃত কূপোদক ভাখা বহতা নীর'

সংস্কৃত কূপের বদ্ধ জলের মত আর জনগণের মুখের ভাষা শুদ্ধ প্রবহমান জলের মত।

ৰঙ্গদেশে সংস্কৃত পণ্ডিতেরা বাংলা ভাষাকে অবদমন করার চেষ্টা করেছিলেন কিন্তু নবাব হুসেন শাহ্ ৰাংলা ভাষার উন্নতি কল্পে সবরকমের সাহায্য ও উৎসাহ দিয়েছিলেন। তখনও পর্যন্ত রামায়ণ, মহাভারত ও ভাগবত সংস্কৃতেই লিখিত ছিল।

পরবর্তীকালে, কবি কৃত্তিবাস, কবি কাশীরাম দাস ও কবি মালাধর বসু (গুণরাজ খাঁ) যথাক্রমে রামায়ণ, মহাভারত ও ভাগবত ৰাংলায় অনুবাদ করেন। সংস্কৃত পণ্ডিতেরা রটিয়ে দেন যে নবাব হুসেন শাহ্ নাকি হিন্দুধর্মকে ধ্বংস করার ষড়যন্ত্র করছেন কারণ হিন্দুদের পবিত্র ধর্মশাস্ত্রগুলিকে সংস্কৃতে না রেখে বাংলায় অনুবাদ করানো হচ্ছে। তাঁরা কৃত্তিবাস ওঝাকে সামাজিক বয়কট ও হিন্দুধর্ম থেকে বহিষ্কার করেছিলেন। এটা আজ থেকে প্রায় ৪৫০ বৎসর আগে ঘটেছিল। সাম্প্রতিক কালে কানাডা ও ওয়েলসের কিছু মানুষ তাদের ভাষার ওপর ইংরেজীকে চাপিয়ে দেবার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছিলেন কারণ তাঁরা তাঁদের নিজস্ব ভাষাকে ভাবপ্রকাশের মাধ্যম হিসেবে চেয়েছিলেন। সেইরকমে ভোজপুরী, মৈথিলী, মগহী, ছত্তিশগঢ়ী [এই প্রবচনের পরে ছত্তিশগঢ় নামে স্বতন্ত্র রাজ্যের সৃষ্টি হয়েছে–সম্পাদক], অঙ্গিকা, অবধী, বুন্দেলখণ্ডী, মারোয়ারী, কোঙ্কনী ও আরও অনেক গুরুত্বপূর্ণ ভারতীয় ভাষা বিভিন্ন কায়েমী স্বার্থবাদীদের দ্বারা অবদমিত হচ্ছে।

ধর্মমত (Religion)

পৃথিবীর সকলে একই ধর্মমত (religion) পালনও করে না আর ধর্মমত মানব সমাজ গঠনের কোন সাধারণ উপাদানও (factor) নয়। বরং ব্যাপারটা এর উল্টো। ধর্মমত প্রায়ই মানব সমাজকে বিভক্ত করে দেয়। ধর্মমতের (religion) আরবি সমার্থক শব্দ "মজহব", আর ব্যুৎপত্তিগত অর্থে ধর্ম বলতে বস্তু বা জীবের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য বা গুণ বোঝায়। বাস্তবিক পক্ষে যদি ধর্মকে তার যথার্থ অর্থে গ্রহণ করা হয় তাহলে দেখা যায় সমগ্র মানবজাতির ধর্ম এক ও অভিন্ন। ধর্ম একটি মানস-আধ্যাত্মিক শক্তি (psycho-spiritual faculty)। এটা পর্যায়ক্রমে মানুষের অন্তরস্থিত প্রসুপ্ত দেবত্বের অভিস্ফুরণ ঘটায় ও মানুষকে পরমাস্থিতি অর্জনে সাহায্য করে। এতে কোন উপকরণের প্রয়োজন নেই। অন্যদিকে, ধর্মমত (religion) হচ্ছে একটা মনস্তাত্ত্বিক ভাবাবেগ (psycho-sentimental factor)। এটা জাগতিক ও প্রথাগত অনুষ্ঠান পালনের বিধিব্যবস্থার সমষ্টি মাত্র। ধর্মমত (religion) অনেক থাকতে পারে কিন্তু ধর্ম সকলের একটাই।

ধর্মমত সবসময়ই নানা রকমের আচার-আচরণ পালনের ব্যবস্থাপত্র দিয়ে থাকে- যেমন, বিশেষ উপায়ে প্রদীপ জ্বালানো,

বিশেষ উপায়ে বাতি ধরা, একভাবে বসা বা অন্যভাবে দাঁড়ানো, নির্দিষ্ট সংখ্যক মালাজপ ইত্যাদি ইত্যাদি। শুধুমাত্র অনুমোদিত ব্যষ্টিদের বিশেষ বিশেষ দেব-দেবীদের পূজারী করে আনা, তাদের জন্যে নির্দিষ্ট অঙ্কের প্রণামীর ব্যবস্থা করা, দেব-দেবীদের জন্যে শাস্ত্রে নির্ধারিত পশু বলির আয়োজন করা, বেদীগুলোকে একটা বিশেষ রকমে বানানো এই সমস্ত ও আরও কত রকম কাজে মন ব্যতিব্যস্ত থাকে। এই সব করতে করতে মন ধর্মানুষ্ঠানের রীতিনীতি ও পার্থিব বিষয়ে আৰদ্ধ হয়ে যায়। তাই কীভাবে সে ভক্তিস্রোতে ভেসে তার আরাধ্য লক্ষ্যের দিকে ছুটে যেতে পারবে? একটা বিশেষ ধর্মমতের অনুগামীদের নির্দিষ্ট সংখ্যকবার হাঁটু গেড়ে বসতে হয় ও উঠতে হয় ফলে স্বাভাবিকভাবেই সবসময়ই তাদের কতবার বসা-ওঠা হল তার হিসেব রাখতে হয়, আর তার ফলশ্রুতি হিসেবে তাদের মন অঙ্গ সঞ্চালন ও বাহ্যিক কর্মানুষ্ঠানের উর্দ্ধে উঠতে পারেনা।

কিছু মানুষ আছে যারা একান্তভাবে বিশ্বাস করে যে মন্দিরগুলিই একমাত্র পবিত্র স্থান, মসজিদ, গীর্জা ও সিনাগগগুলি নয়। আবার অন্য ধর্মমতের অনুসারীরা শুধুমাত্র নিজেদের ঈশ্বরের প্রিয়পাত্র বলে মনে করে ও অন্যদের কাফের

বা ঈশ্বরে অবিশ্বাসী ৰলে বিচার করে। কিন্তু কীভাবে পাথর, ইট, প্রস্তর খণ্ড প্রভৃতি পবিত্র বা অপবিত্র হতে পারে? সেগুলো তো বস্তু মাত্র। যে–সব রাজমিস্ত্রী ও কাঠমিস্ত্রী মন্দির তৈরী করতে নিযুক্ত হয়েছিল তাদের বেশীর ভাগই ছিল তথাকথিত অন্য ধর্মমতাবলম্বী। তবুও মন্দির নির্মাণ সম্পূর্ণ হলেই সেটা পবিত্র ৰলে ঘোষিত হ'ল। তখন তাদেরই ধর্মমতের নীতি অনুসারে এটা বিবেচিত হ'ল না যে কারা এটাকে তৈরী করেছে। এটা কি হাস্যকর নয়?

ধর্মমত বাহ্যিক ক্রিয়া অনুষ্ঠানের ওপর আধারিত। সুতরাং সে সবেতে জাগতিক বস্তুই প্রাধান্য পায়। কালক্রমে সেই বস্তুই লোকের আরাধ্য হয়ে ওঠে। এই গোরুর উদাহরণই নাও না কেন। হিন্দুরা গোরুকে খুব পবিত্র বলে মনে করে কারণ গোরু দুধ দেয়। এখন, গোরু যদি দুধ দেয় বলে পবিত্র বিবেচিত হয় তাহলে মহিষের বেলায় কী হবে? কেননা, মহিষ তো আরও বেশি দুধ দেয়! মহিষকে তো গোরুর চাইতেও বেশি পবিত্র বলে মনে করা উচিত। ধর্মমতীয় ভাবজড়তার (dogma) অনুগামীরা কিন্তু এ ধরনের আলোচনা একদম পছন্দ করে না। ধর্মমতের ভাবনায় মানুষের মন জড়ত্ব প্রাপ্ত হয়।

সূচীপত্র

কোন রকম ৰৌদ্ধিক আলোচনা বা যুক্তিতে সেই মানসিক জড়তা দূর হয় না। শৈশব থেকেই মানুষের মনে অনেক অযৌক্তিক ধারণা ঢুকিয়ে দেওয়া হয়। এর ফলে যখন তারা বড় হয়ে ওঠে তখন তাদের মন থেকে সেই সব ৰদ্ধমূল ধারণাগুলি দূর করা অত্যন্ত কঠিন হয়ে পড়ে। যেমন, বিজ্ঞানের ছাত্ররা ভালভাবেই জানে যে সূর্যগ্রহণ ও চন্দ্রগ্রহণের বৈজ্ঞানিক কারণ কী ও এতে পৌরাণিক দানব রাহু ও কেতুর কোন ভূমিকা নেই। তবুও সেই পুরোণো সংস্কারের কারণে অনেকে গ্রহণের দিন গঙ্গায় যান ও পুণ্যস্নান করেন। এটা কি সেই ৰদ্ধমূল ধর্মীয় বিশ্বাসের জন্যে হচ্ছে না?

যখন লোকের মনে কোন ধারণা এমন ভাবে গেঁথে যায় যে তারা কোন রকম আলাপ–আলোচনা বা যুক্তি শুণতে চায় না তখন সেটাকে বলা হয় 'অন্ধবিশ্বাস'। ৰলা হয়ে থাকে যে এটা ধর্ম বিশ্বাসের ব্যাপার, যুক্তির নয়। ভারতে এরকম অনেক ধর্মান্ধ ব্যষ্টি আছেন। ধর্মান্ধতা ও গোঁড়ামির কারণে অতীতে অসংখ্যবার দাঙ্গা–হাঙ্গামা হয়েছে। সামান্য একটা চুলের অজুহাতে হাজার হাজার লোক নিহত হ'ল। এটা কত বিশ্রী ব্যাপার (repugnant) ৰলত? এই সব ধর্মান্ধরা অন্যদের

ভাবভাবনায় কাণ দেয় নি। আর, তাছাড়া অন্যদের বক্তব্য শোণা তাদের কাছে পাপ বলে গণ্য হয়। এক হিসেবে তারা পশুদের চাইতেও অধম কারণ পশুরা সাম্প্রদায়িক মনোভাব পোষণ করে না। এই ধরনের ধর্মমতের অভিপ্রকাশে জাগতিক ভাবাবেগই প্রধান হয়ে ওঠে। মানুষকে সবসময় ধর্মমতের ৰন্ধন থেকে দূরে থাকতে হবে। সমস্ত ধর্মমতের ভাবজড়তার পেছনে জাগতিক ব্যাপারস্যাপারগুলি প্রকট হয়ে ওঠে। একটা সম্প্রদায় গোরুর মাংস খাওয়া পাপ বলে মনে করে কিন্তু ছাগল বা হরিণের নয়। ভারতীয় মানবসমাজকে কি ভাবে একতাবদ্ধ করা যাবে নারীদের কপালে ও সিঁথিতে সিঁদুর দেওয়ার প্রথা ধর্মীয় ভাবাবেগের একটা অভিপ্রকাশ। অন্য দেশের নারীরা এই প্রথা মানেন না। যদি সমস্ত ভারতীয় মহিলারা এই প্রথা মানা বন্ধ করে দেনও সেটা এমন কিছু সাংঘাতিক ব্যাপার হবে না। সমস্ত ধর্মমতই ধর্মীয় ভাবাবেগে সুড়সুড়ি দিয়ে মানুষকে শোষণ করে থাকে।

অনেক মানুষ আছেন যারা বিশেষ বিশেষ শাস্ত্রগ্রন্থের পূজো করে থাকেন। এই গ্রন্থগুলির বেশিরভাগই ছাপা ও বাঁধাই–এর কাজ অন্য ধর্মমতাবলম্বীর লোকেরা করে থাকে। কোনো শাস্ত্রীয়

গ্রন্থ প্রকাশিত হওয়া মাত্র হিন্দুরা তাকে দেবী সরস্বতী হিসেবে গণ্য করেন। অনেক লোক আছেন যাঁরা বিপুল ব্যয়ে মূর্ত্তি তৈরী করেন ও তারপর একদিন কি দুইদিন সেটাকে পূজো করার পর বিরাট শোভাযাত্রা সহকারে ও বিপুল উন্মাদনায় সেই মূর্ত্তিকে নদীতে বিসর্জন দেন। যদি অন্য কোন ধর্মমতাবলম্বী ব্যষ্টি আকস্মিক কোনো দুর্ঘটনাবশতঃ সেই মূর্ত্তির কোন অংশ ক্ষতিগ্রস্ত করে ফেলেন তবে অকল্পনীয় অনভিপ্রেত ঘটনা ঘটে যেতে পারে।

মতান্ধতা তখনই দেখা দেয় যখন মানুষের সুস্থ বিচারবুদ্ধির তুলনায় স্থূলবিষয়গুলি বেশী প্রাধান্য পায়। যখন এই মতান্ধতা কোন ধর্মমতে কেন্দ্রীভূত হয় তখন ধর্মমতান্ধতার উদ্ভব হয়। ধর্মমতান্ধ ব্যষ্টিদের সঠিক পথে আনয়ন করতে হলে বলপ্রয়োগের পরিবর্তে তাদের কাছে ৰৌদ্ধিক আবেদন করতে হৰে, কারণ বলপ্রয়োগের প্রতিক্রিয়ায় ধর্মমতান্ধতা আরও প্রৰল হয়ে উঠৰে।

কোনও কোনও সামাজিক ব্যবস্থা আদিতে নিছক লোকাচার বা প্রথা ছিল। সেগুলো মোটেই ধর্মীয় অনুষ্ঠান ছিল না।

সূচীপত্র

ইহুদিরা মুশার আবির্ভাবের অনেক আগে থেকেই ছুন্নৎ (লিঙ্গাগ্রের চর্মচ্ছেদন) অনুষ্ঠান শুরু করে। যখন মুশা (Moses) তাঁর সমসাময়িক কিছু ব্যক্তিদের ইহুদি ধর্মে ধর্মান্তরিত করেছিলেন আর পরবর্তীকালে মহম্মদ যখন কিছু স্থানীয় লোকদের ইসলাম ধর্মে ধর্মান্তরিত করেন তখন দুজনেই তাঁদের নব–অনুগামীদের এই প্রথাটিকে ত্যাগ করার নির্দেশ দেবার সাহস পান নি। এর ফলে ধর্মান্তরকরণের পরেও [এই দুইটি ধর্মমতে] সেই প্রাচীন প্রথাটা চালুই থেকে গেল। প্রাচীনকালে অস্ট্রিকরা সূর্যের পুজো করত কারণ তারা বিশ্বাস করত যে সূর্যদেব তুষ্ট হলে তিনি প্রচুর বৃষ্টি দেবেন ও তাতে ফসল খুব ভাল হৰে। অস্ট্রিক সমাজে নারীর স্থান ছিল খুব উচ্চে আর এই জন্যেই সেখানে পুরোহিতদের ভূমিকার বিশেষ কোন গুরুত্ব ছিল না। অস্ট্রিকরা বিশ্বাস করত যে সূর্য একজন দেবী ও চন্দ্র একজন দেবতা। সেইজন্যে তারা সূর্যকে মাতা বলে সম্বোধন করত। তারা ছটপূজা ৰলে সূর্যদেবীর উপাসনার প্রবর্তন করেছিল। প্রাচীনকালে লোকে বছরে একবার সূর্যদেবীর পুজো করত কিন্তু মগধে এই পুজো বছরে দুবার হত, দুটো প্রধান ফসলের সময়। মগধের অধিবাসীদের মধ্যে ছটপূজার ঐতিহ্য এত দৃঢ় হয়ে উঠেছিল যে আর্য, ৰৌদ্ধ ও মুসলমানদের প্রবল

প্রতাপ সত্ত্বেও ছটপূজার প্রথা অপরিবর্তিত থেকে গিয়েছিল। এমন কি আজও মগধের কোনো কোনো এলাকায় মুসলমানরাও ছটপূজা করে। কোথাও তারা নিজেরাই এই পূজা করেন আর কোথাও বা হিন্দুদের দিয়ে করান। সেই রকম ৰাঙলাতেও মুসলমানরা দেবতা সত্যনারায়ণ ও দেবী ওলাবিবির পূজো করেন। এগুলো ঐতিহ্যগত বিশ্বাসের অভিপ্রকাশ যা প্রজন্ম থেকে প্রজন্মান্তরে চলে এসেছে।

ধর্মমতান্ধতার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করার একমাত্র উপায় হচ্ছে যুক্তিবাদী আন্দোলনকে আরও শক্ত করা। বিজ্ঞান শিক্ষায় আমরা জেনেছি যে গ্রহণ একটি প্রাকৃতিক ঘটনা মাত্র। রাহু ও কেতু উপদেবতার এতে কোন ভূমিকা নেই। যদিও এই ধরনের কুসংস্কার আজকাল ক্রমশঃ হ্রাস পাচ্ছে তবু কিছু কিছু লোক আজও এই পৌরাণিক উপদেবতাদের পূজো করে থাকে কেননা তারা বিশ্বাস করে যে সূর্য ও চন্দ্রকে গ্রহণমুক্ত করতে হলে এই দেবতাদের সন্তুষ্ট করতে হবে। এর কারণ হচ্ছে মানুষের মনে ভয় বৃত্তিটা যুক্তির চাইতে অনেক বেশি প্রৰল। যখন মানুষের বিচার বোধ (rationality) আরও বেশি দৃঢ় হবে তখন সমাজ থেকে এই সমস্ত কুসংস্কার দূর হয়ে যাবে।

সূচীপত্র

অনেক লোকে আজকাল ধর্মরাষ্ট্র গড়ার কথা বলে থাকেন। কিন্তু 'ধর্মরাষ্ট্র' শব্দটি ব্যবহার করলেও তাঁরা আসলে ধর্মমত ভিত্তিক রাষ্ট্রের কথা বলে থাকেন, ন্যায় ধর্মভিত্তিক রাষ্ট্রের কথা নয়। আমাদের এমন রাষ্ট্র গড়তে হবে যেখানে প্রকৃত ধর্ম প্রতিষ্ঠিত হবে আর এর জন্যে ধর্মমতের মূল ভিত্তি জাগতিক ভাবাবেগকে (physical sentiments) গুরুত্বহীন করতে হবে। জনগণকে ভাবজড়তা ভিত্তিক ধর্মমতাদর্শ থেকে দূরে থাকতেই হবে। কিছু মানুষ ধর্মীয় অনুষ্ঠান পালন করেন যা চাঁদের সঙ্গে সম্পর্কিত। চাঁদকে দেখার পর তাঁদের ধর্মীয় ব্রতপালন শুরু হয়। কিন্তু ভবিষ্যতে যাঁরা চন্দ্রে বাস করবেন তাদের ক্ষেত্রে কী হবে? একমাত্র যুক্তিসম্মত চিন্তাধারা মানুষের মন থেকে ভীতম্মন্যতাকে কাটিয়ে দেবে–বিচারশীলতা (rationality) মতান্ধতাকে পরাভূত করবে।

ভারতে আর্যরা অস্ট্রিক ধর্মকে ধ্বংস করে বৈদিক সভ্যতাকে প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছিল। বৌদ্ধযুগে মগধে, বিশেষ করে নৃপতি বিম্বিসারের রাজত্বকালে

অবৌদ্ধদের ওপর বৌদ্ধধর্ম চাপিয়ে দেওয়া হয়েছিল। পরবর্তীকালে হিন্দুমতাবলম্বীরা জোর করে বৌদ্ধ ও জৈনদের হিন্দুত্বে ধর্মান্তরিত করেছিলেন। মুসলমান যুগে মুসলমান শাসকেরা বল প্রয়োগ করে ভারতে, ইরাণে ও মিশরে ইসলাম ধর্ম চাপিয়ে দিয়েছিলেন। বাস্তবিক পক্ষে সমকালীন মিশর হচ্ছে আরব সভ্যতা ও ইসলাম ধর্মের বিমিশ্রণ। অসংখ্য ইহুদীদের বলপূর্বক খ্রিষ্টানধর্মে ধর্মান্তরিত করা হয়েছিল। ভারতে ব্রিটিশ শাসনে খ্রিষ্টানরা খুবই মনস্তাত্ত্বিক উপায়ে খ্রিষ্ট ধর্মের প্রচার করেছিল ও তার ফলে হাজার হাজার হিন্দু খ্রিষ্টান হয়ে গিয়েছিল। ভারতে ব্রিটিশরা আসার আগে এদেশে খ্রিষ্টান ধর্মমতাবলম্বী প্রায় ছিলই না। মুসলমান রাজত্বকালে অনেক হিন্দু মনস্তাত্ত্বিক চাপ ও বলপ্রয়োগ উভয় প্রকারেই ইসলাম ধর্মমতে ধর্মান্তরিত হয়েছিল। এছাড়াও অনেক হিন্দু ইসলাম ধর্মমতকে গ্রহণ করেছিল এই কারণে যে তারা হিন্দু ধর্মমতের অনেক ত্রুটিবিচ্যুতিতে বীতশ্রদ্ধ হয়ে গিয়েছিল। সেই সময়ে উত্তাল ধর্মমতীয় বিক্ষোভের পাশাপাশি চূড়ান্ত সামাজিক অসাম্যও দেখা দিয়েছিল, আর তার ফলেই অনেক লোক মুসলমান হয়ে গিয়েছিল। আজও কিছু কিছু ধর্মপ্রচারক অশিক্ষা, কুসংস্কার ও

দারিদ্র্যের সুযোগ নিয়ে মানুষকে নিজ নিজ ধর্মমতে ধর্মান্তরিত করে চলেছেন। মধ্যযুগের খ্রিষ্টানদের ক্রুসেড বা ধর্মযুদ্ধ এক ধর্মমতের দ্বারা অপর ধর্মমতকে অবদমন করার একটা জ্বলন্ত উদাহরণ।

(আর. ইউ. প্রবচন, মে, ১৯৭০)

বিকেন্দ্রিত অর্থনীতি

পৃথিবীর বড় বড় নেতাদের আজ সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ আর্থিক বিষয়টি হ'ল কীভাবে দেশের আর্থিক উন্নয়নের মাধ্যমে জনসাধারণের জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন করা যায়। বিশেষ করে সেইসব দেশ যারা আর্থিক দিক দিয়ে পশ্চাৎপদ, তাদের ক্ষেত্রে এটি একটি প্রধান সমস্যা। ব্যাপারটা অত সহজও নয় কেননা অনেক দেশে এখনও সাধারণ মানুষ ও তাদের জীবনধারণের জন্যে প্রকৃতির ওপর নির্ভরশীল। কেবলমাত্র অল্প কয়েকটি

দেশের মানুষ তাদের জ্ঞান ও বুদ্ধিকে কাজে লাগিয়ে নিজেদের আর্থিক সমস্যা সমাধান করতে সক্ষম হয়েছে।

পৃথিবীর অধিকাংশ দেশ, তা সে পুঁজিবাদী বা কম্যুনিষ্ট দেশই হোক-না-কেন, আর্থিক কেন্দ্রীকরণের নীতিই অনুসরণ করেছে। পুঁজিবাদী দেশে যেখানে মুষ্টিমেয় পুঁজিপতির হাতে অর্থনীতি কেন্দ্রীভূত আছে সেখানে কম্যুনিষ্ট দেশে অর্থনীতির একক নিয়ন্ত্রণ করছে পার্টি। দীর্ঘসময় ধরে এই আর্থিক কেন্দ্রীকরণ নীতি অনুসরণ করে তারা (দুই ধরণের দেশ) কি সেখানকার সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রার মান উন্নীত করতে সমর্থ হয়েছে? এই বিষয়টির মূল্যায়ন করতে গেলে দেখতে হৰে যে প্রধানতঃ আর্থিক শোষণ সেসব দেশে সমূলে উৎপাটিত হয়েছে কি না আর সাধারণ মানুষের ক্রমবর্ধমান ক্রয়ক্ষমতার নিশ্চিততা আছে কি না। প্রকৃত সত্য হ'ল এই যে কেন্দ্রিত অর্থনীতিতে আর্থিক শোষণের অবসানের কোন সম্ভাবনাই থাকে না, আর সাধারণ মানুষের আর্থিক সমস্যার স্থায়ী সমাধানও সেখানে হতে পারে না।

সূচীপত্র

যদি ভারতের কথা ধরি তাহলে দেখা যাবে সেখানে সাধারণ মানুষকে কায়েমী স্বার্থবাদীরা বার বার বোকা বানিয়েছে। রাজনৈতিক নেতারা অজস্র প্রতিশ্রুতির বন্যা বইয়ে দিয়েছেন। কিন্তু সেগুলি শেষ পর্যন্ত নিষ্ঠুর ভাঁওতাবাজীতেই পরিণত হয়েছে। আর্থিক কেন্দ্রীকরণের নীতি আসলে যে পুঁজিপতিদের অধিকতর ধনসঞ্চয় করার কৌশল তা ধরা পড়ে গেছে। এতে একদিকে অবিশ্বাসী জনসাধারণকে বশে রাখতে তাদের সামনে যৎকিঞ্চিৎ কিছু প্রাপ্তির আশা ঝুলিয়ে রাখা হয়, অন্যদিকে পুঁজিপতিরা সম্পদের পাহাড় তৈরী করতে থাকে। কেন এরকম হচ্ছে আমরা তা যদি খতিয়ে দেখি তাহলে দেখৰ যে কারণটা স্পষ্ট। দেশের সমস্ত আর্থিক নীতি প্রণয়ন করছে মুষ্টিমেয় মানুষ যারা পুঁজিবাদের স্তম্ভ।

আর্থিক শোষণকে প্রতিহত করতে আর জনসাধারণের দুঃখ-দুর্দশা দূর করতে একটিই উপায় আছে আর তা হ'ল আর্থিক সর্বক্ষেত্রে বিকেন্দ্রীকরণের নীতি রূপায়িত করা। কোন এক স্থান থেকে হাজার হাজার মাইল দূরে কোন শীততাপনিয়ন্ত্রিত ঘরে আরামে বসে সে স্থানটির জন্যে কোন সার্থক পরিকল্পনা রচনা করা সম্ভব নয়। কেন্দ্রিত ব্যবস্থায় সুদূর গ্রামের আর্থিক

সমস্যার সুরাহা কখনই করা যায় না। আর্থিক পরিকল্পনার সূত্রপাত করতে হবে সবচেয়ে নীচের স্তরে যাতে করে সেখানকার স্থানীয় মানুষের অভিজ্ঞতা, দক্ষতা ও বৈবহারিক জ্ঞানকে কাজে লাগিয়ে একটি সামাজিক–অর্থনৈতিক অঞ্চলের সব অধিবাসীর সত্যিকারের কল্যাণ করা যায়। সব রকমের আর্থিক সমস্যার সমাধান তখনই সম্ভব হৰে যখন আর্থিক সংরচনার ভিত্তিভূমি হৰে বিকেন্দ্রিত অর্থব্যবস্থা।

মূল প্রশ্ন হ'ল কীভাবে কেন্দ্রিত অর্থনীতির অস্বাস্থ্যকর প্রভাব থেকে মুক্ত থাকা যায়। প্রকৃত ব্যাপারটা হ'ল এজন্যে বেড়ালের গলায় ঘন্টাটা বাঁধবে কে? যদি কায়েমী স্বার্থবাদীরা শুভবুদ্ধির দ্বারা পরিচালিত না হতে চায় তাহলে তো জনসাধারণকেই নিজেদের হাতে বিষয়টাকে তুলে নিতে হবে। সেক্ষেত্রে তাদের সকলকে একত্রিত করে সর্বদিক দিয়ে অবস্থার চাপ সৃষ্টি করতে হবে। তখন মিলিত শ্লোগান হবে–“শোষণের অবসানে কেন্দ্রিত অর্থনীতি নিপাত যাক; বিকেন্দ্রিত অর্থব্যবস্থা চালু কর।" কারণ বিকেন্দ্রিত অর্থব্যবস্থার মাধ্যমেই জনসাধারণের সার্বিক কল্যাণ সংসাধিত হয় কেননা এই ব্যবস্থায় আর্থিক উন্নয়ন তো সুনিশ্চিত হয়ই, তাছাড়া এর মাধ্যমে ব্যষ্টি ও সমষ্টির মানস–

আধ্যাত্মিক প্রগতির পথও প্রশস্ত হয়। যখন জনসাধারণের জাগতিক ও বৈষয়িক সমস্যার সমাধান একবার হয়ে যায় তখন তারা মানসিক ও আধ্যাত্মিক ক্ষেত্রে তাদের অন্তর্নিহিত সম্ভাবনা বিকশিত করবার বেশী সুযোগ পায়। বিকেন্দ্রিত আর্থিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হলে আর্থিক ও মানস–আর্থিক শোষণের মূলোচ্ছেদে হয় ও ধনী–দরিদ্রের মধ্যেকার পার্থক্য হ্রাস প্রাপ্ত হয়, আর ব্যষ্টি তথা সামূহিক কল্যাণ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পায়। এর ফলেই সমাজের সব মানুষের মানসিক ও আধ্যাত্মিক প্রগতি সুনিশ্চিত হয়।

বিকেন্দ্রিত অর্থব্যবস্থার মূলনীতি সমূহঃ

বিকেন্দ্রিত অর্থ ব্যবস্থার প্রথম নীতিটি হ'ল এই যে একটি সামাজিক অর্থনৈতিক অঞ্চলের সমস্ত সম্পদের নিয়ন্ত্রণ করবে স্থানীয় মানুষ। বিশেষ করে ন্যূনতম প্রয়োজন পরিপূর্ত্তির জন্যে অত্যাবশ্যক পণ্যের উৎপাদনে যেসব আর্থিক সম্পদের প্রয়োজন তা থাকবে স্থানীয় মানুষদের হাতে। স্থানীয় কাঁচা মালের সর্বাধিক উপযোগের মাধ্যমে সেইসব জিনিসেরই উৎপাদন করতে হবে যা একটি সামাজিক অর্থনৈতিক অঞ্চলের আর্থিক

উন্নয়নের পক্ষে আবশ্যক। তাই সেইসব সম্পদের উপযোগ সম্পূর্ণ ভাবে নিয়ন্ত্রিত হৰে স্থানীয় মানুষদের দ্বারা।

স্থানীয় মানুষ তাদেরই ৰলৰ যারা নিজেদের ব্যষ্টিগত সামাজিক-আর্থিক স্বার্থকে, যে সামাজিক-অর্থনৈতিক অঞ্চলের তারা বসবাসকারী, সেখানকার সামাজিক-অর্থনৈতিক স্বার্থের সঙ্গে একাত্ম করে দিয়েছে। স্পষ্টতঃ স্থানীয় জনগণ সম্বন্ধে এই যে ধারণা তার সঙ্গে কোন ব্যষ্টির গায়ের রং, তার জাতপাত, শ্রেণী, সম্প্রদায়, ধর্মবিশ্বাস, ভাষা বা জন্মস্থানের সঙ্গে কোন সম্পর্কই নেই। মূল বিষয়টা হ'ল সংশ্লিষ্ট সামাজিক-অর্থনৈতিক অঞ্চলের প্রতিটি মানুষ তথা পরিবার তাদের ব্যষ্টিগত সামাজিক-অর্থনৈতিক স্বার্থকে সামূহিক স্বার্থের সঙ্গে একাত্ম করতে পেরেছে কিনা। এই ভিত্তিতে যারা স্থানীয় মানুষ ৰলে স্বীকৃত হবে না তারাই বহিরাগত হিসেবে গণ্য হবে। কোন বহিরাগতেরই স্থানীয় আর্থিক কার্যকলাপে বা উৎপাদন তথা বন্টন ব্যবস্থায় নাক গলাবার অনুমতি থাকবে না।

এটা না হলে এক ভাসমান জনসমুদায় তৈরি হবে যারা স্থানীয় এলাকা থেকে সম্পদের বহিঃস্রোত ঘটাবে। ফলস্বরূপ সেই

অঞ্চলটি আর্থিক শোষণের কবলে পড়বে। এতে আর্থিক বিকেন্দ্রীকরণের মূল উদ্দেশ্যই ব্যাহত হবে।

স্থানীয় অঞ্চলের মানুষদের ন্যূনতম প্রয়োজন পরিপূর্তির পরে উদ্বৃত্ত সম্পদ প্রতিভাবানদের মধ্যে তাদের যোগ্যতার মান অনুযায়ী বন্টন করে দিতে হবে। উদাহরণস্বরূপ–ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, বৈজ্ঞানিক ও অন্যান্য বিশেষ গুণসম্পন্ন মানুষ যাঁরা বিভিন্ন কাজে নিয়োজিত আছেন তাঁদের বিশেষ সুবিধা (amenities) দেওয়া প্রয়োজন যাতে তাঁরা সমাজের বৃহত্তর সেবা করতে পারেন। একজন সাধারণ মানুষের যেখানে একটা সাইকেলে কাজ চলে যেতে পারে, সেখানে একজন ডাক্তারের হয়ত চাই মোটরগাড়ী। কিন্তু আর্থিক ব্যবস্থার মধ্যে এমন সুযোগ রাখতে হবে যাতে সকলের ন্যূনতম প্রয়োজন ও প্রতিভাবানদের বিশেষ সুবিধা–এ দু'য়ের মধ্যেকার যে পার্থক্য তা দূর হতে থাকে। সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রার মান বৃদ্ধিতে এক সময় তাদের সাইকেলের পরিবের্ত স্কুটার দিতে হবে। যদিও স্কুটার ও মোটরগাড়ীর মধ্যে পার্থক্য থাকছেই তবুও তো এ দু'য়ের ব্যবধান কিছুটা কম হয়েছে। এই ভাবে স্তরে স্তরে সাধারণ মানুষ ও প্রতিভাবানদের মধ্যেকার দূরত্ব যতখানি

সম্ভব হ্রাস করার বিরামহীন প্রয়াস চালিয়ে যেতে হবে–কিন্তু মনে রাখতে হবে যে তা সম্পূর্ণ ভাবে কখনই দূর হবে না। দু'য়ের মধ্যেকার দূরত্ব যদি বাড়তেই থাকে তাহলে সাধারণ মানুষ আবার বঞ্চনার কবলে পড়বে আর বিশেষ সুবিধার আড়ালে সমাজে শোষণ আবার জেঁকে বসবে। বিকেন্দ্রিত অর্থনীতিতে এই ধরণের ফাঁকফোকর থাকে না। কেননা এই ব্যবস্থায় একদিকে মানুষের ন্যূনতম প্রয়োজনের মান সবসময় বেড়েই চলতে থাকে। অন্যদিকে তেমনি কে কতখানি বিশেষ সুবিধার অধিকারী হবে তা নির্ধারিত হবে সামূহিক কল্যাণের কথা বিবেচনা করে।

বিকেন্দ্রিত অর্থ ব্যবস্থার দ্বিতীয় নীতি হ'ল এই যে উৎপাদনের ভিত্তি হৰে উপভোগ (consumption), মুনাফা (profit) নয়।

পৃথিবীর অধিকাংশ দেশ যে অর্থনৈতিক ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে তা মুনাফা ভিত্তিক অর্থাৎ উৎপাদন করা হয় মুনাফা লাভের জন্যেই। যারা উৎপাদক তারা সেই দ্রব্যের উৎপাদনকে অগ্রাধিকার দেয় যার মাধ্যমে সর্বাধিক মুনাফা অর্জন করা

যায়। তাই সেই প্রকার বস্তুর উৎপাদনেই তুমুল প্রতিযোগিতা চলে। ভারতও এই নিয়মের বাইরে নয়। মানুষের জীবনযাত্রার মান বাড়াতে হলে এক নোতুন উৎপাদন ব্যবস্থার প্রবর্তন করতে হৰে। মুনাফার বদলে উপভোগকে উৎপাদনের মূল প্রেরক-তত্ত্ব বলে স্বীকার করে নিতে হবে।

বিকেন্দ্রিত অর্থ ব্যবস্থায় কোন এক সামাজিক অর্থনৈতিক অঞ্চলে যেসব ভোগ্য সামগ্রী উৎপাদিত হৰে তা স্থানীয় বাজারে বিক্রি হয়ে যাবে। এর ফলে স্থানীয় মানুষের আর্থিক জীবনে কোন অনিশ্চিততা থাকবে না। তদতিরিক্ত স্থানীয় বাজারেই অর্থ সচল থেকে যাৰে ও এই জন্যেই স্থানীয় মূলধনের বহিঃস্রোতও ৰন্ধ হয়ে যাবে। এইভাবে স্থানীয় অর্থনীতিতে আর্থিক বিপর্যয়ের সম্ভাবনা অনেকখানি দূরীভূত হৰে। এই ব্যবস্থায় জনসাধারণের আয় উর্ধ্বমুখী হতে থাকবে ও তাদের ক্রয়ক্ষমতাও বাড়তে থাকৰে। পৃথিবীর কোন আর্থিক ব্যবস্থাতেই মানুষের এই ক্রয়ক্ষমতার ক্রমাগত বৃদ্ধি সম্ভব হয়নি। এর কারণ হ'ল মুষ্টিমেয় কয়েক জনের হাতে আর্থিক ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত থাকা।

বিকেন্দ্রিত অর্থ ব্যবস্থার তৃতীয় নীতি হ'ল উৎপাদন ও বণ্টনের কাজ সর্বাবস্থায় সমবায় দ্বারা পরিচালিত হবে।

অতীতে সমবায়ের ব্যর্থতার প্রধান কারণ হ'ল আর্থিক কেন্দ্রীকরণ। শোষণ, ব্যাপক দুর্নীতি আর জড়বাদ–ভিত্তিক আর্থিক পরিবেশে সমবায় ব্যবস্থা সফল হওয়া খুবই কঠিন। তাই সেখানে জনসাধারণ সর্বান্তঃকরণে সমবায়কে মেনে নিতে পারে না। স্থানীয় বাজারের দখল নেওয়ার জন্যে সমবায়কে একচেটিয়া পুঁজিপতিদের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় নামতে হয়। এতে কাঁচামালের ওপর স্থানীয় মানুষের অধিকার স্বীকৃত হয় না। এই পরিস্থিতির জন্যেই পৃথিবীর অনেক দেশে সমবায় আন্দোলন ব্যাহত হয়েছে।

অন্যদিকে বিকেন্দ্রিত অর্থব্যবস্থা সমবায় সফল হওয়ার অন্যতম প্রধান কারণ হিসেবে বিবেচিত হয়। স্থানীয় কাঁচামালের সহজলভ্যতা সমবায়গুলিতে তার সরবরাহ সুনিশ্চিত করবে আর সমবায় ব্যবস্থায় তৈরী সামগ্রী সহজেই স্থানীয় বাজারে বিক্রি হয়ে যাবে। এই আর্থিক সাফল্য সমবায়ের সদস্যদের মধ্যে সমবায় সম্পর্কে আগ্রহ ও এতে তাদের

যোগদানের ইচ্ছাকে বাড়াবে। এইভাবে স্থানীয় মানুষ আর্থিক নিরাপত্তা পাৰে ও এই কারণে তারা সর্বান্তঃকরণে সমবায় ব্যবস্থাকে গ্রহণ করে নেৰে।

যতখানি সম্ভব কৃষি, শিল্প ও ব্যবসা–বাণিজ্য সমবায়ের মাধ্যমে পরিচালিত হওয়া উচিত। আর্থিক ব্যবস্থার এই ক্ষেত্রগুলিতে ব্যষ্টিগত মালিকানা ধাপে ধাপে বিলোপ করতে হবে। কেবল মাত্র যেখানে উৎপাদনের ধরণ জটিল বা তা ক্ষুদ্র–উদ্যোগ নির্ভর হওয়ায় সমবায় পদ্ধতিতে উৎপাদন সম্ভব নয়, কেবলমাত্র সেসব ক্ষেত্রেই ব্যষ্টি মালিকানা থাকতে পারে। প্রয়োজনীয় ভোগ্য সামগ্রী বন্টনও উপভোক্তা সমবায়ের মাধ্যমে হওয়া উচিত। এছাড়া সমবায়ের জন্যে আরো কিছু রক্ষাকবচের ব্যবস্থাও রাখতে হবে।

সমবায় ব্যবস্থা ছাড়া গতি নেই আর তা একমাত্র বিকেন্দ্রিত অর্থনীতিতেই সম্ভব। তাই বিকেন্দ্রিত অর্থনীতি আর সমবায় অর্থ ব্যবস্থা একে অন্যের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ।

বিকেন্দ্রিত অর্থব্যবস্থার চতুর্থ নীতি হ'ল একটি অঞ্চলের অর্থনৈতিক কার্যকলাপে স্থানীয় মানুষের নিযুক্তি তথা অংশগ্রহণ।

যতক্ষণ পর্যন্ত স্থানীয় অর্থনীতিতে সেখানকার মানুষের সম্পূর্ণ কর্মনিযুক্তি না হচ্ছে ততক্ষণ বেকার সমস্যা কখনই দূর হবে না। স্থানীয় মানুষের চাহিদার ভিত্তিতেই সর্বনিম্ন আবশ্যকতার পরিমাণ নির্ধারিত হৰে, আর তাদের আর্থিক স্বাচ্ছন্দ্যের কথা ভেবে আর্থিক মূল নীতি স্থিরীকৃত হবে। এই নীতি রূপায়িত হলে স্থানীয় অর্থনীতিতে বহিরাগতদের হস্তক্ষেপের সমস্যা থাকৰেই না।

সমবায়ে স্থানীয় মানুষ কাজ পাবে ও এতে তাদের দক্ষতা ও ক্ষমতার পূর্ণ সদ্ব্যবহার হবে। সমবায়ে শিক্ষিত মানুষেরও চাকুরির ব্যবস্থা থাকবে যাতে তারা কর্মের সন্ধানে স্থানীয় এলাকা ছেড়ে না যায় বা গ্রামাঞ্চল থেকে শহরে এসে ভিড় না জমায়।

কৃষির উন্নতিতে বিশেষজ্ঞ ও প্রযুক্তিবিদদের বিশেষ ভূমিকা থাকে। তাই সমবায়ের মাধ্যমে গ্রামের অদক্ষ লোককে প্রশিক্ষণ দিতে হবে যাতে তারা কৃষি ব্যবস্থাকে উন্নীত করতে প্রয়োজনীয় দক্ষতা অর্জন করে নিতে পারে। এছাড়াও স্থানীয় অঞ্চলের সম্পদ ও প্রয়োজনের ভিত্তিতে সব রকমের কৃষিভিত্তিক ও কৃষিসহায়ক শিল্প গড়ে তুলতে হবে আর সেগুলিও পরিচালিত হৰে সমবায়ের মাধ্যমে।

বিকেন্দ্রিত অর্থ ব্যবস্থার পঞ্চম নীতি হ'ল যে–সব ভোগ্য দ্রব্য স্থানীয় ভাবে উৎপাদিত হয় না তা সেই অঞ্চলের বাজারে বিক্রি হতে দেওয়া চলবে না।

যেহেতু বিকেন্দ্রিত অর্থ ব্যবস্থার লক্ষ্য হ'ল স্থানীয় শিল্প বিকশিত করে তোলা আর স্থানীয় জনসাধারণের জন্যে কাজের সুযোগ সৃষ্টি করা, তাই যেসব সামগ্রী সেই অঞ্চলে উৎপন্ন হয় না তা সেখানকার বাজার থেকে যতখানি সম্ভব বহিষ্কৃত করে দিতে হবে। এটা আবশ্যিকভাবে দেখতে হৰে যে স্থানীয় মানুষ যেন তার নিজস্ব এলাকায় উৎপন্ন সব প্রয়োজনীয় ভোগ্য সামগ্রী ব্যবহার করতে পারে। এতেই স্থানীয় অঞ্চলের

অর্থনৈতিক স্বনির্ভরতা সুনিশ্চিত হবে। প্রথম প্রথম হয়তো স্থানীয় ভাবে উৎপন্ন সামগ্রী বাইরে থেকে আমদানি করা পণ্যের থেকে মহার্ঘ হৰে অথবা তা সহজ–প্রাপ্য হবে না, তা সত্ত্বেও সেই অঞ্চলের মানুষ স্থানীয় ভাবে উৎপন্ন বস্তুই ব্যবহার করবে। যদি স্থানীয় ভাবে উৎপন্ন পণ্যদ্রব্য মানুষের চাহিদানুরূপ বা আশানুরূপ না হয়, সেক্ষেত্রে তাৎক্ষণিক ব্যবস্থা নিতে হবে যাতে তাদের গুণমান বাড়ে, দাম কমানো যায় আর স্থানীয় ভাবে সব প্রয়োজনীয় জিনিসের সরবরাহ বৃদ্ধি পায়। এটা না হলে ৰে–আইনি আমদানি ব্যবস্থা গড়ে উঠৰে।

বিকেন্দ্রিত অর্থ ব্যবস্থায় এই নীতির প্রয়োগ খুবই গুরুত্বপূর্ণ। যদি এটা অবহেলা করা হয় তাহলে স্থানীয় শিল্প বসে যেতে থাকৰে। স্থানীয় মানুষের হাত থেকে সেখানকার বাজারের নিয়ন্ত্রণ চলে যাবে আর বেকারি বেড়ে যাবে। অন্যদিকে নীতিগত ভাবে স্থানীয় ভিত্তিতে উৎপন্ন দ্রব্যই যদি বাজারে থাকে তাহলে স্থানীয় শিল্প বেঁচে যাৰে শুধু তাই নয়, স্থানীয় অর্থনীতি শক্তিশালী হবে। অর্থের বহিঃস্রোত বন্ধ হলে যেহেতু তা সংশ্লিষ্ট এলাকাতেই থেকে যাবে তাই সেই অর্থ উৎপাদন বৃদ্ধি আর স্থানীয় মানুষের বিকাশের কাজে ব্যবহৃত হবে।

সূচীপত্র

স্থানীয় ভাবে উৎপন্ন দ্রব্যের চাহিদা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বৃহৎ, মাঝারি ও ক্ষুদ্র শিল্পও ভালভাবে গড়ে উঠবে।

আর্থিক রূপান্তরণ

বিকেন্দ্রিত অর্থব্যবস্থার মূলনীতি অনুসারে কৃষি, শিল্প ও ব্যবসা–বাণিজ্য সংক্রান্ত কর্মপন্থা (policy) নির্ধারণ করতে হবে। এতে সকলের কাজ পাওয়ার অধিকারকে সুনিশ্চিত করতে হবে, স্থানীয় সম্পদ ও সম্ভাবনার সর্বাধিক উপযোগ ও যুক্তিসঙ্গত বন্টনকে অগ্রাধিকার দিতে হবে। আর এইজন্যে মনে রাখতে হবে যে একটি সামাজিক– আর্থিক ইয়ুনিটের অন্তর্ভুক্ত সমস্ত অঞ্চলগুলিতে যেন সমান ভাবে আর্থিক উন্নতি হয়।

কৃষি–উৎপাদন, মূল্য নির্ধারণ আর কৃষিপণ্যের বিক্রয়–এসব সম্পর্কে কর্মপন্থা স্থির করবে সমবায়ের সদস্যরা। স্থানীয় মানুষেরা সমবায় সমিতিগুলিকে নিয়ন্ত্রণ তো করবেই, তার সঙ্গে তারা স্থানীয় সব আর্থিক কার্যকলাপকেও নিয়ন্ত্রণ করবে। স্থানীয় প্রশাসন সমবায়গুলির আর্থিক অবস্থার উন্নতির জন্যে

প্রয়োজনীয় সাহায্য দেবে। সমস্ত কৃষিপণ্যের দাম স্থিরীকৃত হৰে যুক্তিসঙ্গত ভাবে ও নিম্নলিখিত বিষয়গুলির ভিত্তিতেঃ –শ্রমের মজুরী, কাঁচামালের খরচ, পরিবহন ও ষ্টোরেজের খরচ, ক্ষয়ক্ষতি (depreciation), প্রতিপূরক নিধি (sinking fund) ও অন্যান্য। এর অতিরিক্ত এই দামের মধ্যে উৎপাদন ব্যয়ের শতকরা ১৫% মুনাফা হিসেবে ধরতে হবে। বিকেন্দ্রিত অর্থব্যবস্থায় কৃষিকে শিল্পের মর্যাদা দেওয়া হবে।

শিল্পব্যবস্থাও বিকেন্দ্রিত আর্থিক পরিকল্পনার মূল নীতি অনুসারে ঢেলে সাজাতে হবে। যদি দেশের কোন একটি অংশ অতি শিল্পোন্নত হয়, তাহলে তা অন্য অঞ্চলের আর্থিক উন্নয়নে ব্যাঘাত সৃষ্টি করবে। আর্থিক বিকেন্দ্রীকরণ হলে এই অবস্থা আসবে না। সেখানে মূল বা ভারী শিল্প (key industry), মাঝারী শিল্প, আর ক্ষুদ্র শিল্প ভিন্ন ভিন্ন মানুষের দ্বারা পরিচালিত হবে। কেন্দ্রিত অর্থব্যবস্থায়, পুঁজিবাদী হোক বা কম্যুনিষ্ট হোক, এই শিল্পগুলি (ভারী শিল্প) সচরাচর ব্যষ্টিগত উদ্যোগ বা রাষ্ট্রীয় উদ্যোগের মাধ্যমে পরিচালিত হয়। কিন্তু তারা 'না–লাভ–না–ক্ষতি'–নীতি অনুসরণ করে না। অধিকাংশ মাঝারী শিল্প সমবায় দ্বারা পরিচালিত হবে কিন্তু তারা

একচেটিয়া উৎপাদন বা মুনাফা নীতি অনুসরণ করবে না। সমবায় ক্ষেত্রই হবে অর্থব্যবস্থার প্রধান ক্ষেত্র। সমবায়ের মাধ্যমেই স্থানীয় মানুষকে স্বতন্ত্রভাবে সংঘটিত করা যায়, তাদের জীবিকার নিশ্চিততা দেওয়া যায়, আর এতে তাদের নিজেদের আর্থিক কল্যাণকে নিজেরাই নিয়ন্ত্রণ করতে পারে। অধিকাংশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প ব্যষ্টিগত মালিকানায় থাকবে। ক্ষুদ্র শিল্পগুলি, প্রধানতঃ যা অত্যাবশ্যকীয় পণ্য নয়, সেগুলি কিছু কিছু বিলাস দ্রব্যের উৎপাদনে নিয়োজিত থাকবে। এগুলি ব্যষ্টিগত মালিকানাধীন থাকলেও তারা সমবায় ক্ষেত্রের সঙ্গে একটা সঙ্গতি স্থাপন করে চলবে যাতে আর্থিক সাম্য বজায় থাকে।

যদি কুটির শিল্পকে ঠিক ভাবে সংঘটিত করা হয় তাহলে গ্রামের মহিলারা তার মাধ্যমে অর্থের সংস্থান করতে পারবে। কুটির শিল্পগুলিকে কাঁচামাল সরবরাহ করার দায়িত্ব থাকবে সমবায় সমিতি ও স্থানীয় সরকারের হাতে যাতে তারা কাঁচা মালের অভাবে না ভোগে।

শিল্পোৎপাদনের জন্যে যথেষ্ট বিদ্যুৎ শক্তি সরবরাহ করার ব্যবস্থাও করবে স্থানীয় সরকার। একটি সামাজিক-অর্থনৈতিক ইয়ূনিটকে বিদ্যুৎ উৎপাদনে স্বয়ম্ভর হওয়ার লক্ষ্য নিয়ে চলতে হবে। এজন্যে ওই সরকার স্থানীয় ভাবে উৎপন্ন বা সহজে উপলব্ধ বিদ্যুতের ওপর নির্ভর করবে। সেগুলি হ'ল-যেমন, সৌরশক্তি, বায়োগ্যাস, জলবিদ্যুৎ, তাপশক্তি, পরমানুশক্তি, বায়ুশক্তি, ইলেকট্রোম্যাগনেটিক শক্তি ও তরঙ্গ (সমুদ্র) শক্তি। বিদ্যুৎ উৎপাদন একটি মূল শিল্প যা 'না-লাভ-না-ক্ষতি'র ভিত্তিতে পরিচালিত হবে যাতে উৎপাদন ব্যয় কমের মধ্যে থাকে আর সাধারণ মানুষের ক্রয়ক্ষমতা বৃদ্ধিতে সহায়ক হয়। যেমন, যদি ব্যাটারি-উৎপাদন কুটির শিল্পের মাধ্যমে হয় তবে তাদের বিদ্যুৎ সরবরাহ করা হবে 'না-লাভ-না-ক্ষতি'র ভিত্তিতে, কিন্তু ব্যাটারি উৎপাদকেরা তাদের উৎপাদিত দ্রব্যকে উপযুক্ত মানুফাসহ বিক্রী করতে পারবে। এখানে ব্যাটারি উৎপাদনে যে বিদ্যুৎ ব্যবহৃত হল তা শিল্পপণ্য নয়-কাঁচামাল হিেেব গণ্য হবে। সামাজিক ক্ষেত্রে গতিশীলতা বজায় রাখতে সাধারণ পরিবহন, যোগাযোগ ব্যবস্থা, স্কুল-কলেজ-হাসপাতালগুলিতেও বিদ্যুৎ সরবরাহ করা হবে 'না-লাভ-না-ক্ষতি'র ভিত্তিতে। স্থানীয় সরকার বা রাজ্য সরকারের হাতে

দায়িত্ব থাকবে মূল শিল্প হিসেবে বিদ্যুৎ উৎপাদন করে তা সরবরাহ করার।

মূল শিল্প থেকে কুটির শিল্প পর্যন্ত সমস্ত শিল্পোদ্যোগ স্থানীয় মানুষের সহযোগিতার মাধ্যমেই সংঘটিত করতে হবে। স্থানীয় মানুষেরা যাতে এসব ব্যষ্টিগত উদ্যোগে গড়ে তুলতে পারে তার জন্যেও উপযুক্ত ব্যবস্থা করতে হবে। চাকুরিতে স্থানীয় মানুষকে অগ্রাধিকার দিয়ে তাদের সকলকে কর্মে নিযুক্ত রাখতে হবে। এই নীতির ফলে স্থানীয় মানুষদের মধ্যে উদ্বৃত্ত শ্রম বা ঘাটতি শ্রম বলে কিছু থাকবে না। আর যদি বাইরে থেকে অনেকে কাজের জন্যে আসেও তারা স্থানীয় অর্থনীতিতে কোনো স্থান পাবে না। কোনো অঞ্চলে যদি ভাসমান জনগোষ্ঠী থাকে তাহলে অর্থের বহিঃস্রোতকে আটকানো যায় না আর এই কারণে সেখানকার অর্থনৈতিক উন্নয়নও বাধাপ্রাপ্ত হয়।

বিকেন্দ্রিত অর্থ ব্যবস্থায় ব্যবসা বাণিজ্য এমন ভাবে সুসংঘটিত হবে যাতে প্রয়োজনীয় ভোগ্য সামগ্রী উপভোক্তা সমবায়ের মাধ্যমে বন্টিত হয়। আয়কর বলে কিছু থাকা উচিত নয়, তার বদলে প্রতিটি উৎপাদিত বস্তুর ওপর কর বসাতে

হবে। পণ্য দ্রব্য এক সামাজিক–অর্থনৈতিক অঞ্চল থেকে আর একটি সামাজিক–অর্থনৈতিক অঞ্চলে রপ্তানি করা হৰে সমবায়ের মাধ্যমে।

প্রাউটের বিকেন্দ্রিত অর্থ ব্যবস্থায় স্থানীয় কাঁচামালের রপ্তানি সমর্থন করা হয় না। নির্দিষ্ট কিছু পরিস্থিতিতে কেবল তৈরী–পণ্য (finished goods) রপ্তানি করা যেতে পারে। কোনো একটি সামাজিক অর্থনৈতিক অঞ্চলে স্থানীয় মানুষদের সব প্রয়োজনের পরিপূর্তি হয়ে গেলে উদ্বৃত্ত ভোগ্যপণ্য অন্য সামাজিক অর্থনৈতিক অঞ্চলে রপ্তানি করা যেতে পারে; কিন্তু তা সেই ধরণের সামাজিক অর্থনৈতিক অঞ্চলেই রপ্তানি করা উচিত যেখানে সেখানকার মানুষের নিজেদের প্রয়োজন অনুযায়ী সেই সব বস্তুর উৎপাদনে তাৎক্ষণিক সুবিধা নেই বা সম্ভাবনা নেই। এছাড়াও আমদানি রপ্তানির সমস্ত রকম আদান প্রদানের কাজ প্রত্যক্ষ ভাবে সমবায়ের মাধ্যমে নির্বাহ হওয়া উচিত। রপ্তানির পেছনে মুনাফা লাভ করা মূল উদ্দেশ্য থাকৰে না। কোনো সামাজিক অর্থনৈতিক অঞ্চলে যদি মানুষের সর্বনিম্ন আবশ্যকতার পরিপূর্তির জন্যে যথেষ্ট কাঁচামাল না থাকে, তাহলে তা অন্য সামাজিক অর্থনৈতিক অঞ্চল থেকে আমদানি করা যেতে পারে;

সূচীপত্র

কিন্তু সেক্ষেত্রে ভালো করে দেখে নিতে হবে যে, সে কাঁচামাল সংশ্লিষ্ট সামাজিক অর্থনৈতিক অঞ্চলে (যেখান থেকে আমদানি করা হচ্ছে) উদ্বৃত্ত আছে। সামাজিক অর্থনৈতিক অঞ্চলগুলিতে যখন আর্থিক স্বয়ম্ভরতা এসে যাবে তখন অবাধ ব্যবসা-বাণিজ্যকে প্রোৎসাহন দেওয়া হবে কেননা তার ফলে সামাজিক-অর্থনৈতিক অঞ্চলগুলিতে উত্তরোত্তর আর্থিক উন্নয়ন সহজতর হবে। এই ভাবে তাদের মধ্যে আর্থিক সাম্য আসতে থাকবে যা বৃহত্তর সামাজিক অর্থনৈতিক একক গড়তে সহায়ক হবে।

বিকেন্দ্রিত অর্থব্যবস্থার আর একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হ'ল অর্থ সব সময় সচল থাকবে, এর ফলে অর্থব্যবস্থা সর্বদা দ্রুততর গতিতে এগিয়ে চলবে। অর্থের মূল্য নির্ভর করে তার চলমানতার (circulation) ওপর। অর্থ যত বেশী করে হস্তান্তরিত হবে ততই তার আর্থিক মূল্য বাড়তে থাকবে। আর অর্থের মূল্য যত বেশী হবে ততই ব্যষ্টিগত ও সামূহিক জীবনে স্বাচ্ছন্দ আসবে তথা এর মাধ্যমে সর্বাত্মক কল্যাণের পথ প্রশস্ত হবে।

মানুষের আর্থিক স্বাচ্ছন্দ্য আর তাদের মানসিক তথা সাংস্কৃতিক বিকাশ একে অন্যের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ ভাবে সম্পর্কিত। ব্যষ্টিগত ও সামূহিক জীবনে উন্নতি সর্বাত্মক কল্যাণকেই সুনিশ্চিত করবে। যদি স্থানীয় মানুষ তাদের আর্থিক কাজকর্মে নিরাপত্তা অনুভব না করে তবে তারা মানসিক ভাবে দুর্বল হয়ে পড়ৰে, আর এই অন্তর্নিহিত দুর্বলতা তাদের আর্থিক উন্নয়নে বাধাস্বরূপ হয়ে দাঁড়াবে। এই ধরণের জনগোষ্ঠী কায়েমী স্বার্থীবাদীদের হাতে আর্থিক, রাজনৈতিক ও মানস-অর্থনৈতিক শোষণের সহজ শিকার হয়ে পড়বে। এই অবাঞ্ছনীয় পরিস্থিতিকে শক্ত হাতে প্রতিরোধ করতে হবে। এজন্যে স্থানীয় সমস্ত কাজকর্মে ও আদান-প্রদানে স্থানীয় ভাষাকেই ব্যবহার করতে হবে। এর অর্থ হ'ল প্রশাসন, শিক্ষাব্যবস্থা, অর্থনীতি ও সাংস্কৃতিক কর্মধারার মাধ্যম হৰে স্থানীয় ভাষা। একটি সামাজিক-আর্থিক অঞ্চলের সব সরকারী ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠান ও কার্যালয়গুলি যোগাযোগের মাধ্যম হিসেবে স্থানীয় ভাষাকেই ব্যবহার করবে।

বিকেন্দ্রিত অর্থব্যবস্থার চরম লক্ষ্য হ'ল সমাজের সার্বিক কল্যাণ। এটি হ'ল একটি বৃহত্তর আদর্শ ও তা সব সামাজিক-

আর্থিক ইয়ূনিটে প্রতিষ্ঠা করতে হবে। এর ফলেই সত্যিকারের আর্থিক স্বাচ্ছন্দ্য *আসবে* ও তারই পরিণতিতে সমাজের সব সদস্যের মানসাধ্যাত্মিক বিকাশ বেশী করে সুনিশ্চিত হবে।

১৬ মার্চ ১৯৮২, কলকাতা

অর্থনৈতিক গণতন্ত্র

বর্তমান বিশ্বের প্রায় সমস্ত দেশ কোনো–না–কোনো গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার অন্তর্গত।

সূচীপত্র

একদিকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে, ব্রিটেন, ফ্রান্স, কানাডা প্রভৃতি দেশে উদারনৈতিক গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা, অন্যদিকে [তদানীন্তন] রাশিয়া, চীন, বিয়েৎনাম ও পূর্ব ইয়ুরোপের দেশসমূহে সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্রের প্রাধান্য। আপাতঃদৃষ্টিতে উদারনৈতিক গণতন্ত্রের দেশগুলিতে সাধারণ মানুষের অবস্থা কম্যুনিষ্ট দেশগুলির চেয়ে ভাল। এর কারণ হচ্ছে কম্যুনিষ্ট দেশগুলিতে চলেছে পার্টির কর্মকর্তাদের দ্বারা চাপিয়ে দেওয়া রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থা, যার বিষময় ফল হচ্ছে মানুষের অসহনীয় কষ্ট ও দুর্দশা তথা চরম মানস–অর্থনৈতিক শোষণ (psycho-economic exploitation)। উদারনৈতিক ও সমাজতান্ত্রিক এই দুই রকমের গণতন্ত্রকে রাজনৈতিক গণতন্ত্র বলাই সঙ্গত কেননা এরা উভয়েই আর্থিক কেন্দ্রীকরণ নীতির অনুসারী।

যে সমস্ত দেশে বর্তমানে গণতন্ত্র প্রচলিত, সেখানকার জনগণের সঙ্গে প্রতারণা করে তাদের বিশ্বাস করানো হয়েছে যে, রাজনৈতিক গণতন্ত্রের থেকে ভাল ব্যবস্থা আর কিছু হতে পারে না। রাজনৈতিক গণতন্ত্র জনগণকে কাগজে–কলমে ভোটাধিকার দিলেও কেড়ে নিয়েছে অর্থনৈতিক বৈষম্য, জনগণের

ক্রয়ক্ষমতায় এসেছে প্রচণ্ড অসাম্য। সৃষ্টি হয়েছে বেকার সমস্যা, খাদ্য-ঘাটতি, দারিদ্র্য ও সামাজিক সুরক্ষার অভাব।

ভারতে যে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা প্রচলিত তা রাজনৈতিক গণতন্ত্র ছাড়া কিছুই নয়; আর এটা প্রমাণিত সত্য যে এই ব্যবস্থা আসলে একটি চোখ-ধাঁধানো শোষণমূলক ব্যবস্থা। ভারতের সংবিধান তিন শোষক-গোষ্ঠী দ্বারা রচিত-ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী, দেশী সাম্রাজ্যবাদী আর ভারতীয় পুঁজিপতিদের প্রতিনিধিত্ব করা শাসক দল। তাই ভারতীয় সংবিধানের সমস্ত নীতি-নির্দেশনাতে এই সুবিধাভোগীদের কায়েমী-স্বার্থরক্ষা করা হয়েছে। ভারতের কোটি কোটি মানুষ হতদরিদ্র, কুসংস্কারগ্রস্ত ও অশিক্ষিত, আর সেই সুযোগে শোষক-তত্ত্ব বোটের সময় আতঙ্ক সৃষ্টি, শাসনক্ষমতার চরম অপব্যবহার আর ভোট-জালিয়াতি ইত্যাদির মাধ্যমে প্রতিবার নির্বাচনে জিতে ক্ষমতা কুক্ষিগত করে রাখছে। এটি গণতন্ত্রের নামে প্রহসন ছাড়া কিছুই নয়। একবার কোন দল নির্বাচনে জয়ী হয়ে পাঁচ বছরের জন্যে অবাধে দুর্নীতি ও রাজনৈতিক অত্যাচার চালাতে থাকে।

পরবর্তী নির্বাচনে–রাজ্যস্তরের বা কেন্দ্রীয় নির্বাচন যাই হোক–না–কেন–একই অবস্থার অনুবর্তন হতে থাকে।

স্বাধীনতাপ্রাপ্তির পর থেকেই ভারতে এই ধরণের রজনৈতিক সুবিধাবাদ চলে আসছে। গত পঁয়ত্রিশ বছর ধরে [বর্তমান সময় পর্যন্ত প্রায় ৫৯ বছর] রাজনৈতিক ধ্বজাধারীরা একই পাখির বুলি আউড়ে চলেছে যে, ইয়ুরোপ বা অন্যান্য শিল্পোন্নত দেশের মত আর্থিক বিকাশ নিশ্চিত করতে ভারতে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা কায়েম থাকা ছাড়া গত্যন্তর নেই। এই যুক্তিকে প্রতিষ্ঠিত করতে তারা আমেরিকা, ব্রিটেন অথবা চীন বা সোভিয়েত রাশিয়ার দৃষ্টান্তকে টেনে আনে। নির্বাচনের সময় রাজনৈতিক নেতারা নির্বাচকমণ্ডলীকে নিজেদের অনুকূলে এই বলে প্ররোচিত করে যেন এর পরেই দেশের নিরন্ন ও নিপীড়িত জনসাধারণ 'সত্যিকারের' আর্থিক উন্নয়নের সুফল পাৰে। কিন্তু নির্বাচন নিষ্পন্ন হবার পর মুহূর্ত থেকেই রাজনৈতিক গণতন্ত্রের নামে সাধারণ মানুষের ওপর চলতে থাকে সেই একই অবাধ শোষণ ও অত্যাচার। এর সঙ্গে চলতে থাকে সামাজিক জীবনের বিভিন্ন দিকে চরম অবহেলা ও বঞ্চনা। আজ কোটি কোটি ভারতীয় নাগরিক সর্বনিম্ন প্রয়োজনপূর্তি থেকে বঞ্চিত; একদিকে তারা

খাদ্য–বস্ত্র–শিক্ষা–আবাস– চিকিৎসার ব্যবস্থা করতে প্রতি মুহূর্তে তীব্র সংগ্রাম করে চলেছে, আর অন্যদিকে মুষ্টিমেয় কিছু সুবিধাভোগী মানুষ উপচে ওঠা বিত্তসম্ভার আর বিলাসিতার স্রোতে গা ভাসিয়ে রয়েছে।

গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার ত্রুটিগুলির মধ্যে একটি প্রধান ত্রুটি হচ্ছে প্রাপ্তবয়স্কের বোটাধিকার অর্থাৎ বোট দেবার অধিকার বয়সের ওপর নির্ভরশীল। একটি নির্দিষ্ট বয়ঃপ্রাপ্তির পরেই ধরে নেওয়া হয় নির্বাচনের সময় তারা নিজেরাই সবকিছু ঠিকমত বিচার–বিশ্লেষণ করে উপযুক্ত প্রার্থীকে নির্বাচিত করতে সক্ষম। কিন্তু বাস্তব চিত্র হচ্ছে এই যে প্রাপ্তবয়স্ক অধিকাংশ মানুষেরই নির্বাচনে কোন আগ্রহ তো থাকেই না, আবার তাদের মধ্যে অনেকেই সমকালীন সামাজিক ও অর্থনৈতিক বিষয়গুলি সম্বন্ধে সচেতনও নয়। অধিকাংশ ক্ষেত্রে এরা প্রার্থীবিচার না করে পছন্দসই দলকেই বোট দেয়, তারা রাজনৈতিক নেতাদের প্রচারের কূটকৌশল আর মিথ্যা অঙ্গীকারের বন্যায় প্রভাবিত হয়ে পড়ে। অথচ যারা তখনও প্রাপ্তবয়স্ক হয়নি তাদের মধ্যে অনেকই হয়তো বোটাধিকার প্রাপ্তদের চেয়ে উপযুক্ত প্রার্থী

নির্বাচনে বেশী সক্ষম। তাই নির্দিষ্ট বয়সসীমা বোটাধিকারের মাপকাঠি হতে পারে না।

কে নির্বাচিত হবে সেটা নির্ভর করে সে কোন্ রাজনৈতিক দলের অন্তর্ভুক্ত, রাজনৈতিক দাদাগিরি আর নির্বাচনে দেদার খরচ করার ক্ষমতার ওপর। অনেক ক্ষেত্রে এটা আবার নির্ভর করে অসামাজিক কাজকর্মের ওপর। পৃথিবী জুড়ে নির্বাচন প্রক্রিয়ায় আর্থিক শক্তিরই রমরমা, প্রায় সবক্ষেত্রেই আর্থিক ক্ষমতাবান আর বাহুৰলীদেরই নির্বাচিত হবার একচেটিয়া অধিকার। যে সমস্ত দেশে বোটদান আবশ্যিক নয় সেখানে জনসাধারণের এক ক্ষুদ্র অংশই নির্বাচন প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করে।

গণতন্ত্র সফল হবার প্রাক্শর্তগুলি হচ্ছে–নৈতিকতা, শিক্ষার প্রসার আর সামাজিক–অর্থনৈতিক–রাজনৈতিক সচেতনতা। নেতৃত্বের পদে যারা আসীন তাদের নৈতিক মান অবশ্যই অনেক উঁচুতে থাকতে হবে, না হলে সামাজিক কল্যাণ ব্যাহত হতে বাধ্য। কিন্তু আজ অধিকাংশ গণতান্ত্রিক দেশে দুর্নীতিগ্রস্ত ও

কায়েমী স্বার্থবাদীরাই নির্বাচিত হয়। এমনকি কুখ্যাত খুনী ও ডাকাতি–মাফিয়া নির্বাচনে জিতে সরকারে অংশগ্রহণ করে।

পৃথিবীর প্রায় সবদেশেই সাধারণ মানুষের রাজনৈতিক সচেতনতার অভাব। চতুর ও তুখোড় রাজনীতিবিদরা এই ব্যাপারটা খুব ভাল করেই বোঝে, তাই তারা সহজেই জনসাধারণকে বিভ্রান্ত করে ক্ষমতা দখল করে নেয়। এরা ঘুষ, ছাপ্পাভোট, বুথ দখল, বোট কেনা–এইসব ব্যাপারে সিদ্ধহস্ত। আর এভাবেই তারা প্রায় বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচনে জয়লাভ করে। এইজন্যেই আজ সমাজে নৈতিকতার মান তলানিতে গিয়ে ঠেকেছে, সৎ ও যোগ্য লোকেদের এখানে কোন স্থানই নেই। নীতিবাদীদের নির্বাচনে জেতার কোন সুযোগই থাকে না, কেননা নীতিহীন লোকেরা অর্থের জোরে নির্বাচন–বিধিকে কলা দেখিয়ে, ভীতিপ্রদর্শন আর প্রয়োজন অনুসারে পাশবিক শক্তিকে কাজে লাগিয়ে জয়কে ছিনিয়ে নেয়। আজকের গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় সমস্ত রকমের অনৈতিকতা আর ভ্রষ্টাচারের ঢালাও সুযোগ। এইভাবে সমাজের অস্তিত্বটাই বিকৃত ও অর্থহীন হয়ে যায়। এহেন ব্যবস্থায় স্বভাবতই শুধু পুঁজিপতিদেরই রমরমা, শাসনব্যবস্থা · নীতিহীনতা আরও পাপাচারের কবলে চলে যায়।

এই অসার গণতন্ত্র পুতুলনাচের সঙ্গে তুলনীয় যেখানে মুষ্টিমেয় ক্ষমতালোভী রাজনীতিবিদরা পর্দার আড়াল থেকে কলকাঠি নাড়তে থাকে। উদারনৈতিক গণতন্ত্রে পুঁজিপতিরা বিভিন্ন গণমাধ্যম যেমন–রেডিও, টেলিবিশন, পত্রপত্রিকা ইত্যাদিকে হাত করে নিয়ে নিজেদের অসদুদ্দেশ্যকে রূপায়িত করে; আর সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্রে আমলাতান্ত্রিকতা দেশকে ধ্বংসের কিনারে নিয়ে যায়। এই উভয়বিধ গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাতেই সমাজের সৎ ও যোগ্য নেতাদের উঠে আসার প্রায় কোন সুযোগই থাকে না; তাই জনসাধারণের অর্থনৈতিক স্বাধীনতাপ্রাপ্তি সুদূরপরাহতই থেকে যায়।

পৃথিবীতে তাই রাজনৈতিক গণতন্ত্র এক ধোঁকাবাজিতে পরিণত হয়েছে। এই ব্যবস্থায় দেশের শ্রীবৃদ্ধি, অর্থনৈতিক–সামাজিক সাম্য, শান্তি আর সুস্থিতি সম্পর্কে কেবল স্তোকবাক্য বা ফাঁকাবুলিই শোণানো হয়; কিন্তু বাস্তবে এই ব্যবস্থা শুধু অপরাধীদেরই সংখ্যা বাড়িয়ে চলে, শোষণকে প্রশ্রয় দেয়, আর জনসাধারণকে চরম দুঃখ–দুর্দশার মধ্যে ঠেলে দেয়।

রাজনৈতিক গণতন্ত্রের অবসানের দিন সমাগতপ্রায়। প্রাউটের দাবী হচ্ছে–রাজনৈতিক গণতন্ত্র নয়, অর্থনৈতিক গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা। প্রাউটের মতে গণতন্ত্র সফল হবার প্রকৃত পন্থা হচ্ছে আর্থিক ক্ষমতা জনগণের হাতে ন্যস্ত করা আর তাদের সর্বনিম্ন প্রয়োজনপূর্তিকে সুনিশ্চিত করা। জনসাধারণের অর্থনৈতিক মুক্তিকে বাস্তবায়িত করার এটাই একমাত্র উপায়। প্রাউটের শ্লোগান হচ্ছে–"রাজনৈতিক গণতন্ত্রের ধাপ্পাবাজি নয়; আমরা চাই অর্থনৈতিক গণতন্ত্র, শোষণমুক্ত সমাজ"।

আর্থিক বিকেন্দ্রীকরণ

অর্থনৈতিক গণতন্ত্রে (economic democracy) আর্থিক ও রাজনৈতিক ক্ষমতা দুইভাগে বিভাজিত থাকে। অর্থাৎ প্রাউটের নীতি হচ্ছে রাজনৈতিক কেন্দ্রীকরণ কিন্তু অর্থনৈতিক বিকেন্দ্রীকরণ। রাজনৈতিক ক্ষমতা নীতিবাদীদের হাতে কিন্তু অর্থনৈতিক ক্ষমতা ন্যস্ত থাকবে জনসাধারণের কাছে। শাসনব্যবস্থার মূল লক্ষ্য হচ্ছে জনগণের আর্থিক প্রয়োজনপূর্তির পথে সমস্ত বাধা আর অসুবিধাকে দূর করা। অর্থনৈতিক

গণতন্ত্রের সার্বজনীন লক্ষ্য হচ্ছে সমাজের সর্বস্তরের মানুষকে ন্যূনতম প্রয়োজনপূর্তির গ্যারান্টি দেওয়া।

পৃথিবীর সকল অঞ্চলের জন্যেই প্রকৃতি অকৃপণ হাতে অঢেল প্রাকৃতিক সম্পদ ঢেলে দিয়েছে। কিন্তু সমাজের সকল সদস্যের মধ্যে এই সম্পদসম্ভার ন্যায়সঙ্গতভাবে বণ্টন করার কোন নীতি–নির্দেশনা প্রকৃতি প্রদান করেনি। সমাজের জ্ঞানবুদ্ধি সম্পন্ন মানুষকেই এই গুরুদায়িত্ব পালন করতে হবে। যারা দুর্নীতিগ্রস্ত, স্বার্থপরতা ও নীচ মানসিকতা দ্বারা পরিচালিত তারা এইসব সম্পদ সমগ্র সমাজের কল্যাণের কাজে তো লাগায়ই না; বরং তারা তো নিজের ক্ষুদ্রস্বার্থ বা গোষ্ঠীর ক্ষুদ্র স্বার্থসিদ্ধির জন্যেই অপব্যবহার করে। জাগতিক সম্পদ সীমিত কিন্তু মানুষের চাহিদা অসীমিত। তাই সমাজের সকল মানুষকে শান্তি ও সমৃদ্ধি দিতে হলে সেই ব্যবস্থাই কাম্য যা সম্পদের সর্বাধিক উপযোগ (maximum utilization) আর ন্যায়সঙ্গত বণ্টনকে (rational distribution) সুনিশ্চিত করবে। এই লক্ষ্যে উপনীত হতে গেলে মানুষকে নীতিবাদে প্রতিষ্ঠিত হতেই হবে, আর সমাজে নৈতিকতা বিকাশের পথকে সুগম করতেই হবে।

সূচীপত্র

আর্থিক বিকেন্দ্রীকরণের অর্থ হচ্ছে উৎপাদন হবে অত্যাবশ্যক বস্তুসম্ভার যোগানোর জন্যে (for consumption), লাভের জন্যে নয় (not for profit)। পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় বিকেন্দ্রীকরণ কখনই সম্ভবপর নয় কেননা সেখানে উৎপাদন হয় অধিকতর লাভের জন্যে। পুঁজিবাদীরা সবচেয়ে কম খরচে উৎপাদন করে আর তার থেকে সর্বোচ্চ মুনাফা পেতে চায়। তারা চায় উৎপাদনের কেন্দ্রীকরণ যার অবশ্যম্ভাবী পরিণতি হচ্ছে আঞ্চলিক বৈষম্যের সৃষ্টি। প্রাউটের বিকেন্দ্রিত অর্থনীতিতে উৎপাদন হবে ভোগের জন্যে যাতে সকলের ন্যূনতম প্রয়োজপূর্ত্তি সুনিশ্চিত হয়। এই ব্যবস্থায় দেশের সমস্ত অঞ্চল তাদের আর্থিক সম্ভাবনার পূর্ণ সদুপযোগ করতে পারে। এর ফলে ভাসমান জনগোষ্ঠী সংক্রান্ত সমস্যা বা শহরাঞ্চলে জনসংখ্যার অতিরিক্ত চাপ সৃষ্টি হবার সমস্যা তৈরী হয় না।

কোন দেশ শিল্প তৎসহ অন্যান্য ক্ষেত্রে সর্বাধিক উন্নতিবিধান করতে না পারলে আর্থিক দিক দিয়ে সম্পন্ন হওয়া তার পক্ষে অসম্ভব। যদি কৃষিতে নিযুক্ত লোকের শতকরা হার ত্রিশ থেকে চল্লিশের বেশী হয় তাহলে কৃষির ওপর অত্যধিক চাপ পড়বে। সেই দেশ আর্থিক দিক দিয়ে উন্নত হতে পারবে

না। বা সেই দেশে সামঞ্জস্যপূর্ণ বা বিকেন্দ্রিত আর্থিক উন্নয়ন সম্ভবপর হবে না। ভারতবর্ষ এই ক্ষেত্রে একটি উপযুক্ত দৃষ্টান্ত। ভারতে শতকরা ৭৫ ভাগ লোক জীবনধারণের জন্যে কৃষির ওপর নির্ভরশীল।

কানাডা বা অস্ট্রেলিয়ার মত দেশে এক বিরাট সংখ্যক জনসাধারণ কৃষিপণ্যের উৎপাদনে নিযুক্ত। তাই তারা কৃষি উন্নত দেশ হলেও শিল্পোন্নত দেশের ওপর নির্ভরশীল। কেননা তারা নিজেরা শিল্পে অনুন্নত। উদাহরণস্বরুপ কানাডা আমেরিকার ওপর আর অস্ট্রেলিয়া ইংল্যাণ্ডের ওপর চিরাচরিতভাবে নির্ভরশীল। ভারতে যতক্ষণ শতকরা প্রায় ৭৫ ভাগ লোক কৃষিতে নিযুক্ত থাকবে ততক্ষণ এখানকার মানুষের আর্থিক দুর্দশার অবসান ঘটবে না। এই ধরণের সমস্যাকবলিত যে-কোনো দেশ অভ্যন্তরীণ বা আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে তাদের কর্তব্য সম্পাদন করতে বিরাট অসুবিধার সম্মুখীন হবে। জনসাধারণের ক্রয়ক্ষমতা হ্রাস পেতেই থাকৰে আর আর্থিক বৈষম্য বাড়তেই থাকৰে। সমগ্র দেশের সামাজিক, আর্থিক ও রাজনৈতিক পরিবেশ কলুষিত হতেই থাকবে। ভারতবর্ষ এইসব কুফলে জর্জরিত থাকার সুস্পষ্ট উদাহরণ।

সূচীপত্র

তাই আর্থিক বিকেন্দ্রীকরণের অর্থ এই নয় যে দেশের সংখ্যাগুরু জনসাধারণ বেঁচে থাকার জন্যে কৃষির ওপর সম্পূর্ণ নির্ভরশীল থাকৰে বা অন্যান্য আর্থিক ক্ষেত্রে অনুন্নত থেকে যাবে। বরং সেই দেশ প্রতিটি আর্থিক ক্ষেত্রে অবশ্যই সর্বাধিক উন্নত হবার চেষ্টা করবে, আর তারা সর্বক্ষেত্রেই সর্বাধিক বিকেন্দ্রীকরণের প্রয়াস করবে।

পৃথিবীর সমস্ত গণতান্ত্রিক দেশে আর্থিক ক্ষমতা মুষ্টিমেয় কিছু লোকের হাতে পুঞ্জীভূত। উদারনৈতিক গণতন্ত্রের দেশগুলিতে আর্থিক ক্ষমতা অল্প কিছুসংখ্যক পুঁজিপতির একচেটিয়া অধিকারে, আর সমাজতান্ত্রিক দেশে তা পার্টিতন্ত্রের হস্তগত। উপরি–উক্ত প্রতিটি ক্ষেত্রেই হাতে গোণা কিছু সংখ্যক মানুষ সমগ্র সমাজের আর্থিক কল্যাণ নিয়ে ছিনিমিনি খেলে। জনসাধারণের হাতে ক্ষমতা ন্যস্ত হলে এইসব লোকদের মাতব্বরি ৰন্ধ হবে আর রাজনৈতিক দলগুলিও চিরতরে নিশ্চিহ্ন হৰে।

মানুষকে রাজনৈতিক গণতন্ত্র বা আর্থিক গণতন্ত্রের মধ্যে একটিকে বেছে নিতে হৰে। অর্থাৎ তাদের আর্থিক ব্যবস্থার

ভিত্তি হবে কেন্দ্রিত অর্থনীতি অথবা বিকেন্দ্রিত অর্থনীতি। কোনটাকে বেছে নেওয়া সঙ্গত হবে? রাজনৈতিক গণতন্ত্র জনগণের আশা আকাঙ্ক্ষার পূর্তি করতে বা এক শক্তিশালী তথা স্বচ্ছ সমাজের প্রতিষ্ঠা করতে ব্যর্থ হবে। একমাত্র আর্থিক গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা হলেই তা সম্ভবপর হবে।

অর্থনৈতিক গণতন্ত্রের জন্যে কী কী প্রয়োজন

অর্থনৈতিক গণতন্ত্রের জন্যে প্রথম আবশ্যকতা হচ্ছে একটি বিশেষ যুগে সকলের ন্যূনতম প্রয়োজনপূর্তি (যেমন খাদ্য–বস্ত্র–বাসস্থান–চিকিৎসা–শিক্ষা) সুনিশ্চিত করা। আবশ্যকতার পূর্তি সুলভ ও সহজ হলে সমাজের সার্বিক কল্যাণও বাস্তবায়িত হবে।

দ্বিতীয় আবশ্যকতা হচ্ছে প্রত্যেকের ক্রয়ক্ষমতার ক্রমবৃদ্ধি সুনিশ্চিত করতে হবে। অর্থনৈতিক গণতন্ত্রে আর্থিক ক্ষমতা থাকে স্থানীয় জনসাধারণের হাতে। ফলতঃ কোন স্থানের আর্থিক শ্রীবৃদ্ধির কাজে সেখানকারই কাঁচামাল (raw materials) ব্যবহৃত হবে। এর অর্থ এই যে একটি সামাজিক–অর্থনৈতিক অঞ্চলের

উৎপাদিত কাঁচামাল অন্য অঞ্চলে স্থানান্তরিত হবে না। এর ফলে যেখানে কাঁচামাল উৎপাদিত হয় সেখানেই শিল্পকেন্দ্র গড়ে উঠবে। এইভাবে স্থানীয়ভাবে লভ্য কাঁচামালের ওপর ভিত্তি করে শিল্প গড়ে উঠৰে যাতে স্থানীয় সকল মানুষের কর্মনিযুক্তি (full em- ployment) নিশ্চিত হবে।

আর্থিক গণতন্ত্রের তৃতীয় আবশ্যকতা হচ্ছে অর্থনৈতিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা স্থানীয় জনসাধারণের হাতে রাখতে হবে। আর্থিক মুক্তি সব ব্যষ্টিদের জন্মগত অধিকার। স্থানীয় জনসাধারণের হাতে আর্থিক ক্ষমতা ন্যস্ত থাকলেই এই আর্থিক মুক্তি সম্ভবপর হৰে। অর্থনৈতিক গণতন্ত্রে স্থানীয় মানুষের আর্থিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা তো থাকৰেই। তার সঙ্গে থাকৰে স্থানীয় প্রয়োজন অনুসারে বস্তুসম্ভারের উৎপাদন ও সব কৃষিপণ্য তথা শিল্পপণ্য বণ্টনের ক্ষমতাও।

চতুর্থ আবশ্যকতা হচ্ছে স্থানীয় অর্থনীতিতে বহিরাগতদের কোন অধিকার থাকৰে না। স্থানীয় অঞ্চল থেকে অর্থের বর্হিগমনকে ৰন্ধ করতেই হবে, এর জন্যে বহিরাগত বা

ভাসমান জনগোষ্ঠী যাতে স্থানীয় অঞ্চলের আর্থিক কাজকর্মে হস্তক্ষেপ না করতে পারে তাও দেখতে হবে।

অর্থনৈতিক গণতন্ত্রকে সফলীভূত করতে হলে প্রাউটকে বাস্তবায়িত করতেই হবে ও এর জন্যে স্তরে স্তরে সব মানুষের আর্থিক অবস্থার উত্তরোত্তর উন্নতিসাধন করতে হবে। এর ফলেই সমগ্র মানবতার আধ্যাত্মিক বিমুক্তির বৃহত্তর সম্ভাবনা তৈরী হবে।

সবশেষে এটাও মনে রাখতে হবে যে শুধুমাত্র মানুষের আর্থিক বিমুক্তির জন্যেই অর্থনৈতিক গণতন্ত্রের আবশ্যকতা তা নয়, উদ্ভিদজগৎ ও জীবজগৎ তথা পশুজগতের সার্বজনীন কল্যাণের জন্যেও এর প্রয়োজন। মনুষ্যজগৎ ও মনুষ্যেতর জগৎ এই দুইকে নিয়েই যে মহত্তম মূল্যবোধ তার স্বীকৃতির জন্যে আর্থিক গণতন্ত্রের নীতিগুলি পথ ও পন্থা নির্ধারণ করবে, যার ফলে সমাজের স্বচ্ছন্দ প্রগতি সম্ভবপর হবে।

জুন ১৯৮৬, কলকাতা

সূচীপত্র

মাদকদ্রব্য

'গুড়োৎপন্ন' শব্দের মানে হচ্ছে 'মদ' অথবা গেঁজানো গুড় বা ঝোলাগুড় যা দিয়ে মদ তৈরী হয়। তোমরা চীনীকলের পাশ দিয়ে যাবার সময় যে বিশেষ ধরণের গুড়ের গন্ধ পাও অধিকাংশ ক্ষেত্রে তা হচ্ছে ঝোলা গুড়। এই গুড় থেকে সরকার নির্দিষ্ট ডিষ্টিলারিতে মদ তৈরী করা হয়। মৃতসঞ্জীবনী সুরা ও মৃত সঞ্জীবনী সুধাও এই ধরণের ডিষ্টিলারি (চোলাই খানা) থেকে তৈরী হয়। ছোটবেলায় দেখতুম উত্তর বিহারে, উত্তরপ্রদেশে অধিকাংশ চীনীকলের কাছেই ওই ধরণের ডিষ্টিলারি থাকত। ঝোলাগুড়ের খাদ্যগত ব্যবহার উপেক্ষা করে মদ তৈরী করা কোন অবস্থাতেই বাঞ্ছনীয় নয়। তবে ঔষধার্থে মদের ব্যবহার আছে। সেই জন্যে মদ তৈরী করতেও হয়।

ভাত গেঁজিয়ে যে আমানি তৈরী হয় তাও এক ধরণের অল্প নেশার গেঁজানো মদ বা fermentad wine। এর নেশা তাড়ি বা অন্যান্য মদের চেয়ে অনেক কম। তবে এতে নেশার সঙ্গে সঙ্গে ঔষধীয় গুণও আছে। এ ঘুম আনিয়ে দেয়। বদহজম হলে হজমেও সাহায্য করে দেয়। গর্ভবতী নারীদের অতি দৌর্বল্যেও কিছুটা কাজ করে। Fermented wine বা গেঁজানো মদ তাড়িও কিডনির অনিয়মিত কার্য–কারিতায় কিছুটা ফল দেয়। থিতিয়ে যাওয়া গেঁজানো মদ হচ্ছে শিরকা বা ভিনিগার যার মধ্যে নেশার গুণ নেই, বরং কয়েকটা সাত্বিক গুণ আছে। থিতিয়ে যাওয়া গেঁজানো মদের তলানি (sediment) গাদ বা yeast বলে পরিচিত। বেকারি শিল্পে এর বিশেষ প্রয়োজন রয়েছে। প্রসূতির মৃত্যুকালীন অবস্থা এসে গেলে দ্রাক্ষারিষ্টের সঙ্গে গুড়ুচীর চীনী পান করালে মৃত্যুর সম্ভাবনা কাটলেও কেটে যেতে পারে। দ্রাক্ষারিষ্ট হাতের কাছে না পেলে মৃত সঞ্জীবনী সুরাতেও কিছুটা কাজ দেয়।

হ্যাঁ, আমাদের দেশের সব চেয়ে সস্তা মদ ধেনো মদ হলেও যবের মণ্ড থেকে মদ তৈরী করা হলে তা আরো সস্তা হবে। ধেনো মদ ৰাঙলার গ্রাম–জীবনকে যথেষ্ট ক্ষতিগ্রস্ত করেছে।

আদিবাসী ও অনুন্নত সমাজের মানুষেরা এই ধেনো মদের নেশাতেই অনেক সময় সর্বস্বান্ত হয়, ৰাড়ীতে ঝগড়াঝাঁটি করে, পারিবারিক শান্তি নষ্ট করে শেষ পর্যন্ত নিজেরাও পথে বসে। তাই মদপ্রস্তুত বা মদ্যপানের ওপরে কেবল রষ্ট্রিক নিয়ন্ত্রণ থাকলেই চলবে না, কঠোর সামাজিক নিয়ন্ত্রণেরও প্রয়োজন। এ ব্যাপারে রাষ্ট্র ও সমাজকে হাতে হাত মিলিয়ে কাজ করতে হবে। তামাকের নিকোটিন বিষ শরীরের বিভিন্ন অংশে ক্যান্সারের ক্ষত তৈরী করে দেয়। আর মদ লিবারকে ধ্বংস করে দেয়। আফিঙ (opium) নষ্ট করে দেয় কর্মশক্তিকে। মানুষ তখন বসে বসে ঝিমুতে ভালবাসে। সিদ্ধি (hemp) নষ্ট করে দেয় বুদ্ধি ও ৰোধশক্তিকে। তাই এরা কেউই ভাল নয়। ধর্মের নামেই হোক বা অন্য কোন অছিলাতেই হোক মদ্যের ব্যবহার সীমায়িত হওয়া উচিত। ঔষধার্থে চিকিৎসা ব্যতিরেকে ও চিকিৎসকের অনুমতি ব্যতিরেকে কারো মদ পান করা উচিত নয়। চিকিৎসকেরও উচিত অন্য কোন চিকিৎসকের লিখিত অনুমতির ভিত্তিতে কাজ করা।

যে ছাত্রটির মধ্যে যতটা ভবিষ্যৎ লুক্কায়িত ছিল মদ্যপানে তার বিশ শতাংশের মত নষ্ট হয়ে যায়। অতি চাঞ্চল্য ও

তারপরে অল্প চাঞ্চল্যের ফলে জড়তা আসে, কম বয়সে পৌরুষ, তেজস্বিতা কমে যায়, স্নায়ুকোষকে (nerve-cell) পুরো কাজে লাগানো যায় না। পূজার অঙ্গ হিসেবে যাঁরা মদ ব্যবহার করেন তাঁদেরও অনুরোধ করব তার অন্য কোন বিকল্প স্বীকৃত ব্যবস্থা যদি থেকে থাকে তাঁরা যেন তার আশ্রয় নেন। যেমন কতকগুলি তান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় মদ্যের পরিবর্তে কাঁসার বাটিতে ঝুনো নারকোলের জল অনেকক্ষণ রেখে তার পরে সেই জল ব্যবহার করলেও কাজ চলে। ওই ধরণের ক্ষেত্রে তাঁরা যেন মদ্য ব্যবহার না করে ওই ধরণের ঝুনো নারকোলের জল ব্যবহার করেন।

মানুষ সাধনা করে বুদ্ধিকে–বোধিকে প্রখরতর করার জন্যে, ব্যাপ্তি ঘটাবার জন্যে। মদ এগুলি ধ্বংস করে। তাই মদ মানুষের সর্বাধিক উন্নতির পরিপন্থী। মদের একটি অংশ শরীরের অভ্যন্তরস্থ স্নায়ুকোষ, স্নায়ুতন্ত্র ও গ্রন্থি–উপগ্রন্থি গুলিকে ক্ষতিগ্রস্ত করার কাজে লাগে, একটি অংশ ঘর্মের সঙ্গে বহির্গত হয়, একটি অংশ মলের সঙ্গে বহির্গত হয় ও অবশিষ্টাংশ মূত্রের সঙ্গে বহির্গত হয়। তামাকের নিকোটিন–বিষের কার্যধারাও কতকটা এই ধরণের ও সেও ওইভাবে শরীরের ক্ষতি করে'

শরীর থেকে বহির্গত হয়। তাই ওই ধরণের নেশাগ্রস্ত মানুষের মল–মূত্র–ঘর্ম ওই ধরণের নেশার বস্তুর দুর্গন্ধে দূষিত। কোন মদ্যপ বা নিকোটিন বিষ ব্যবহারকারী মানুষ কক্ষে প্রবেশ করলেই ৰোঝা যায় লোকটি নেশার বশে। যাঁরা হুঁকোয় তামাক খান ওই হুঁকোর জলে তামাকের ধোঁয়ার একটি অংশ নিষিক্ত হয়ে যায়। তাই বাকী ধোঁয়াটা শরীরে ক্ষতি একটু কম করে। তবে একটু কম করে মানে যে একেবারেই করে না তা তো নয়। তোমরা হুঁকোর জল দেখেছ তো কী রকম কালচে–হলদে হয়ে থাকে। যারা বিড়ি–সিগারেট খায়, বিশেষ করে' সিগারেট খায়, তাদের শরীরের অভ্যন্তরে সিগারেটের ধোঁয়ায় ওই ধরণের লালচে ছোপ লাগে। অনেক ক্ষেত্রে লাংস্ কার্বোনেটেড হয়ে যায়, অর্থাৎ ফুসফুসে ওই রক্তের ছোপ লেগে যায়। স্বাভাবিক নিয়মে ওই ধরণের ফুসফুসে কর্কট রোগের আক্রমণের সম্ভাবনা থেকে যায়।

দোক্তায়, খৈনিতে–বিশেষ করে খৈনিতে তামাক পাতা যখন জিবে গিয়ে পড়ে তখন জিবে একটা বিরূপ প্রতিক্রিয়া হয়। তাই লোকে তখন বার বার থুতু ফেলতে থাকে। এতেই বোঝা যায় জিনিসটা স্বাস্থ্যবিজ্ঞানবিরোধী। পানের সঙ্গে যে দোক্তা–

জর্দা খাওয়া হয় তা তামাক পাতারই বহুধা প্রসারিত রূপ। মানুষ নেশামুক্ত থাকুক, শরীর মনে সর্বোতভাবে সর্বতোপ্রয়াসে ঊর্ধ্বলোকের দিকে এগিয়ে যাক এটাই বাঞ্ছনীয়।

চা-কফি-কোকেতে নেশার পরিমাণ খুবই কম। এর মধ্যে কোকর কিছুটা পুষ্টিমূল্যও আছে। চায়ের পুষ্টিমূল্য কম। সাময়িক উদ্দীপনা আনে। তবে নিদ্রা কমিয়ে দেয়, পরিপাক শক্তি কমিয়ে দেয়। কফিও সাময়িক উদ্দীপনা আনে, নিদ্রা কমিয়ে দেয়, পরিপাকশক্তি কমিয়ে দেয়। এতে নেশার মাত্রা চায়ের চেয়েও বেশী, পুষ্টিমূল্যও চায়ের চেয়ে অল্প একটু বেশী। অতিমাত্রায় চা পানের ফল বিষবৎ। তৈরী চা দ্বিতীয়বার ফোটালে বা গরম করলে তার ফলও অতি মাত্রায় বিষবৎ। চায়ের বিষের নাম 'ট্যানিক এ্যাসিড'। প্রাচীন ভারতে সমাজের মানুষ চা খেত না। সাধু-সন্ন্যাসীরা দুর্গম গিরিকন্দর পার হবার সময় সাময়িক ভাবে চা খেতেন বা চা পাতা ছেঁচে চিবিয়ে খেতেন।

নিউক্লিয়ার বিপ্লব

সমাজ তাকেই বলা যাবে যেখানে অসংখ্য সমান্তরাল মানসিক তরঙ্গ সংগ্রথিত হচ্ছে ও যার উদ্ভুতি হচ্ছে সকলের মিলিত ভাবে ঐক্যমত্যের পথে চলার মানসিকতা থেকে। মানুষের সমাজের গৌরব নিহিত আছে সেখানেই যেখানে মানুষ মহিমান্বিত আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে এক বিশ্বৈকতাবাদী যূথবদ্ধ সংরচনার সৃষ্টি করেছে।

ব্যষ্টি ও সমষ্টি উভয় জীবনের চলার ক্ষেত্রে গতিময়তা ও স্থিতিশীলতা অঙ্গাঙ্গী ভাবে অবস্থান করে। সমাজ নিরন্তর ভাবে চলে চলেছে–থেমে থাকার অর্থ হলো মৃত্যু। তাই সামাজিক গতি হচ্ছে সক্রিয় প্রচেষ্টা যা সব সময়েই স্থানুত্বকে ধ্বংস করে গতির মধ্যে দ্রুতির সঞ্চার করে চলে। এই চলমানতার বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এটি সবসময়ই ছন্দায়িত ও সঙ্কোচবিকাশী, কখনই এক রৈখিক নয়।

সমস্ত যুগেই ব্যষ্টিগত ও সমষ্টিগত জীবন সর্বদাই দেশ-কাল-পাত্রের পরিবর্তনের সঙ্গে পরিবর্তিত হয়ে চলেছে। তুলনামূলক ভাবে সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক জীবনে পরিবর্তনের ধারায় গত ৫০০ থেকে ৬০০ বছরের থেকে বিংশ শতাব্দীতে অনেক বেশী দ্রুতি সঞ্চারিত হয়েছে। ভবিষ্যতে সমাজের এই পরিবর্তন আরও বেশী দ্রুতশীল গতিতে হবে।

সমাজ পরিবর্তনের অন্যতম বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি হচ্ছে 'বিপ্লব'। সংস্কৃত শব্দ বিপ্লব কথাটি এসেছে বি-প্লু + অল প্রত্যয় করে। প্রতিটি বিপ্লবই ব্যষ্টিজীবনে ও সমষ্টিজীবনে আমূল পরিবর্তন নিয়ে আসে ও ব্যষ্টি ও সামূহিক মনস্তত্বে আনে সদূরপ্রসারী পরিবর্তন।

সমাজের গতিকে ত্বরান্বিত করার উদ্দেশ্যে তীব্র শক্তি প্রয়োগ করেই বিপ্লব ঘটাতে হয়। প্রাউটের মতে তাই- "তীব্র শক্তি সম্পাতেন গতি বর্দ্ধনং বিপ্লবঃ।" অর্থাৎ তীব্র শক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে সমাজ-গতিতে দ্রুতির সঞ্চার করাই হচ্ছে বিপ্লব। অল্প

সময়ের মধ্যে তীব্র শক্তি প্রয়োগের দ্বারা শোষণ উচ্ছেদ করে সামূহিক মনস্তত্ত্বের পরিবর্তন ঘটিয়ে চলতি যুগকে সরিয়ে তার পরবর্তী যুগ নিয়ে আসার নামই বিপ্লব। কিন্তু তীব্র শক্তি সম্পাত করার পরে সমাজের চাকা যদি বিপরীত দিকে ঘুরতে থাকে তবে তাকে বলা হৰে প্রতিবিপ্লব। প্রতিবিপ্লবে সমাজ পূর্ববর্তী যুগেই ফিরে যায়। প্রাউট এই প্রতিবিপ্লবের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেছে– "তীব্রশক্তি সম্পাতেন বিপরীত ধারায়াম্ প্রতিবিপ্লব।” অর্থাৎ প্রতিবিপ্লব হচ্ছে তীব্রশক্তি প্রয়োগ করে সমাজচক্রকে বিপরীত ধারায় ঘুরিয়ে দেওয়া।

বিপ্লবের মুখ্য উদ্দেশ্য হচ্ছে সমাজের সামূহিক মনস্তত্ত্বের স্থিতিশীলতা ও স্থানুত্বের বাধাকে অতিক্রম করে একটা যুগ থেকে অন্যযুগে সমাজকে প্রতিষ্ঠিত করা। সমাজচক্র সর্বদা অপ্রতিরোধনীয় ভাবেই চলতে থাকে। তবু যারা সামূহিক জীবনের কল্যাণ চান তারা শোষণের বিরুদ্ধে নিরলস ভাবে সংগ্রামে রত হন যাতে করে সমাজ গতির মাঝে দ্রুতি এনে সকলে মিলিত ভাবে একই ভাবনায় চলতে পারে।

সমাজজীবনে মনস্তাত্ত্বিক ভারসাম্যের মাধ্যমে যখন বৈপ্লবিক পরিবর্তন ঘটে তখন সেই পরিবর্তনের সঙ্গে কিছু বিষয় অবিচ্ছেদ্য ভাবে অঙ্গীভূত থাকে। সেগুলি হচ্ছে শোষণের বিরুদ্ধে গণরোষ, স্থিতাবস্থার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ, অশুভশক্তির বিরুদ্ধে শুভশক্তির সংগ্রাম ও নূতন সামূহিক মনস্তত্ত্বকে বরণ করে নেবার গণ-প্রয়াস।

মানবসভ্যতা আজ এক জটিল যুগ সন্ধিক্ষণে এসে পৌঁছেছে। মানুষ কর্তৃক মানুষের শোষণ এক বিপদের সংকেতকে বহন করে আনছে। অতীতেও এই ধরণের সঙ্কটময় মুহূর্তে যখন শোষণ চরমস্তরে পৌঁছেছে তখনই এক যুগপুরুষের আবির্ভাব হয়েছে যিনি সমাজে সমস্ত রকম সমস্যা অতিক্রম করার পথ দেখিয়েছেন। বর্তমানেও এমন একজন মহান নেতৃত্বের নির্দেশনা প্রয়োজন যিনি সর্বাত্মক আদর্শের মাধ্যমে মানব সমাজকে তার ধ্বংসাত্মক অবস্থা থেকে বাঁচিয়ে গৌরবান্বিত ভবিষ্যতে প্রতিষ্ঠিত করবেন। আজকের দিনে তেমনই একজন ঐতিহাসিক মহান পুরুষের আগমন ইতিহাস রচনার ক্ষেত্রে অত্যাবশ্যক।

সূচীপত্র

সমাজচক্র–সমাজচক্রের পরিঘূর্ণণে চার ধরণের সামুহিক মনস্তত্ত্বের মধ্যে কোন একটি বর্ণের গুরত্বপূর্ণ ভূমিকা থাকে। এই মনস্তত্ত্বগুলি হচ্ছে শূদ্র, ক্ষত্রিয়, বিপ্র ও বৈশ্য। এর সঙ্গে জাত–পাতের কোন সম্বন্ধ নেই। এ একান্ত ভাবেই গুণ ও কর্ম নিবন্ধন মানসিক পরিকাঠামো নির্ভর। শূদ্র তারাই যারা জড়জাগতিক ভোগ–মানসিকতায় পুষ্ট। তারা তাদের মানসিক শক্তির দ্বারা কোনভাবেই সেই জড়জাগতিক মানসিকতার ঊর্ধ্বে উঠতে পারে না। দৈহিকশক্তিই তাদের দিন গুজরানের একমাত্র সম্বল। ক্ষত্রিয়রা জড়জাগতিক চেতনাকে ভৌত–মানসিক চেতনার দ্বারা নিয়ন্ত্রণে রাখে। বিপ্ররা তাদের মানসিক শক্তিকে কাজে লাগিয়ে সবকিছু নিজেদের নিয়ন্ত্রণে রাখে। শারীরিক শক্তি ও বীরত্বের দ্বারাই ক্ষত্রিয়রা সামাজিক নিরাপত্তাকে করায়ত্ত করে। অন্যদিকে বিপ্ররা তাদের বুদ্ধির ওপর নির্ভরশীল বেশী। ইতিহাসকে গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করলে এ সত্য ধরা পড়ে যে, বিপ্ররা তাদের বুদ্ধির উপর বিশ্বাস রেখেই ক্ষত্রিয়দের মনে একধরণের শ্রদ্ধা ও অধীনস্থ থাকার মানসিকতা তৈরী করে দেয়। আর এই ভাবেই বিপ্ররা ক্ষত্রিয়দের শারীরিক শক্তি ও ক্ষমতাকে নিয়ন্ত্রণ করে রাখে। বৈশ্যমনস্তত্ত্ব কিছুটা ব্যতিক্রম। বৈশ্যরা সাধারণতঃ ভৌতিক বস্তু ভোগ করার দিকে বেশী

আগ্রহশীল নয়। তার চেয়ে ভৌতিক সম্পদ কুক্ষিগত করার ক্ষেত্রে বেশী আনন্দ লাভ করে।

আদিম সমাজ শূদ্র মানসিকতার দ্বারা পরিচালিত হত। ধীরে ধীরে সমাজ ক্ষত্রিয় মানসিকতার দ্বারা পুষ্ট হল ও ক্ষত্রিয়রাই সমাজে প্রতিষ্ঠা লাভ করলো। এই যুগকে রাজা বা ক্ষত্রিয় যুগ বলা হয়। ক্ষত্রিয় যুগের আবার পরিবর্তন এল বিপ্রযুগের দ্বারা–সেটা বুদ্ধিজীবী ও পুরোহিতদের যুগ। এর পরেই এল বৈশ্যযুগ। বৈশ্যযুগের সঙ্গে আগের দু'টো যুগের পার্থক্য হলো যে বৈশ্যরা কদাচিত শাসন ক্ষমতার আসে। তারা ক্ষত্রিয় ও বিপ্রকে ক্ষমতায় রেখে সমাজকে নিয়ন্ত্রণ করে–নিয়ন্ত্রণ করে সমাজের অর্থনীতি, রাজনীতি সব। সাধারণতঃ ক্ষত্রিয় ও বিপ্রযুগে শারীরিক ও মানসিক যন্ত্রণা বৈশ্যযুগের তুলনায় কম কেননা সেখানে দারিদ্র্য, বঞ্চনা ও শোষণ অনেক বেশী।

এক যুগ থেকে অন্যযুগের পরিবর্তন স্বাভাবিক ভাবে হতে পারে, ক্রান্তি বা বিপ্লবের মাধ্যমে হতে পারে। প্রাকৃতিক পরিবর্তন অথবা ক্রান্তি ক্ষত্রিয়যুগ থেকে বিপ্রযুগে ও বিপ্রযুগ থেকে বৈশ্যযুগে সহজে পরিবর্তন আনতে পারে কিন্তু বৈশ্যযুগের

শোষণকে দূর করতে গেলে তীব্রশক্তির অবশ্যই প্রয়োগের প্রয়োজন।

বৈশ্যযুগের শোষণের ফলে ক্ষত্রিয় ও বিপ্র মানসিকতার মানুষরা বৈশ্যদের হতাশাগ্রস্ত ক্রীতদাসে পরিণত হয়ে যায়। তারা তখনও বৈশ্যদের উদরপূর্তির জন্যে কাজ করা ছাড়া আর কোনও কিছুই ভাবতে পারে না। এই ধরণের ক্ষত্রিয় ও বিপ্র, যারা শূদ্র মানসিকতায় পরিবর্তিত হয়ে পারিপার্শ্বিক চাপে এক ধরণের হতাশাগ্রস্ত বিক্ষুব্ধ হৃদয় নিয়ে জীবন কাটায়। এদেরকে তখন বিক্ষুব্ধ শূদ্র বলা যেতে পারে। এই ধরণের শোষিত বিক্ষুব্ধ শূদ্ররা জনগণের হতাশা কাজে লাগিয়ে ধারাবাহিক ভাবে এর অবসানের জন্য চেষ্টা করতে পারে। এই শ্রেণীর লোকেরাই স্বতন্ত্র বিপ্লবী মানসিকতাপূর্ণ শ্রেণী তৈরী করে দেয়।

একমাত্র এই ধরণের বিক্ষুব্ধ শূদ্রদের পরিচালিত বিপ্লবই বৈশ্যযুগের অবসান ঘটাতে পারবে। শূদ্ররা কখনই প্রকৃত বিপ্লবী হতে পারবে না, কেননা তাদের মধ্যে যথেষ্ট পরিমাণে নৈতিক মানসিকতার অভাব রয়েছে। দায়িত্বজ্ঞানের ও সংগ্রামী মানসিকতারও যথেষ্ট অভাব রয়েছে। বিভিন্ন ভাবে তারা

ক্ষতবিক্ষত কিন্তু মানবিক মৌলৰোধে তারা সুপ্রতিষ্ঠিত নয়, তাই তারা কিছুতেই প্রয়োজনীয় বিপ্লবী মানসিকতা তৈরী করতে পারে না। একমাত্র বিক্ষুব্ধ শূদ্ররাই যথার্থ বিপ্লবী মানসিকতাকে তৈরী করতে পারবে কেননা তাদের মধ্যে যেমন নৈতিক সাহসও রয়েছে তেমনি শোষণের বিরুদ্ধে শৃঙ্খলাভাবে লড়ার মানসিকতা তারা অর্জন করতে পারে।

পুঁজিবাদী শোষণের বিরুদ্ধে এই ধরণের বিপ্লবকে 'শূদ্র বিপ্লব' বলা যায়। যদিও ক্ষত্রিয় ও বিপ্ররা পুঁজিবাদী শোষণের ফলে বিক্ষুব্ধ শূদ্রে পরিণত হয় তবু শূদ্র বিপ্লবের পরে তাদের পূর্বের ক্ষত্রিয় ও বিপ্র মানসিকতায় ফিরে যায়। তবে শূদ্র বিপ্লবের সামরিক মনস্তত্ত্বের জন্যে নেতৃত্ব শেষপর্যন্ত ক্ষত্রিয়দের হাতে চলে যায়। স্বভাবতই এক নূতন ক্ষত্রিয় যুগের জন্ম নেয়। এরূপ ক্ষত্রিয় যুগেও বিপ্ররা তাদের বুদ্ধির জোরে প্রভাব বিস্তার করে' বিপ্রমানসিকতাকে বজায় রাখতে সচেষ্ট হয়। এভাবে ক্ষত্রিয় যুগ বিপ্রযুগে ও বিপ্রযুগের পর বৈশ্যযুগে ফিরে আসবে। এর পরে আবার দেখা দেবে শূদ্র–বিপ্লব। সুতরাং সমাজের গতি ও বিপ্লব পারস্পরিক সম্বন্ধযুক্ত।

সূচীপত্র

সমাজচক্রে সামাজিক প্রগতির জন্যে চার ধরণের মনস্তত্ত্ব প্রধান্যবিস্তার করে। একটা যুগের সমাপ্তির শেষপর্বে সামূহিক মনস্তত্ত্বের বৈশিষ্ট্যপূর্ণ অবনমন হয়। এর সঙ্গে নৈতিক পদস্খলন, সামাজিক গতির হ্রাসপ্রাপ্তি, মানসিক-সামাজিক স্থবিরতার সৃষ্টি করে। শোষণ তখন বাধাহীন হয়ে দাঁড়ায়। এধরণের অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ একটা যুগ-সমাপ্তির সংকেত দেয়। বিভিন্ন শ্রেণী তখন সামাজিক ক্ষমতাকে করায়ত্ত করার জন্যে ও নিজেদের কর্তৃত্ব স্থাপন করার জন্যে অন্যের অধিকারকে পদদলিত করতে থাকে। এই ধরণের দ্বন্দ্ব মানবসভ্যতার উষালগ্ন থেকেই লক্ষ্য করা যায়। এই ধরণের সংঘর্ষ ও সমিতির মধ্য দিয়ে মানুষ নিজের মুক্তির পথ খুঁজে পেতে চেয়েছে।

আধুনিক পৃথিবীতে পুঁজিবাদী শোষণ সর্বত্র বাধাহীন ভাবে বিরাজ করছে। তবে পুঁজিবাদও তার দ্রুত চরম পতনের দিকে এগিয়ে চলেছে। পুঁজিবাদী ব্যবস্থার প্রাথমিক স্তরে সমাজ কিছু সুবিধা লক্ষ্য করেছিল কিন্তু সমাপ্তির কাছে এসে সমাজ তৃপ্তিহীন লোভ, অসহ্য হয়ে ওঠা কঠোর জীবন ও হৃদয়হীন বঞ্চনার শিকার হয়ে পড়েছে। যে সব পুঁজিবাদী দেশ এ ধরণের চরম

সূচীপত্র

পুঁজিবাদী শোষণে জর্জরিত হয়ে চলেছে তারা দ্রুত শূদ্র–বিপ্লবের পথেই এগোচ্ছে।

বিপ্লবের ধরণঃ–চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী বিপ্লবকে সাধারণতঃ দু'ভাগে ভাগ করা যায়–প্রাসাদবিপ্লব ও পিরামিডিয় বিপ্লব। প্রাসাদ বিপ্লব ও পিরামিডিয় বিপ্লব অবশ্য প্রকৃত অর্থে বিপ্লব নয় কেননা তারা সামূহিক মনস্তত্ত্ব পরিবর্তনের ও সমাজের অগ্রগতির কোন নিশ্চিততা দিতে পারে না।

প্রাউট অন্য ধরণের বিপ্লবের পক্ষপাতী। সে বিপ্লবের নাম নিউক্লিয়ার বিপ্লব। এই বিপ্লবে সমাজজীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে–সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক, মানসিক ও আধ্যাত্মিক সমস্ত ক্ষেত্রেই সম্পূর্ণ পরিবর্তন সংশাধিত হয়। নূতন নৈতিক ও আধ্যাত্মিক মূল্যবোধের উন্মেষ হয় যা সমাজে প্রগতির গতিতে দ্রুতি নিয়ে আসে। পুরোনো যুগের পরিবর্তে আসে নূতন যুগ। এক ধরণের সামূহিক মনস্তত্ত্বের স্থান দখল করে অন্য ধরণের সামূহিক মনস্তত্ত্ব। এই ধরণের বিপ্লবই সমাজের সামগ্রিক উন্নতি ও প্রগতিকে নিয়ে আসে।

এই ধরণের নিউক্লিয়ার বিপ্লব কেবল সদবিপ্ররাই আনতে পারে যেহেতু তারা সমাজচক্রের কেন্দ্রবিন্দুতে অধিষ্ঠান করেন। তারা তাদের ঐক্যবদ্ধ প্রয়াস, নৈতিক ও আধ্যাত্মিক শক্তি ও সামগ্রিক প্রয়াসের মাধ্যমে শোষিত মানুষকে একতাবদ্ধ করেন ও শোষণকারী শাসককে পরাভূত করেন। এই ধরণের জনগণকে সঙ্গে নিয়ে করা বিপ্লব সমাজকে শোষণমুক্ত করে ও নূতন যুগের সূচনা করে, সে যুগ শান্তি ও শ্রীবৃদ্ধির যুগ।

নিউক্লিয়ার বিপ্লবের উপাদান:-

নিউক্লিয়ার বিপ্লব সার্থক হতে গেলে এর কতগুলি বিশেষ উপাদানের প্রয়োজন হয়। এগুলি হচ্ছে যে কোন রকমেরই হোক না কেন শোষণের উপস্থিতি থাকতে হবে। প্রয়োজন একটি বিপ্লবী সংঘটনের উপস্থিতি। প্রগতিশীল সদর্থক দর্শন। থাকতে হবে বিপ্লবী কর্মী বাহিনী, অভ্রান্ত নেতৃত্ব ও বৈপ্লবিক রণকৌশল।

শোষণের উপস্থিতিঃ–সমাজে নানা ধরণের শোষণ রয়েছে। স্থান–কাল পাত্রের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে শোষণের ধরণ–ধারণও পাল্টে যায়। সমাজচক্রের প্রতিটি যুগেই নানা ধরণের শোষণ দেখা দেয়। উদাহরণ স্বরূপ অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে সামন্ততান্ত্রিক শোষণ, ঔপনিবেশিক শোষণ, পুঁজিবাদী শোষণ, সাম্রাজ্যবাদী শোষণ ও ফ্যাসিষ্ট শোষণ। এই শোষণ আবার জাগতিক, মানসিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে হতে পারে। অতীত গ্রীক ও রোমান সাম্রাজ্য যুগে ক্রীতদাস প্রথা চালু ছিল। নিজেদের স্বার্থ চরিতার্থ করার জন্যে শাসকগণ পরাভূতদের রক্ত শোষণ করতো। মানসিক শোষণের ক্ষেত্রে মেকী দর্শনের সাহায্যে, ভাবপ্রবণতা ও সঙ্কীর্ণ মানসিকতাকে আশ্রয় করে জনগণকে বিভ্রান্ত করতো। গণতান্ত্রিক সমাজতন্ত্র ও শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের তত্ত্ব ভণ্ডের মনস্তত্ত্বের উৎকৃষ্ট উদাহরণ। অর্থনৈতিক শোষণের ক্ষেত্রে কায়েমী স্বার্থবাদীরা জনগণকে তাদের ন্যূনতম প্রয়োজন থেকে বঞ্চিত করে রাখত। সুদখোরেরা অত্যন্ত চড়া সুদে টাকা ধার দেওয়ার ব্যবসাতে গরীব কর্ষকদের তাদের উৎপাদিত ফসল অভাবী বিক্রয় করতে বাধ্য করাতো, এসবই অর্থনৈতিক শোষণের উদাহরণস্বরূপ। শোষকরা তাদের শোষণের বিভিন্ন ধরণের কৌশল অবলম্বন করে। কিন্তু

যখন সমাজ বিপ্লবের পথ ধরে চলে তখন শোষকদের ছল–চাতুরী ধরা পড়ে যায়। শোষকরা তখন আর তাদের শোষণের ছলা–কলাকে লুকিয়ে রাখতে পারে না।

একটা সমাজে শোষণের উপস্থিতি কয়েকটি দিকে নজর দিলেই চিহ্নিত করা যায়। সেগুলি হচ্ছে চরম দারিদ্র, সামাজিক নিরাপত্তাহীনতা, সাধারণ মানুষদের অসাম্য জীবনে ন্যূনতম প্রয়োজন ক্রয়করার অক্ষমতা, সমাজের বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে বিরাট অর্থনৈতিক ও সামাজিক ব্যবধান, সমষ্টিগত সম্পদের অযৌক্তিক বন্টন। ভারতের বর্তমান সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক অবস্থা অসুস্থতার সাক্ষ্য বহন করছে। ভারত তাই বিপ্লবের পথেই চলেছে।

বৈপ্লবিক সংঘটন:–বিপ্লব আর যুদ্ধ প্রায় একই জিনিষ। বিপ্লবও এক ধরণের যুদ্ধ। দু'য়ের মধ্যে পার্থক্য এই যে যুদ্ধে ব্যষ্টি বা রাষ্ট্রের দ্বারা শক্তি সম্প্রয়োগ করা হয়, আর বিপ্লবে একদল লোক শোষণহীন সমাজ প্রতিষ্ঠা করার উদ্দেশ্যে শক্তি সম্প্রয়োগ করে। বৈপ্লবিক এই যুদ্ধে তাই বৈপ্লবিক সংঘটন আবশ্যক। বিপ্লবের মানসিক প্রস্তুতির সময় সমাজের বিক্ষুব্ধ

শূদ্রদের একটা বৈপ্লবিক সংঘঠন গড়ে তুলতেই হবে। এই সংঘটনই বিপ্লবের অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করবে।

বিপ্লব পরিচালনা করতে বহুমুখী উদ্দেশ্যসাধক সংঘটনের প্রয়োজন দেখা দেয়। সংঘটনের দায়িত্ব অনেকটা সরকার পরিচালনের মত। রাষ্টের সর্বোচ্চ স্তর থেকে সর্বনিম্ন গ্রামস্তর পর্যন্ত বিস্তৃত হবে বৈপ্লিবিক সংঘটনের ক্রিয়াকলাপের অধিক্ষেত্র। স্থানীয় কর্মী তথা সংযোগ রক্ষাকারীদের সাংঘটনিক কাঠামোর প্রতিটি স্তরের সঙ্গে যোগাযোগ রাখতে হবে। সর্বোচ্চ সংস্থাই সমস্ত বৈপ্লবিক কার্যকলাপ পরিচালনা করবে।

সাংঘটনিক প্রকৃত কাঠামো তৈরী না করেই অথবা কাঠামোর কোন খুঁত রেখে যদি বিপ্লব শুরু করা হয় তবে পরিণতি হবে সর্বনাশা। ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের সময় বৈপ্লবিক নেতৃত্ব গ্রামস্তর পর্যন্ত সংগঠন গড়ে তুলতে পারেননি তাই সেই সাংগঠনিক দুর্বলতাকে ব্রিটিশরা জব্দ করেছিল। এই দুর্বলতা অপূরণীয় ক্ষতির সৃষ্টি করেছিল। সাম্প্রতিক ভারতের ইতিহাসে এমন ঘটেছে'

প্রগতিশীল সদর্থক দর্শন:– বৈপ্লবিক সংঘটনকে একটি প্রগতিশীল দর্শন অনুযায়ী চলতে হবে। প্রগতিশীল তথা সর্বানুস্যুত দর্শন বৈপ্লবিক সংঘটনের অমোঘ অস্ত্র। এটি সমস্ত রকম বিরুদ্ধ ভাবধারার বিরুদ্ধে লড়াই করে' সামূহিক মনস্তত্ত্বে এক জোরালো ও সদর্থক তরঙ্গ সৃষ্টি করে। একদিকে জনগণ বিপ্লবমুখী হয় অন্যদিকে কায়েমী স্বার্থের ধ্বজাধারীরা ইচ্ছাকৃতভাবে প্রগতিশীল পরিবর্তনকে রোখার চেষ্টা করে। ফলস্বরূপ সামূহিক মনস্তত্ত্বে একটা ধ্রুবীকরণ সৃষ্টি হয়। বৈপ্লবিক নেতৃত্বের দায়িত্ব হচ্ছে প্রগতিশীল দর্শনের ব্যাপক প্রচারের মাধ্যমে এই ধরণের ধ্রুবীকরণ তৈরী করা।

বৈপ্লবিক সংঘটনের দর্শনকে অবশ্যই সমস্ত ধরণের সঙ্কীর্ণতা ও ভাবজড়তা থেকে মুক্ত হতে হবে। দর্শনের মধ্যে যদি কোন ত্রুটি থাকে অথবা দর্শন যদি সর্বানুস্যুত না হয় তাহলে বিপ্লবীদের হাত থেকে সমাজের নেতৃত্ব চলে যাওয়ার বিপদ থেকে যায়। সমাজের প্রগতিশীল উন্নয়নের ক্ষেত্রে তা চরম ক্ষতিকারক।

সূচীপত্র

এছাড়া দর্শনকে অবশ্যই প্রয়োগ ভৌমক হতে হবে–সৈদ্ধান্তিক হলে চলবে না। দর্শনের বাস্তব প্রয়োগের ক্ষেত্রে যদি কোন ত্রুটি থেকে যায় তাহলে সেটা শুধরে নেওয়া যায় কিন্তু দর্শনের মধ্যেই যদি মৌল ত্রুটি থাকে তাহলে তা কখনই বাস্তবায়িত করা যাবে না, শোধরানোও যাবে না।

কার্লমার্কস্ ও গান্ধীজির তত্ব ত্রুটিপূর্ণ দর্শনের উদাহরণ। মার্কসবাদের মৌল নীতিটাই হচ্ছে অমনস্তাত্বিক, অযৌক্তিক ও অমানবিক। মার্কসবাদ বলে যে পুঁজিবাদী শোষণের বিরুদ্ধে একমাত্র পথ হচ্ছে বিপ্লব। এটি সদর্থক ভাবনা। কিন্তু মার্কসবাদের দ্বন্দাত্মক বস্তুবাদ, ইতিহাসের জড়কেন্দ্রিক ব্যাখ্যা, রাষ্ট্রের অপ্রয়োজনীয়তার ভাবনা, সর্বহারার একনায়কতন্ত্র, শ্রেণীহীন সমাজ সবই ত্রুটিপূর্ণ যার কোন দিনই বাস্তবায়ন হবে না। ঠিক এই কারণেই বিপ্লব পরবর্তী প্রতিটি কম্যুনিষ্ট দেশই বিক্ষোভ, অশান্তি ও দমনের পথে চলেছে। এই পৃথিবীতে একটাও কমুনিষ্ট দেশ নেই যা মার্কসের আদর্শ অনুযায়ী প্রতিষ্ঠা হয়েছে।

গান্ধীবাদও ত্রুটিপূর্ণ শোষণের হাত থেকে মুক্তির নিশ্চিততা অপেক্ষা এটি শোষকদের স্বার্থকেই দেখেছে। তাই এটি নঞর্থক দর্শন। যখন শোষকরা নিজেরাই দর্শনের মধ্যে তাদের আশ্রয় খুঁজে পায় তখন সেই দর্শন দ্বারা শোষণ থেকে মুক্তি পাওয়া অসম্ভব। শোষক ও শোষিতের সহবস্থান কখনই সমাজকে শোষণহীন অবস্থায় পৌঁছাতে পারে না। কোন বৈপ্লবিক সংঘটন গান্ধীবাদকে আদর্শ দর্শন হিসাবে মেনে নেবে না। যদি কোন সংঘটন তা মেনে নেয় তবে সেই সংঘটন কখনই আর বৈপ্লবিক সংঘঠন হিসাবে পরিচিত হবে না ও অচিরেই তা ভেঙ্গে যাবে। এটা অবশ্যই একটা ঐতিহাসিক অপরিহার্যতা।

বৈপ্লবিক কর্মী বাহিনী:–বিপ্লবের জন্যে উদাত্ত আহ্বান জানানোর আগে বৈপ্লবিক সংঘটনকে ব্যাপক প্রস্তুতি নিতে হবে। বিপ্লবের সমস্ত উপাদান থাকা সত্ত্বেও শোষিত জনগণ যতক্ষননা বিপ্লবের জন্যে মানসিক ভাবে প্রস্তুত হচ্ছে ততক্ষণ বিপ্লব. নাও হতে পারে। জনগণ যদি মানসিকভাবে বিপ্লবের পক্ষে না থাকে তবে তারা বিপ্লবের ডাকে সাড়া দেবে না।

সূচীপত্র

আদর্শগত শিক্ষায় শিক্ষিত বৈপ্লবিক কর্মীদের জনগণের মনস্তত্ত্বকে বিপ্লবমুখী করে তুলতে হবে ও বৈপ্লবিক সংঘর্ষে লিপ্ত হবার জন্যে উদ্বুদ্ধ করতে হবে। এই কর্মীরা প্রগতিশীল দর্শনের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে যুক্তিসম্মত কর্মপদ্ধতি অবলম্বন করবে। সামাজিক-অর্থনৈতিক চেতনা গড়ে তুলবে ও জনসাধারণের জীবন ধারণের মানোন্নয়নের উদ্দেশ্যে উৎসর্গীকৃত হবে। হতাশ জনগণকে বিপ্লবের পথে এগিয়ে যাওয়ার প্রেরণা সৃষ্টি করাই হবে এই কর্মীদের কর্তব্য। তাদের ত্যাগ ও কর্মমুখীনতার মাধ্যমেই সামূহিক মনস্তত্ত্বকে তারা বিপ্লবের সপক্ষে নিয়ে আসতে সক্ষম হবে। বৈপ্লবিক সংঘটনের প্রথম ও প্রধান কর্তব্যই হলো বিপ্লবের জন্যে উৎসর্গীকৃত কর্মীবাহিনী তৈরী করা।16

অভ্রান্ত নেতৃত্বঃ-বিপ্লবের সাফল্য নির্ভর করে নেতৃত্বের ওপর। নেতৃত্ব যত ত্রুটি মুক্ত হৰে জীবন ও সম্পত্তির ক্ষয় ক্ষতি তত কম হৰে। সমাজ ও বিপ্লবের কাছে আদর্শ নেতৃত্ব সম্পদস্বরূপ। নেতা শুধু সফল বিপ্লবই উপহার দেয় না। বিপ্লব পরবর্তী যুগে জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষারও পূর্ত্তি ঘটায়।

অভ্রান্ত নেতৃত্বের অভাবে বহুদেশের বিপ্লবপরবর্তী পর্যায়ে সুসংবদ্ধ ও সমৃদ্ধ সমাজ গড়ে তোলা যায় নি। আদর্শ নেতৃত্বের ধারণা হিসাবে প্লেটোর 'দার্শনিক রাজা', কনফুসিয়াসের 'ঋষি' নিৎসের 'অতিমানব' ও মার্কসের 'সর্বহারার একনায়কের' তত্ত্ব এসেছিল কিন্তু সব তত্ত্বই ব্যর্থ হয়েছে। তত্ত্বের নেতা আর বাস্তবের মানবগুণ–সম্পন্ন নেতার মধ্যে আকাশ–পাতাল পার্থক্য। প্রখর বুদ্ধি, সূক্ষ্ম বিচার শক্তি, সামাজিক চেতনা, বাগ্মীতা ও অন্যান্য কিছু গুণাবলী সম্পন্ন নেতা হয়তো নানাভাবে ইন্ধন যুগিয়ে বিপ্লব আনতে পারে, কিন্তু পরবর্তীকালে সমাজে প্রগতির পথ দেখাতে না পারায় কলঙ্কের কালিমায় বিভূষিত হবে। তারা জনগণের জ্বলন্ত সমাস্যাবলীর সমাধান দিতে তথা শোষণ ৰন্ধ করতে অপারগ হয়। নেতৃত্ব কখনও ওপর থেকে চাপিয়ে দেওয়া যায় না। ত্যাগ–তিতিক্ষা, আন্তরিকতা, আদর্শপ্রিয়তা, সংগ্রামী মানসিকতা ও সমস্ত ধরণের সমস্যার সমাধান করার ক্ষমতার গুণাবলী অর্জনের মধ্য দিয়ে নেতা নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করে।

সদবিপ্র নেতৃত্বই সবচেয়ে আদর্শ–ঋদ্ধ নেতৃত্ব। এরা হলেন একাধারে শারীরিক শক্তিমান, ৰৌদ্ধিকতার উন্নত ও

ধ্যাত্মিকতায় সমুন্নত। তাঁদেরই পথ নির্দেশনায় ও সাহায্যে বিপ্লব সংসাধিত হবে।

বৈপ্লবিক কৌশল:–বৈপ্লবিক প্রচেষ্টায় যারা প্রত্যক্ষভাবে বাধা দেয় তাদের প্রভূত সামরিক শক্তি থাকা সত্ত্বেও বিপ্লবীরাই জয়যুক্ত হয়। এর কারণ শুধু সুসংবদ্ধ সংঘটন, প্রগতিশীল আদর্শ ও সর্বগুণ সম্পন্ন নেতৃত্বই নয়, সেই সঙ্গে তাদের থাকে বৈপ্লবিক কৌশল।

বিপ্লবের সময় যেহেতু শোষক ও সমাজদ্রোহীদের বিরুদ্ধে সর্বাত্মক সংগ্রাম হবে, সেহেতু যারা শোষিত তাদের মধ্যে ঐক্য আনা ও সেই ঐক্য বজায় রাখার ব্যবস্থা করতেই হবে। বিপ্লবীদের তিনটি শক্তির বিরুদ্ধে সংগ্রামে অবতীর্ণ হতে হবে–বহিরাগত শোষক, আভ্যন্তরীণ শোষক, আভ্যন্তরীণ অশুভ শক্তি সমূহ। এই তিনটি শক্তিই যদিও খুবই প্রবল তবুও যে বিরোধীরা জয়যুক্ত হবে তার কারণ কেবল বন্দুকের নলই শক্তির উৎস নয়। বিপ্লবীদের নৈতিক, মানসিক ও আত্মিক শক্তিই তাদের বিজয়ী করে তোলে। জড় শক্তি অপেক্ষা নৈতিক ও আধ্যাত্মিক শক্তি অনন্তবলে বলীয়ান।

সূচীপত্র

যদিও শোষকদের বিতাড়িত করাই বিপ্লবীদের প্রাথমিক কর্তব্য, তবুও তাদের নিশ্চিত হতে হৰে শোষকরা যেন আবার ক্ষমতা দখলের সুযোগ না পায়। বা গোপনে সমাজের কোন ক্ষতি করতে না পারে। জীবন ও সম্পত্তির ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ ন্যূনতম পর্যায়ে রেখে সমাজের বুক থেকে শোষণ দূর করা ও সামূহিক মনস্তত্ত্বে প্রগতিশীল পরিবর্তন নিয়ে আসাই বিপ্লবের সব থেকে বড় প্রাপ্তি।

ভাবাবেগের ভূমিকা:–কোন না কোন একটা ভাবাবেগকে কেন্দ্র করেই বিপ্লব সংঘটিত হয়ে থাকে। সকলের হৃদয়গ্রাহ্য কোন সুদৃঢ় ভাবাবেগ না থাকলে বিপ্লব সংঘটিত হতে পারে না। যুক্তির চেয়েও ভাবাবেগের শক্তি সর্বদাই বেশী।

কম্যুনিজম একটা সেন্টিমেন্টকে প্রচারের কাজে লাগিয়েছিল– দুনিয়ার মজদুর এক হও। প্রাথমিকভাবে জনগণ এই সেন্টিমেন্টের দ্বারা আকর্ষিত হয়েছিল। কিন্তু কিছুদিন পরেই তারা বুঝতে পারল যে এটা ছিল অন্তঃসারশূন্য। পরবর্তীকালে বুদ্ধিজীবীরাও এতে অসন্তুষ্ট হয়ে উঠলেন। কম্যুনিজম বর্তমানে

যেকোন স্থানীয় সেন্টিমেন্টের বিরুদ্ধে (যে সেন্টিমেন্টগুলি বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে মাথা চাড়া দিচ্ছে) যুঝতে অপারগ কেননা কম্যুনিজমের সেন্টিমেন্ট থেকে এইসব সেন্টিমেন্ট আরও তীব্র।

প্রাউট এক বিশ্বৈকতাবাদী সেন্টিমেন্ট দ্বারা পুষ্ট ও সেই সেন্টিমেন্ট বিশ্বের সর্বক্ষেত্রে প্রযোজ্য ও ধারাবাহিকভাবে বিশ্ব সেই সেন্টিমেন্টের পথেই এগুচ্ছে। বিশ্বৈকতাবাদী সেন্টিমেন্টকে মনে রেখেও কে স্থানীয় জনসাধারণকে স্থানীয় সেন্টিমেন্টে উদ্বুদ্ধ করতে পারবে? একমাত্র প্রাউট এটা করতে পারবে। কম্যুনিষ্টদের কাছে তেমন কোন 'আইডিয়া' নেই। একমাত্র প্রাউটই সমস্ত স্থানীয় সেন্টিমেন্টকে কাজে লাগিয়ে সকলকে ধীরে ধীরে বিশ্বৈকতাবাদের দিকে নিয়ে যেতে পারে।

বিপ্লবীদের অবশ্যই স্থানীয় জনগণের আশা–আকাঙ্ক্ষা ও সেন্টিমেন্ট বিষয়ে সচেতন হতে হবে ও সেই 'সেন্টিমেন্টাল লিগাসিকে (সাংবেদনিক উত্তরাধিকার) বিশ্বৈকতাবাদের দিকে চালিত করতে হবে। বিপ্লবের প্রস্তুতি কালে এই সেন্টিমেন্টাল লিগাসিকে জাগিয়ে তোলার নিরন্তর প্রয়াস চালিয়ে যেতে হবে। কারণ ভাবাবেগ বিপ্লবের পক্ষে জনসমর্থন সৃষ্টিতে উৎসাহপ্রদান

করেও বৈপ্লবিক কর্মীদের মধ্যে অদম্য শক্তি ও দৃঢ়প্রত্যয় সৃষ্টি করে।

প্রাউট অনুযায়ী ভাবাবেগ দু'ধরণের হয়–সদর্থক ভাবাবেগ ও নঞর্থক ভাবাবেগ। সদর্থক ভাবাবেগ সংশ্লেষণাত্মক প্রকৃতির। এই ভাবাবেগ সমূহ সমাজকে ঐক্যবদ্ধ করে, মানবতার উদ্বোধন ঘটায়, সামূহিক সার্থের শ্রীবৃদ্ধি ঘটায় ও প্রগতিশীল অগ্রগতিকে উৎসাহিত করে। অপরদিকে নঞর্থক ভাবাবেগ সঙ্কীর্ণমনা হওয়ায় এর সুযোগ সীমিত ও সেই ভাবাবেগ সমাজের মধ্যে ভেদ–বিভেদকে সৃষ্টি করে।

শোষণ বিরোধী মনোভাব, বিপ্লবী মানসিকতা, নীতিবাদী মানসিকতা, সংস্কৃতি মনস্কতা, বিশ্বৈকতাবাদ ও আধ্যাত্মিকতাবাদকে সদর্থক ভাবাবেগের উদাহরণ হিসাবে গণ্য করা যায়। অপরদিকে নঞর্থক ভাবাবেগের নমুনা–সাম্প্রদায়িকতা, দেশপ্রেম, জাতীয়তাবাদ, প্রাদেশিকতা, ভাষাবাদ, জাতিবাদ।

সমাজের মধ্যে কৃত্রিম রেষারেষি সৃষ্টিতে বা জাত-পাতের ভিত্তিতে সমাজকে বিভক্ত করার উদ্দেশ্যে কখনই নঞর্থক ভাবাবেগকে ব্যবহার করা উচিত নয়। তবে জনগণের মধ্যে ঐক্য আনার নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য নিয়ে এই ভাবাবেগকে ব্যবহার করা যেতে পারে। মনে রাখতে হবে নঞর্থক পথ সমাজের পক্ষে প্রচণ্ড বিপদ ও ক্ষতির কারণ হয়ে উঠতে পারে। হিটলার সমগ্র জার্মান জাতির মধ্যে ঐক্য আনার উদ্দেশ্যে জাতিবাদকে ব্যবহার করে তাৎক্ষণিক সাফল্য পেয়েছিলেন কিন্তু যেহেতু তিনি কেবল নঞর্থক ভাবাবেগকেই আঁকড়ে থাকলেন, যেহেতু তাঁর কোন সদর্থক ভাবাবেগ ছিল না, সেহেতু তাঁর উদ্যম শেষ পর্যন্ত বিশ্বযুদ্ধ ডেকে আনলো, ও জার্মানি প্রায় ধ্বংসের মুখোমুখি হলো। সদর্থক ভাবাবেগই সমাজ গড়ার প্রকৃত হাতিয়ার-কোন অবস্থাতেই এ কথা ভুললে চলবে না।

সদবিপ্র হও: সদবিপ্র তৈরী কর

এ পৃথিবীতে মানবেতিহাসের প্রথম পরিক্রমায় এখনো পর্যন্ত সদ্বিপ্র সমাজ গড়ে উঠতে পারে নি। অধিকাংশ দেশে প্রথম পরিক্রমার শেষ অংশ চলছে, অল্প কয়েকটি দেশে শূদ্র-

বিপ্লবোত্তর ক্ষাত্র যুগের প্রতিষ্ঠা হয়েছে, কোথাও কোথাও বিপ্র যুগের সম্ভাবনা উকিঝুকি মারছে। সদ্বিপ্র–সমাজ না থাকায় সমাজ–চক্র স্বাভাবিক ভাবেই ঘুরে চলেছে। প্রতিটি যুগে প্রধান বর্ণের শাসনের পরে শোষণ আসছে, তারপর ক্রান্তি আসছে। সদ্বিপ্রের সহযোগিতা না পাওয়ায় মানব সমাজের বুনিয়াদ মজবুত হতে পারছে না।

আজ প্রতিটি যুক্তিনিষ্ঠ ধার্মিক নীতিবাদী সংগ্রামী মানুষের কাছে আমার অনুরোধ, তাঁরা যেন অনতিবিলম্বে একটি সুষ্ঠু সদ্বিপ্র–সমাজ গড়ে' তোলেন। এই সদ্বিপ্রদের কাজ করতে হবে সর্ব দেশের জন্যে, সকল মানুষের সর্বাত্মক মুক্তির জন্যে, লাঞ্ছিত পৃথিবীর ধূলুণ্ঠিত মানবতা তাঁদের আগমনের প্রতীক্ষায় অধীর আগ্রহে পূর্ব আকাশের দিকে চেয়ে আছে। তাঁদের সামনে থেকে অমানিশার অন্ধতমিস্রা কেটে যাক, নূতন সূর্যোদয় নূতন দিনের মানুষ নূতন পৃথিবীতে জেগে উঠুক। এই শুভ কামনা নিয়েই আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

সমাপ্ত

সূচীপত্র

***************X***************

নম্র নিবেদন

---

১. এই বইটা পড়ার সময় যদি আপনার কখনো মনে হয়ে থাকে যে টাইপিংয়ে ত্রুটি রয়েছে তাহলে দয়া করে আমাকে জানাবেন।

২. পৃথিবীর সকল মানুষের, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও অন্যান্য সমস্যাদির সুষ্ঠু সমাধানের লক্ষ্যে প্রাউট পড়ুন ও অন্যকে পড়ান।

৩. প্রাউট সম্পর্কিত কোনো প্রশ্ন থাকলে নিঃসংকোচে জানাতে পারেন।

Ac Satyabodhananda Avt

WhatsApp No. 8972566147

সূচীপত্র